উত্তরাধিকার

জরাসন্ধ

উত্তরাধিকার

জরাসন্ধ

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ ১৩৭১ সাল

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীকানাই পাল

দশ টাকা

॥ ১ ॥

বাঁহাতে রেলিং ধরে বৌরাণী আস্তে আস্তে উপরে উঠছিলেন।

সিঁড়ির ধাপগুলো কিছুক্ষণ আগে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। জলটা ভালো করে ঝাড়া হয়নি। অনেক ঘষা মাজার পরেও এখানে ওখানে এক আধটু ময়লা লেগে আছে। লক্ষ করে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। অভিজিৎ ছিল পিছনে। তার দিকে ফিরে বললেন, সাবধানে এসো ঠাকুরপো। হঠাৎ পা হড়কে না যায়।........লোকগুলোও হয়েছে যেমনি। ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছু চায় না।

অভিজিৎ সিঁড়িতে পা দিয়েই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বৌরাণীর কথায় চমক ভাঙল। মৃদু হেসে বলল, ঠিক আছে, চল।

বাঁক ঘুরতেই হলধরের সঙ্গে দেখা। একতাড়া চাবি নিয়ে তরতর করে নেমে আসছিল। ওদের দেখে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। বৌরাণী বললেন, জানলা দরজা গুলো সব খুলে দিয়েছিস তো?

—তালাই তো খোলা গেল না।

—কেন? চাবি খুঁজে পাসনি বুঝি?

—চাবি পেয়েছি, ঘুরছে না। ভেতরটা জং ধরে গেছে।

"জংএর আর অপরাধ কী?" কেমন একটা উদাস সুর লাগল বৌরাণীর কণ্ঠে। সিঁড়ির চাতালের পাশে দাঁড়িয়ে খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন মিনিট খানেক। তার পরেই স্বাভাবিক স্বর ফিরে এল, —"কী করা যাবে তাহলে?"

—তালা ভাঙতে হবে। একটা মিস্তিরি ডেকে নিয়ে আসি।

—মিস্ত্রী মানে তো সেই বাজার। তাহলেই হয়েছে!

—বাজার কেন? এই পাশেই পেয়ে যাবো।

—কোন পাশে?

—রিফিউজি বস্তিতে। ওখানে না আছে কী?

"দরকার নেই বাপু"—একটু যেন শঙ্কার ছায়া পড়ল গোরাণী... "নায়েবমশাই আবার কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে বসবেন!"

—জানতে পারলে তো? খিড়কি দিয়ে চুপি চুপি নিয়ে আসবো। ছুটো ঘা মেরে তালাগুলো ভেঙে দিয়ে যাবে।

বলতে বলতে হলধর দ্রুত পায়ে নেমে গেল। ওষ্ঠে ও চোখের কোণে এক ঝলক চাপা হাসি, বড়দের লুকিয়ে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করবার বেলায় ছোটদের মুখে যে হাসি দেখা দেয়।

অভিজিৎ সব ব্যাপারটা লক্ষ করছিল। কিছুটা কৌতুকের সুরে বলল, ওদের বুঝি এখানে প্রবেশ নিষেধ?

—একেবারে। নামও শুনতে পারেন না। তা, ওঁরই বা দোষ কী বল? লোকগুলো সত্যিই বেয়াড়া। বলা নেই, কওয়া নেই, পঙ্গপালের মত কোত্থেকে উড়ে এসে সারা বাগানটা ছেয়ে ফেলল। তার আগে একটা মুখের হুকুম তো নিতে হয়। বেশ, বিপদে পড়ে এসেছিস, তখন না হয় না নিলি। কিন্তু পরেও কি একবার আসতে নেই? তা না; রাতারাতি ঘরদোর তুলে দিব্যি জাঁকিয়ে বসে গেল, যেন ওদের সাত পুরুষের জমি। যাক, সে মহাভারত আস্তে আস্তে শুনো। নায়েব মশাই ই বলবেন সব।

ওখান থেকেই নামবার উদ্যোগ করে বললেন, এখন আর ওপরে গিয়ে কী করবে? ঘর খোলা হোক, ঝাঁট-পাট পড়ুক। তারপর আসা যাবে।

অভিজিৎ মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বলল, চল একবার দেখে যাই। ছাদটা তো খোলা আছে।

সিঁড়ির মাথায় বিশাল মেহগনি কাঠের দরজা। কালো কপাটের ঝকঝকে পালিশে একদিন মুখ দেখা যেত, আজ বিবর্ণ মলিন। সেটা পার হলেই দীর্ঘ প্রশস্ত বারান্দা। তার একদিকে সারি সারি ঘর, সব বন্ধ। প্রত্যেকের গায়ে একটি করে আড়াই-সেরী তালা ঝুলছে, আগাগোড়া মরচের আক্রমণে জর্জর। আরেকদিকে বিস্তীর্ণ ছাত, তিন পাশ ঘিরে সূক্ষ্ম কাজ করা কাঠের রেলিং—রংওঠা, জায়গায় জায়গায় ভাঙা।

বারান্দাটা সদ্যসদ্য সাফ করে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ছাদময় ছড়ানো জঞ্জাল—ধুলো বালি, খড়কুটো, পাখির পালক, তার তলায় পুরু শেওলা।

অভিজিৎ চারদিকটায় এবার চোখ বুলিয়ে বলল, এখানে বোধহয় অনেক দিন কেউ আসেনি।

বৌরাণী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না, ছাদের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে যা বললেন, সেটাও ঠিক জবাব নয়, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসা স্বগতোক্তি—"সেই তুমিও চলে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে গোটা মহলে কপাট পড়ল। তারপর থেকে কর্তা আর একদিনের তরেও এমুখো হননি। উনি এসেছেন মাঝে মাঝে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চাকরদের দিয়ে ঝাড়-পোছ করিয়েছেন। সে আর ক'বছর? তারপর তো চলেই গেলেন। ব্যস, সেই থেকে সব বন্ধ। সন্ধ্যে প্রদীপ দিতেও কেউ আসেনি।"

কিছুক্ষণ বিরতির পর দূরে তর্জনী তুলে বললেন, ঐ রাস্তা দিয়ে গাড়িটা যখন চলে যায় আমি আমার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, তুমি এ পাশটায় মাথা নীচু করে বসে আছো, ওঁর বাঁ হাতখানা রয়েছে তোমার কাঁধের ওপর। ....সে কি আজকের কথা? আঠারো-উন্নিশ বছর হবে। তাইনা?

দেওরের মুখের দিকে তাকালেন বৌরাণী। সুদূরাগত অতীতের গাঢ় ছায়ায় ম্লান ছুটি চোখ, স্মৃতিভারে ম্রিয়মাণ।

অভিজিৎ কোনো উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে ছাতে গিয়ে নামল। বৌরাণী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "যেওনা, ভীষণ পেছল!"

কথাগুলো সে শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। অন্যমনে এগিয়ে গিয়ে রেলিংএর পাশে দাঁড়াল। বৌরাণী এবার সন্তর্পণে পা ফেলে তার অনুসরণ করলেন। দেওরের কাছে গিয়ে আবার তাকে সাবধান করে দিলেন, "উঁহুঁ, অত ধারে যেওনা। কতকালের পুরনো কাঠ।"

অভিজিৎ নিষেধ শুনে এক পা পিছনে সরে এল। বৌরাণী কিছুক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, দেখছ তো? বাগান সমেত গোটা মাঠটাই ওরা দখল করে বসে আছে। নামও দিয়েছে জবরদখল কলোনী। ...র মানে, কাজটা যে জবরদস্তি, সেকথা নিজেরাই স্বীকার করছে। ...য়েব মশাই আশা করেছিলেন, খানিকটা গুছিয়ে বসবার পর একটা কোনো বিলি ব্যবস্থার মধ্যে আসবে। তার কোনো লক্ষণ নেই।

অভিজিৎ এবারেও কোনো কথা বলল না। সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চৌহদ্দি পাঁচিলের ধার ঘেঁষে ছিল ফুলের বাগান। বিঘা দশেকের কম নয়। কর্তাদের আমলে জলুস ছিল, জমকেরও অভাব হয়নি। শেষের দিকে, বোঝা যাচ্ছে, এদিকে আর তাঁদের নজর ছিল না। তারপর তাঁদের অবর্তমানে ফুলের জায়গায় অগাছা এবং বাগানকে হটিয়ে দিয়ে জঙ্গলের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে। চারপাশের নীচু পাঁচিলটাও হয়তো কোথাও কোথাও ধসে গিয়ে 'জবর দখলের' সুবিধা করে দিয়েছে, এবং শুধু ঐ বাগান নয়, তার সংলগ্ন প্রায় চারশ বিঘা খোলা জমি তার আওতায় এসে গেছে।

ভাদ্র মাসের ভাগীরথী যখন কূলে কূলে ভরে উঠত, তার সেই গৈরিক বিস্তার এবং তার পরেই এই উন্মুক্ত মাঠের গাঢ় শ্যামলিমা অভিজিতের দুটি কিশোর চক্ষু জুড়ে বসে আছে। কতদিন এই ছাদের উপর দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত! সেদিনের সেই অপরূপ রূপটি স্মরণ করতে গিয়ে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা পীড়া অনুভব করল। সবুজ কোমল ঘাসে ঢাকা সেই নিটোল মাঠখানির সারা দেহময় ছড়িয়ে গেছে কুৎসিত ক্ষত চিহ্ন! আগাগোড়া কেরোসিন টিন আর টালি ছাওয়া চালাঘর, হোগলা পাতার বেড়া, ছেঁড়া চট, এখানে ওখানে আবর্জনা, ভাঙ্গা ইট, পাঁক, আর তার মধ্যে কিলবিল করছে একপাল উলঙ্গ আর অর্ধোলঙ্গ মানুষ! সত্যিই কি মানুষ এরা? বিধাতার শ্রেষ্ঠ রচনা বলে যারা কীর্তিত?

'কলোনীর' দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অভিজিৎ। দৈন্য, মালিন্য ও দুর্দশার এতবড় বীভৎস রূপ সইতে পারলনা। এতদিন যেখানে সে কাটিয়ে এল, সেও এই দেশ, এই ভারতবর্ষ। দুঃখ দারিদ্র্যের চেহারা সেখানেও তার চোখে পড়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে কারো তুলনা হয়না।

পিছনে হাতুড়ি ঠোকার শব্দ শুনে বৌরাণী বললেন, ঐ বোধহয় মিস্ত্রী এসে গেছে। বেলাও পড়ে এল। ওরা এদিকে যোগাড় যন্তর করতে থাক। সেই ফাঁকে তুমি কিছু মুখে দিয়ে নেবে চল। লোকজন এসে পড়লে আর হয়ে উঠবেনা।

প্রথম ঘরখানা অনেক বড়, একটা বিরাট হল। তার সামনে আসতেই

মিস্ত্রী হাতুড়ী রেখে অনেকটা নত হয়ে পর পর দুজনের উদ্দেশ্যে হাত জোড়করে নমস্কার করল। বৌরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বুঝি ঐ কলোনীতে থাক ?

—হ, মা ঠাইরেন। এই কোনো রকমে মাথা গুইজ্যা পইড়্যা আছি। অ্যারে থাকা কয়না।

হলধর বলল, কোন্ রাস্তায় যেন তোমার বাড়ি ?

—কী জানি ? পোলাপানরা কী য্যান একটা নাম দেছে ; ও আমার মনে থাকেনা।

"ওখানে আবার রাস্তার নাম আছে নাকি ?" বিস্ময় ও কৌতুকের সুর বৌরাণীর। হলধরের কাছেই জানতে পাওয়া গেল, "হ্যাঁ, মা, ঐ যে ফালি মতন পথগুলো দেখতে পাননা ওপর থেকে, প্রত্যেকটার মোড়ে একটা করে সাইনবোড্ ঝুলছে। এক টুকরো টিনের গায়ে আলকাতরা মাথিয়ে তার ওপরে খড়ি দিয়ে লেখা। কোনোটা দেশপ্রাণ শাসমল রোড্, কোনোটা নেতাজী সুভাষ অ্যাভিনিউ..."

"তাই নাকি !" হেসে উঠলেন বৌরাণী। মিস্ত্রী যেন একটু লজ্জিত হল। সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে বলল, পোলাপানের কাণ্ড !

হলধরের থলিতে আরো কিছু মজার খবর ছিল এবং এই সুযোগে মনিবদের সামনে তার দু-একটা অন্ততঃ খুলে না ধরে থাকতে পারলনা— "ওধারে যে নতুন রাস্তাটা তৈরী করছে, তার নাম হবে শম্ভুচরণ রাজপথ। ওরা বলাবলি করছিল, শুনে এলাম।"

ঐ নামের কোনো দেশনেতা বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আছেন বলে অভিজিতের জানা ছিলনা। জানতে চাইল, তিনি কে ?

"সে-ই সব", অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দেওরের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন বৌরাণী, "তারই কথায় ওরা ওঠে বসে।....সে যাক। তালা ভাঙা হলে তাড়াতাড়ি হল ঘরটা সাফ করিয়ে ফেল। আর সময় নেই।

শেষের নির্দেশটা হলধরের উদ্দেশে। দিয়েই যাবার জন্যে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন, মিস্ত্রী বলল, এই বোধকরি সেই কত্তা, যেনার আগুনের কথা শোনছিলাম ?

—হ্যাঁ ; আমাদের ছোটবাবু।

—পেরাতোপেন্নাম···

নিজেকে আবার সসম্ভ্রমে নুইয়ে দিল অভিজিতের সামনে। তারপর বলল, হ, দেইখ্যাই বুঝছি। আজ নাকি আপনার এহানে গান বাজনা অইবো মাঠাইরেন ?

—হ্যাঁ ; কোলকাতা থেকে আমাদের ওস্তাদজী এসেছেন। তাঁর গান হবে।

—আমরা এট্টু শোনবোনা ?···বিনীত এবং কিঞ্চিৎ সলজ্জ কণ্ঠে আবেদন জানাল মিস্ত্রী। বৌরাণী কিছু বলবার আগে হলধর বলে উঠল, এই সেরেছে ! সে সব তোমরা কী বুঝবে ?

এবার রীতিমত উষ্মার সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল মিস্ত্রী, "ক্যান্ ? গান কি আমরা শুনি নাই কোনোদিন ? মনোহর চক্কোত্তির কবিগান শুনছি। ফী বছর বড় পূজার সোমায় তিন দিন ধইর‍্যা মতিরায়ের যাত্রা শুনছি আমাগো জমিদার বাড়ির নাটমন্দিরে। রাসের সোমায় ঢপ। কত বড় বড় দল আসত ঢাকার থিকা।

"আরে, একি তোমার সেই কবি আর ঢপ ? এ হল—"

হলধরের কথা শেষ হলনা। তার মাঝখানে শোনা গেল অভিজিতের স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বর—বেশ তো, তোমরা যারা যারা শুনতে চাও, এসো।

বৌরাণী কয়েকপা এগিয়ে গিয়েছিলেন। কথাটা কানে যেতেই একটু যেন অবাক হয়ে দেওরের মুখের দিকে তাকালেন।

॥ ২ ॥

পঞ্জিকার মাপে অঠারো-উনিশ বছর। কিন্তু কালবিবর্তের যদি কোনো মাপকাঠি থাকত, দেখা যেত সেদিনের সঙ্গে আজকের ব্যবধান অপরিমেয়। এই কটা বছরের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে যেন একটা শতাব্দীকে ভরে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের এতটা সুদীর্ঘ অধ্যায়। তার একদিকে বিপুল বিধ্বংশ, আরেক দিকে পুনর্গঠনের বিপুল আয়োজন। একদিকে বহুপুরুষের গড়ে তোলা জীবন-ধারার অবলোপ, আরেক দিকে নতুন গড়ে ওঠা জীবন-প্রবাহের সূচনা, মাঝখানে কত ওঠা-পড়া, ভাঙাগড়া এবং তাকে আশ্রয় করে কত অশ্রুজল, কত আর্তনাদ, সভ্যতার মানবতার কত নির্লজ্জ লাঞ্ছনা! যেন একটা সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য নদীর বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে মহাসমুদ্রের ঢেউ।

স্বরূপকাঁদি বাঁড়ুয্যেবাড়ির এই ঐতিহাসিক হল-ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার বর্তমান বংশধর অভিজিতের মনে এই কথাগুলো বারবার আলোড়িত হয়ে উঠছিল। কিছুক্ষণ পরেই এখানে গানের আসর বসবে। তার মোটামুটি আয়োজন প্রায় শেষ। সমস্ত মেঝে জুড়ে সতরঞ্চি বিছানো। একদিকে খানিকটা অংশে জাজিম পড়েছে, তাকিয়াও রয়েছে গোটাকয়েক। ওখানে বিশিষ্ট শ্রোতারা বসবেন। তার ধার ঘেঁষে ওস্তাদজী এবং তাঁর বাজিয়েদের জন্য পুরু গদি, আগেকার দিনে যেমন থাকত। সব কিছু থেকে একটা পুরনো ভাঁপসা মত গন্ধ উঠছে। হলধর সব জানালা দরজা খুলে দিয়ে ধুপ-ধুনার ব্যবস্থা করতে গেছে।

মাথার উপর ঝাড়গুলো ঝাড়া হয়েছে। কিন্তু আগেকার দিনে প্রতিটিতে যে একশ আটটা করে মোমবাতি জ্বলত, তা আর জ্বালা হয়নি। তার বদলে এখানে ওখানে গোটাকয়েক পেট্রোম্যাক্স্ ঝুলছে। সংখ্যাটা এতখানি জায়গার পক্ষে নিতান্ত অপ্রতুল। সেই আবছায়া আলোয় বিবর্ণ দেয়ালের গায়ে মহাকালের রূঢ় হস্তের অবলেপ আরো যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার মাঝে মাঝে যে বহুমূল্য বিশাল তৈলচিত্রগুলো দাঁড়িয়ে আছে—বেশির ভাগ

এবাড়ির বংশপ্রধানদের প্রতিকৃতি,—তারা যেন ইতিহাসের আরো কয়েক স্তর পিছনে চলে গেছে।

অভিজিৎ ঘুরে ঘুরে ছবিগুলো দেখছিল। ভালো করে ঝুল ঝাড়া হয়নি, কোথাও মাকড়সার জাল জড়িয়ে আছে। তার আড়ালে যাঁরা দাঁড়িয়ে কিংবা বসে আছেন তাঁদের কারো মুখে দম্ভের ভ্রূকুটি, কারো মুখে অনুকম্পার প্রসন্নতা। ধন ও জীবন নিয়ে এঁরা ছিনিমিনি খেলে গেছেন। যেখানে দিয়েছেন, উজাড় করে দিয়েছেন। যেখানে নিয়েছেন শেষ কিছুই রাখেননি। এক হাতে পোষণ, আরেক হাতে শোষণ; বামে নিগ্রহ, দক্ষিণে অনুগ্রহ—এই ছিল তাঁদের জীবন দর্শন। প্রাণের কোনো দাম ছিলনা তাঁদের কাছে, তা সে নিজেরই হোক বা পরেরই হোক। প্রয়োজন মত দুটোই সমভাবে তুচ্ছ। নিতেও যেমন দ্বিধা করেননি, দিতেও কোনো কুণ্ঠা দেখাননি।

নারীর একটি মাত্র রূপ তাঁরা চিনেছিলেন—সে ভোগ্যা, সে সুরার সমগোত্রা, উচ্চাঙ্গ বিলাসের অন্যতম উপকরণ। তার মূল্য নিরূপণের মাপকাঠিও ঐ একটি—সম্ভোগের প্রয়োজন মেটানো। তাই যে রমণী দিনান্তে পেয়েছে বরনারীর গৌরব, সে-ই নিশান্তে নিয়ে গেছে বারনারীর লাঞ্ছনা। রাত্রির মধ্যযামে পদপ্রান্ত সার করেছেন যে মোহিনীর, শেষ প্রহরে তাকে পুরস্কার দিয়েছেন পদাঘাত।

এবার নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরাল অভিজিৎ। এঁদেরই সে অধুনাতন বংশধর। কিন্তু বংশের কোন বৈশিষ্ট্যই তার জীবনে প্রতিফলিত হয় নি। সে শুধু এঁদের রক্তধারার বাহক; চিন্তার নয়, আদর্শের নয়। জীবনযাত্রার যে প্রণালী এঁরা অনুসরণ করে গেছেন, তার সঙ্গেও তার কোথাও মিল নেই। সে নেহাৎ একালের, নিতান্তই অযোগ্য বংশধর। তার এই তেত্রিশ বছরের জীবনে সে অযোগ্যতার মূল্য তাকে বহুভাবে দিতে হয়েছে। হয়তো আজও সে পর্বের শেষ হয়নি।

হলঘরের ওপাশের দেওয়ালে কার ছায়া পড়ল। বৌরাণী আসছেন। বাঁড়ুয্যেবাড়ির বিধবা বড় বৌ। উত্তরচল্লিশ, গৌরাঙ্গী। দেহে কিঞ্চিৎ মেদ সঞ্চার হলেও বিগত যৌবনের রূপাবশেষ এখনো বর্তমান। অভিজিৎ তার স্মৃতিভারনত চোখদুটি তুলে ভ্রাতৃজায়ার দিকে দেখতে লাগল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছেন বৌরাণী। পরনে প্লেন শান্তিপুরী থান। সাদা পাড়, তার নীচে কিংবা আঁচলায় একটি সূক্ষ্ম জরির টান পর্যন্ত নেই। অভিজিতের মনে পড়ল তার বিধবা পিসীমার কথা। উৎসবে পরবে, কিংবা এমনি গান বাজনার আসরে রূপালি জরির চওড়া পাড় ও বিশাল আঁচলাওয়ালা জমকালো বেনারসী পরে চিকের আড়ালে এসে বসতেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। আর ঐ বৌরাণী সেদিন কী পরত? আগাগোড়া বহুমূল্য শাড়ী ও হীরা জহরতে জড়ানো বাঁড়ুয্যেবাড়ির কিশোরী বধূর সেই ওড়না ঘেরা হাসি-হাসি মুখখানা মনে করতে চেষ্টা করল অভিজিৎ। তার উপরেও যেন একটা সূক্ষ্ম ধূসর পরদা নেমে এসেছে।

মহামায়া হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে কলকণ্ঠে বলে উঠলেন, ওমা, তুমি এখানে! আমি সারা বাড়ি খুঁজে মরছি। এই মাত্তর হলধরকে বলে এলাম, ছ্যাখতো গঙ্গার ধারে গেল কি না। ছেলে বেলায় তো ওখানে গেলেই তোমাকে পাওয়া যেত। মনে আছে? সে গঙ্গা আর নেই ভাই। যা দেখে গিয়েছিলে, তার পরে আরো মজে গেছে। বৈশেখ জ্যৈষ্ঠি মাসে হাঁটু জলও থাকে না। কোনো কোনো জায়গায় তো এপার ওপার একেবারে শুকনো। বর্ষাকালে অবিশ্যি আগের মতই ফেঁপে ফুলে ওঠে। তখন মনে হয় পুরনো ভাগীরথী আবার ফিরে এল।

এতগুলো কথার কোনোটাই বোধহয় অভিজিতের কানে গেল না, গেলেও মনে পৌঁছল না। সে তখন কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হলের একটা ধারের দিকে চেয়ে ছিল। সেখানে দৃষ্টি রেখেই বলল, সেই রাতটার কথা তোমার মনে পড়ে বৌরাণী?

—কোন্ রাতটা ভাই? তোমাদের সংসারে এসে মনে পড়বার মত রাত তো একটা দুটো দেখিনি।

—তা ঠিক। তবু আমার কাছে তার জোড়া নেই। কী নাম যেন সেই বাইজীর?

মহামায়া আগেই আন্দাজ করেছিলেন, কোন রাতের কথা বলছে অভিজিৎ। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কী একটা বাই-টাই হবে; আমার ঠিক মনে নেই।

সেই জায়গাটা অভিজিতের স্পষ্ট মনে আছে, যেখানে সে বাইজি শুয়ে ছিল। ঠিক শোয়া নয়, শরীরটা কোনো রকমে এলিয়ে দিয়ে পড়ে ছিল। মাথার উপরে কতগুলো ঝাড় একেবারে নিভে গেছে, বাকীগুলোতে কয়েকটা করে মোমবাতি তখনো জ্বলছে। সেই সামান্য আলোতেও কাপড় গয়নাগুলো ঝলমল করছিল। কিন্তু সেই মুখটা? ঘুমন্ত মানুষের মুখ যে কত কুৎসিত হতে পারে, সেই প্রথম দেখেছিল অভিজিৎ। এই মুহূর্তে আবার নতুন করে ভেসে উঠল তার চোখের উপর।

সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বৌ-রাণীর দিকে চেয়ে একটু হাসল। কিশোর বয়সের কোনো আচরণ স্মরণ করে পরিণত বয়সের সলজ্জ হাসি। বলল, আজ মনে হচ্ছে, বড় ছেলেমানুষি করে ফেলেছিলাম সেদিন।

—ছেলেমানুষরা তো ছেলেমানুষিই করে। বড়রা তাকে সেই ভাবেই দেখে থাকেন। আমাদের কত্তারাও যদি তাই দেখতেন সেদিন!

—না দেখবার কারণ ছিল। তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম। এই বাড়ির, এই বংশের একটা পনর বছরের ছেলে! অতখানি কড়া শাসনের বেড়া ভেঙে গভীর রাতে এত বড় একটা দুঃসাহসের কাজ করে বসল। কেন, কোথায় তার যন্ত্রণা, সেটা বোধহয় কেউ ভেবে দেখেননি। হয়তো ভেবেছিলেন সে যা করল সেটা যেন তাদের ওপরে একটা কঠোর ধিক্কার। কাজেই কঠোর হাতেই তার শাস্তি দিলেন।

—তুমি হয়তো জাননা, সে শাস্তি তুমি একা পাওনি ঠাকুরপো।

—জানি, তোমাদের সবাইকেই তার ভাগ নিতে হয়েছে। বিশেষ করে মাকে।

—আমাদের কথা ছেড়ে দাও। মায়ের কথাও ধরি না। বিধাতা বোধহয় দুঃখ আর লাঞ্ছনার বোঝা বইবার জন্যেই তাঁকে এ সংসারে পাঠিয়েছিলেন, আর সেই মতো একখানা বুকের পাটাও দিয়েছিলেন। শাস্তিটা যিনি দিয়েছিলেন, তার সবচেয়ে বড় ভাগটা তিনি নিজেই ভোগ করে গেছেন। সে খবর হয়তো তোমার কাছে পৌঁছয়নি। সেই কথাই তখন বলছিলাম। সে রাতের পর এ মহলে আর আলো জ্বলেনি।....থাক, আজকের দিনে ওসব কথা ভাবতে নেই। চল, কাপড়-জামাটা বদলে তৈরী হয়ে নাও।

অভিজিৎ নিজের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, আবার কী বদলাবো! এই তো বেশ আছে।

—ওমা, এই মিলের ধুতি আর গেঞ্জি পরে গানের আসরে বসবে নাকি! না, সে হয় না। তোমার জামাকাপড় আমি ঠিক করে রেখেছি। এসো; আমার আর দাঁড়াবার উপায় নেই। লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে।

—তুমি চল, আমি আসছি।

মহামায়া ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। সেইদিকে চেয়ে অভিজিৎ আবার সেই পুরনো দিনে ফিরে গেল।

বৌরাণীর সঙ্গে তার মায়ের কোথাও মিল নেই। তবু আজ এই মুহূর্তে তাঁকেই হঠাৎ মনে পড়ল—পিছন থেকে দেখা একখানি অস্পষ্ট, নিশ্চল অবয়ব, সেদিনকার সেই বিশেষ রাতটির সঙ্গে যার দুঃসহ স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আজ থেকে আঠারো বছরের ব্যবধান। তবু সে এতটুকু ম্লান হয়নি।

রাত তখন কত? বোধহয় দুটো-আড়াইটে হবে। হঠাৎ একটা কি স্বপ্ন দেখে অভির ঘুম ভেঙে গেল। ওদিকের খাটখানা মায়ের। প্রথমেই চোখ পড়ল তার উপর। বিছানা খালি। একি! কোথায় গেলেন মা! বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর নিজের কাছেই লজ্জিত হল। কোথায় আর যাবেন? বারান্দার ওধারে মেয়েদের স্নানের ঘর। সেখানে গেছেন হয়তো, এখনি এসে পড়বেন।

অভি শুয়ে পড়ল, কিন্তু চোখ রইল দরজার দিকে। দশ মিনিট, পনর মিনিট কেটে গেল। এবার সত্যিই ভয় হল। বিছানা থেকে নেমে ভেজানো দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল বারান্দায়। অন্ধকার রাত। দূরে বাইরের মহলে দু-একটা চৌদ্দলাইট ছাড়া, কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না। শুধু নির্মেঘ আকাশে এক আকাশ তারার প্রদীপ। তারই ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল, বারান্দার এক ধারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মা। মাথার আঁচল নেমে এসেছে কাঁধের উপর। দূর থেকে সেইটুকুই শুধু চোখে পড়ে। দাঁড়িয়ে থাকার সেই বিশেষ ভঙ্গিটির মধ্যে জড়িয়ে আছে যেন কত দিনের কত গভীর অবসাদ।

পনের বছরের ছেলে অভিজিৎ। এখনো মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ সে চেনে। মায়ের এমন ক্লান্ত অসহায় মূর্তি সে কখনো দেখেনি। তার হঠাৎ মনে হল, মা বড় একা।

খানিকক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতেই তিনি চমকে উঠে এদিকে মুখ ফেরালেন। অভি দেখল, তাঁর ছুচোখ ভরা জল। সবিস্ময়ে বলে উঠল, কী হয়েছে মা?

স্থলোচনা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে ফেললেন। ছেলের কাঁধটা ধরে বললেন, এত রাত্তিরে উঠেছিস কেন? চল, শুবি চল।

অভি আর কিছু জানতে চাইল না। মা তার বাহু ধরে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, হঠাৎ উঠে পড়লি যে? স্বপ্ন দেখেছিস বুঝি? ঘুমিয়ে পড়। রাত জাগলে অসুখ করবে। জল খাবি?

—না।

অভি চুপ করে পড়ে রইল। নিমীলিত চোখের সামনে ভেসে উঠল আবছায়া আলোয় ঢাকা মায়ের সেই অশ্রু-সজল মুখখানা। সে অশ্রুর উৎস তার সবটুকু জানা সেই। ছেলে বয়সের বুদ্ধি দিয়ে যেটুকু বুঝল, তাতেই তার সমস্ত মন ক্ষোভে, বেদনায় ভরে উঠল।

অভি জানে আজ তিন দিন হল তার বাবা দিনে রাতে একবারও ভিতর মহলে আসেননি। সে লক্ষ করেছে, বরাবরের মত এ কদিনও মা তাঁর প্রিয় রান্নাগুলো নিজের হাতে রেঁধেছেন। রোজ ঠিকসময়ে তাঁর খাবার ঘরে আসন দেওয়া হয়েছে। বাবা খেতে বসলে যেখানে বসে মা তাঁকে নিজে হাতে হাওয়া করেন, তারই কাছে পাখাখানা রেখে দেওয়া হয়েছে। সে আসনে কেউ বসেনি, সে পাখার কোনো ব্যবহার হয়নি। বিকেল বেলা ঝি এসে তুলে নিয়ে গেছে। আহারের পর যে পালঙ্কের বিছানায় বাবা বিশ্রাম করেন, মা যথানিয়মে সেটা আরেকবার ঝেড়ে ঝুড়ে, চাদরটা ঠিক করে দিয়েছেন। গড়গড়ার জল বদলে রোজ যেখানে বসানো হয়, এ তিনদিনও সেইখানে রেখে গেছে তাঁর খাসচাকর দিবাকর। মা তার নলটাকে এদিকওদিক নাড়াচাড়া করে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন, যেখান থেকে সহজেই হাতে ধরিয়ে দিতে পারেন। মুখ মুছবার

তোয়ালেটাকে খুলে, আবার পাট করে টিপয়ের উপর গুছিয়ে রেখেছেন। কিন্তু যে মানুষটির জন্যে এত সব আয়োজন তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি।

কেন তিনি আসেননি, সে কথা অভিকে স্পষ্ট করে কেউ বলেনি, কারো কাছে সে জানতেও যায়নি। এটুকু সে নিজের মনেই বুঝেছে, এর মধ্যে তাদের পরিবারের একটা গোপন লজ্জা জড়িয়ে আছে। এই ক'রাত ধরে হল-ঘরে গান বাজনার আসর চলছে, এ খবর সে জানে। লক্ষ্ণৌ থেকে একজন বাইজী এসেছে এবং তার দলবল নিয়ে তাদের বাড়িতেই আছে, তাও তার জানা। সদর মহলের ঘরগুলোতে ওদের আস্তানা এবং চলাফেরা ; তার মত ছোট ছেলেদের কাছে সেটা নিষিদ্ধ জগৎ। সেখানকার ঘটনাবলী সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলেও চাকরবাকরদের চাপা গলায় কথাবার্তা, আভাস-ইঙ্গিত, অনেক রাত পর্যন্ত পান ভোজনের অপর্যাপ্ত আয়োজন, আমলা গোমস্তাদের ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি এবং ওদিক থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসা অসংযত কোলাহল—এর সবগুলোর সঙ্গেই যে গৃহকর্তার এই কদিনের অনুপস্থিতির কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে, পনর বছরের ছেলের পক্ষে এটুকু অন্ততঃ না জানবার কথা নয়।

এই আবহাওয়াতেই অভিজিতের জন্ম এবং এরই মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু অন্য সকলে যেমন এগুলোকে এ বাড়ির স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ধরে নিয়েছে, তার পক্ষে সেটা তেমন সহজ হয়নি। শিশুকাল থেকে বাঁড়ুয্যেবাড়ির কনিষ্ঠ বংশধরটি যেন একটু আলাদা ধরণের, ঠিক বংশের ধারা পায়নি। এটা অনেকেই লক্ষ করেছে, কেউ কেউ বলাবলিও করেছে। তার বেশী এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। কেউ জানেনা, যেমন যেমন চোখ ফুটেছে এর বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষ এবং অলক্ষ্য বিতৃষ্ণা তার কচি মনে একটু একটু করে দাগ কেটে বসছিল। আরো যখন বড় হল সে, নিজের মধ্যে অনুভব করছিল, এই সব ব্যাপারে তার বাবা যে অংশ গ্রহণ করেন, সেটা শুধু তাঁর দিক দিয়েই লজ্জাকর নয়, তার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে তার মায়ের অসম্মান।

অথচ মা যেন সে সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন নন। এই তিনদিন ধরে অভি তার মায়ের প্রতিটি কথাবার্তা, প্রতিটি আচরণ লক্ষ করেছে এবং মনে মনে বিস্মিত হয়েছে। সহজ ভাবে চলছেন ফিরছেন, কাজকর্ম করছেন,

ঝি চাকরদের আদেশ নির্দেশ দিচ্ছেন। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, বিন্দুমাত্র ছন্দ-পতন নেই। যেন কোনো রকম ক্ষোভ, বেদনা বা লজ্জার কারণ ঘটেনি।

হঠাৎ অসময়ে ঘুম ভেঙে উঠে গভীর রাত্রির অস্পষ্ট আলোয় মার সেই মৌনী মূর্তিটি যখন চোখে পড়ল, অভির সে বিস্ময় আর রইলনা। চোখের উপর থেকে একটা পরদা কে যেন সরিয়ে দিয়ে গেল। সে যেন সহসা আবিষ্কার করল, সমস্ত দিন ধরে এতবড় সংসারের গৃহকর্ত্রীর অগণিত কর্তব্যের আবর্তনে যাকে সে ঘুরতে দেখে, সেটি তার মায়ের যান্ত্রিক অবয়ব, আর এই নিশীথ রাত্রে নির্জন অলিন্দের এক কোণে রেলিং আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে আছে যে অশ্রুমুখী নারী, সে-ই তার মায়ের সত্যিকার রূপ—লাঞ্ছনা ও বঞ্চনায় হতমান, লজ্জা ও বেদনায় অবনমিত।

কিছুক্ষণ আগে মা তার কাছ থেকে উঠে গেছেন। বোধহয় মনে করেছেন, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিংবা সেই ভোর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আর বসে থাকতে পারেননি। শুয়ে পড়েছেন। তার দিকে পিছন ফিরে ওদিকের দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়েছেন। দেয়াল-বাতির মৃদু আলোয় দেখা যাচ্ছে তাঁর সঙ্কুচিত দেহ। পা দুখানা হাঁটুর কাছে গোটানো। আগের চেয়ে অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন মা। মনে হচ্ছে যেন একটি ছোট মেয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

চেয়ে থাকতে থাকতে অভিজিতের বড় মায়া হল। এতবড় পরিবারের গৃহিনী! এত টাকাকড়ি লোকজন, এত কর্তৃত্ব প্রভুত্ব সব থাকতেও মা বড় নিঃস্ব, বড় দুঃখী। কিন্তু কেন? কিসের জন্য মাকে এই রাত্রির অন্তরালে চোখের জল ফেলতে হয়? ভাবতে গিয়ে অভির মনে একটা বিদ্রোহের শিখা জ্বলে উঠল। নির্দিষ্ট কারো বিরুদ্ধে নয়, এ বাড়ির সব কিছুর বিরুদ্ধে, বিশেষ করে সদর মহলে যা ঘটছে,—যে উচ্ছৃঙ্খল বিলাস, যে মত্ততা, চোখে না দেখলেও যার নির্লজ্জ চেহারাটা কারো কাছেই লুকোনো নেই।

অভির মনের আগুন ক্রমশ তার মাথার ভিতর ছড়িয়ে গেল। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। এর একটা বিহিত চাই, এবং তাকেই সেটা করতে হবে। কী বিহিত, কেমন করে করবে, কতখানি তার ক্ষমতা, সে সব ভাবনা একবারও মনে এলনা। কৈশোরের আত্মবিশ্বাস বড় প্রবল।

মার খাটের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। ঘুমিয়ে পড়েছেন। সাবধানে দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল।

অন্দর মহল পেরিয়ে মাঝের মহল, তারপর সদর মহল। কোথাও কোনো জীবনের চিহ্ন নেই। অথচ কিছুক্ষণ আগেও এতবড় বাড়িটা জুড়ে গতি ও শব্দের উদ্দাম ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। এদিকে কাজে ও অকাজে ব্যস্ত লোকজনের হাঁকডাক, ছুটোছুটি, ওদিকে তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠের সঙ্গে তবলা সারেঙ্গী, ঘুঙুরের জটলা এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে বেসুরো উল্লাস। সব কিছুর উপর কে যেন একটা প্রাণহীন স্তব্ধতার আবরণ টেনে দিয়েছে।

দীর্ঘ দরদালান পার হয়ে হল্-ঘরের সিঁড়ির সামনে এসে অভিজিৎ হঠাৎ থেমে গেল। পা দুটো কেঁপে উঠল। তার মত ছেলের পক্ষে এটা নিষিদ্ধ রাজ্য। যতদিন মুজরা চলে, এ অঞ্চলের ধারে কাছেও প্রবেশের অধিকার নেই। পরমুহূর্তেই জোর করে সব দ্বিধা কাটিয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেল। নিষেধের বেড়া ভাঙবার সংকল্প নিয়েই তো তার এই নিশিথ রাত্রির অভিযান।

দরজা খোলা। হল-জোড়া জাজিম। এখানে ওখানে গুটিয়ে গেছে। বিশাল বিশাল তাকিয়াগুলো অগোছালো ভাবে যেখানে সেখানে পড়ে আছে। কতগুলো খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল অভিজিৎ।

হল পেরিয়ে ওদিকের ঘরগুলোর কোনো একটা তার লক্ষ। ঠিক কোনটা সে জানে না। কিন্তু পেরোবার আগেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হল।

পাশের দিকে খানিকটা জায়গা উঁচু গদির উপর ভেলভেটের কার্পেট দিয়ে ঢাকা। রক্ত রং-এর কার্পেট। চারদিকে ছড়ানো বাদ্যযন্ত্র। তার মাঝখানে বেঁকে চুরে অনেকটা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একটা নারীদেহ মাথার উপরকার ঝাড়গুলোর নিবন্ত ক্ষীণ আলোয় তার মুখের একটা পাশ দেখা যায়। ঠোঁট দুটো অনেকখানি ফাঁক হয়ে আছে।

অভিজিৎ আর একটু কাছে সরে গেল। এই কি সে-ই? প্রথমে মনে হল, না। শুনেছিল, তার জন্যে একটা আলাদা মহল বরাদ্দ করা আছে। ঐ দিকে। তাহলে এখানে এইভাবে পড়ে থাকবে কেন? তাছাড়া, চাকর বাকরদের টুকরো কথাবার্তা থেকে আর একটা কথা তার কানে এসেছিল।

সে অত্যন্ত রূপসী। কিন্তু একী রূপ! শাড়ি ও গয়নাগুলোর দিকে নজর পড়তে আর সন্দেহ রইল না, এই সে-ই। এখানে ওখানে দুচারটি ক্ষীণায়ু মোমবাতির মৃদু আলোতেও সেগুলো ঝলমল করছিল। এই বহুমূল্য সাজ পরে আর কে আসবে এই নিষিদ্ধ মহলে?

অভিজিৎ জানত, এরা মদ খায়। হয়তো তার মাত্রাটা অতিরিক্ত হয়ে গেছে। এই পথটুকু পার হয়ে শোবার ঘর পর্যন্ত যেতে পারেনি। এই খানেই গড়িয়ে পড়েছে।

দেহটা হঠাৎ নড়ে উঠল। ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে উপরের দিকে মুখ করে শুল। সারা অবয়বটা এবার স্পষ্ট দেখতে পেল অভিজিৎ। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এরকম একটা কুৎসিত মুখ সে কোনদিন দেখেনি। পড়ে থাকবার ভঙ্গিটাও কি বিশ্রী! এরা হচ্ছে সেই ছেলেবেলায় ঠাকুরমার কাছে শোনা রূপকথার রাক্ষসী। রাত্রির প্রথম প্রহরে সকলের সামনে 'রূপবতী কন্যার' অপরূপ সাজে দেখা দেয়। অনেক রাতে সেটা খুলে পড়ে যায়। বেরিয়ে আসে তার নিজের রূপ।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে অভিজিতেব কিশোর প্রাণে একটু যেন করুণার স্পর্শ লাগল। যে কঠোর মনোভাব নিয়ে এসেছিল, তার মধ্যে একটুখানি কোমলতার আভাস। কুশ্রী, কিন্তু বড় অসহায়। এর কী দোষ?

পরক্ষণেই সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে ডাকল, "শুনছেন?" কোনো সাড়া নেই। অভিজিৎ স্বর চড়াল, "দেখুন—"। যার উদ্দেশ্যে বলা তার কানে গেল বলে মনে হল না। একটুখানি ইতস্তত: করে মাথা ধরে নাড়া দিতেই বাইজী চোখ মেলে তাকাল। রক্তাভ দুটি চোখ, তার মধ্যে বিস্ময় ও বিরক্তির ভ্রূকুটি। সেই স্বরেই বলে উঠল—কে?

—আমাকে আপনি চিনবেন না।

বাইজীর ঘুমের বা নেশার ঘোর তখনো কাটেনি। চোখ দুটোও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই বলল, কী চাই?

—আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।...শুনছেন?

আবার চোখ মেলল বাইজী। অভিজিতের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, কী বলছিস?

—ভদ্রভাবে কথা বলুন। আমি বলতে এসেছি, আপনার আর এখানে থাকা চলবে না, এখনি চলে যেতে হবে!

—চলে যেতে হবে! কেন?

উত্তর দেবার আগেই ওদিকের একটা ঘর থেকে ভেসে এল সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর—কে!

মুহূর্তমধ্যে অভিজিৎ যেন পাথর হয়ে গেল। সাড়া দিল বাইজী, দেখুননা কে একটা ছোঁড়া, কী সব বলছে। আমাকে নাকি এখনি চলে যেতে হবে।

অভিজিতের পা দুটো হঠাৎ কেঁপে উঠল। বুকের ভিতর থেকে কে যেন ভীত কণ্ঠে বলে উঠল—পালাও। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ—পালাবো? কৈশোর আর সব সইতে পারে, ভীরুতার অপবাদ সইতে পারে না। তাই এই মুহূর্তে যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে তার সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েও শক্ত গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে সব-কিছুর জন্যে প্রস্তুত।

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শূরজিৎ। বাঁড়ুয্যে বাড়ির প্রধান পুরুষ। দীর্ঘ, উন্নত দেহ। কিঞ্চিৎ মাংসল হলেও দৃঢ়-পেশী। পঞ্চাশোর্ধ্ব, কিন্তু দেহে কোথাও প্রৌঢ়ত্বের শিথিলতার ছাপ পড়েনি। ভারী মুখের উপর সুপুষ্ট, সুবিন্যস্ত গোঁফ। সব কিছু মিলিয়ে পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের একটি সহজ ব্যঞ্জনা প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। অভিজিৎ চোখের কোণ দিয়ে এক পলক বাবার দিকে তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ মাটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

শূরজিৎ হঠাৎ ঘুম ভাঙা চোখে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে প্রথমটা বোধহয় ছেলেকে চিনতে পারলেন না। কয়েক পা এগিয়ে এসেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। গভীর বিস্ময়ে বলে উঠলেন, একি! অভি? তুমি এখানে! এত রাত্রে!

অভিজিৎ নির্বাক। এবার দারুণ ক্রোধে গর্জে উঠলেন শূরজিৎ, বল, কেন এসেছ এখানে?

অভি কি একটা বলতে গেল, পারল না। ঠোঁট দুটো ঘন ঘন কেঁপে উঠল। কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই বেরিয়ে এল কয়েকটি অশ্রু জড়ানো অসংলগ্ন কথা—কেন আপনি মাকে এত কষ্ট দেন? কেন একবারও ভেতরে যাননি?

বলতে বলতে দুচোখ ছাপিয়ে পড়ল জলধারা। দুহাতে মুখ ঢেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

বাইজীটির মুজরা ছিল পাঁচদিনের। দুদিন তখনো বাকী। সকাল হতেই খাজাঞ্চীর ডাক পড়ল কর্তাবাবুর বৈঠকখানায়। তাঁর খাস ভৃত্য দিবাকর গিয়ে ডেকে তুলল। খাজাঞ্চী তো বিশ্বাস করতেই চায় না। কাল দুপুর রাত পর্যন্ত পুরোদমে আসর চলেছে। অন্ততঃ আটটার আগে সদর মহলের কাকপক্ষীর ঘুম ভাঙবার কথা নয়। কর্তা উঠবেন আরো পরে। এই নিয়মই সে অনেক বছর ধরে দেখে এসেছে। কোনোদিন তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

দিবাকর হুকুমটা ধরিয়ে দিয়েই চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে এসে আবার তাড়া দিতেই খাজাঞ্চী ব্যস্ত হয়ে ছুটল। গিয়ে দেখল সত্যিই তাকিয়া ঠেসান দিয়ে গড়গড়া টানছেন মনিব। যেন এই সময়ে এইটাই তাঁর স্বাভাবিক কার্যক্রম, রোজই হয়ে আসছে। তাঁর মুখে বা আচরণেও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই শান্ত ধীর স্বরে বললেন, বাইজীর পাওনা মিটিয়ে দাও।

খাজাঞ্চী কথাটা যেন ঠিক ধরতে পারেনি, এমনি ভাবে তাকাল। শূরজিৎ গড়গড়ার নলটা হাতে নিয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন, শুনতে পাচ্ছ ?

—আজ্ঞে, কথা ছিল, পাঁচদিন পুরো হবার পর টাকাটা একসঙ্গে মিটিয়ে দেওয়া হবে।—ঘাড় চুলকে কোনো রকমে বলল খাজাঞ্চী।

—ওরা আজই চলে যাবে।

—আজই চলে যাবে! তাহলে দুদিনের টাকাটা কেটে রেখে—

—না। চুক্তিমত পুরোটাই ওর পাওনা। তাই দিয়ে দাও।

খাজাঞ্চী 'যে আজ্ঞে' বলে চলে গেল। এ সম্বন্ধে আরো যেখানে যেসব নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন একে একে দিয়ে দিলেন শূরজিৎ। সকলেই বিনা প্রশ্নে মাথা নেড়ে গ্রহণ করল, এবং যার যা করণীয় করে যেতে লাগল। জিজ্ঞাসা রইল মনে কিংবা চোখে মুখে। মুখ ফুটে কেউ জানতে চাইলনা। কোথায়, কার কোন ত্রুটির ফলে এত বড় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল, সেটাও সকলের অগোচরে রয়ে গেল।

খবরটা চাকর বাকরদের চাপা আলোচনার ভিতর দিয়েই একফাঁকে অভির কানে গিয়ে পৌঁছল। তার খুশী হবার কথা। এই তো সে চেয়েছিল। এরই জন্যে পরম দুঃসাহসে ভর করে গভীর রাত্রে ছুটে গিয়েছিল এমন এক বিপদ-সঙ্কুল এলাকায়, প্রকাশ্য দিনের বেলায় যার ত্রিসীমানাতেও তার প্রবেশ নিষেধ। তবু খুশির বদলে একটা কি অজানা আশঙ্কায় তার বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। শুধু নিজের মনে নয়, সারা বাড়িতে সকলের চোখে মুখেও যেন সেই আশঙ্কার ছায়া। পড়ায় মন বসল না। এ বই সে বই নাড়াচাড়া করে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটা দূরে ষ্টেশনের দিকে চলে গেছে, তার খানিকটা দেখা যায়। হঠাৎ নজরে পড়ল তিনখানা গোরুর গাড়ি সার বেঁধে চলেছে। একখানা ছই-ওয়ালা, বাকী দুটো খোলা। বাক্স পেটরা, জিনিস পত্রের সঙ্গে যে লোকগুলো বসে আছে, তাদের দুএকজনকে চিনল।

বাইজী চলে যাচ্ছে।

গোরুর গাড়িগুলো কর্কশ শব্দ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। অভিজিৎ জানালার শিক ধরে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। ছেলেমানুষ হলেও কেমন করে বুঝল, এ যাওয়া ঠিক স্বাভাবিক নয়। এর মধ্যে কিছু একটা অশুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। এইখানেই এর শেষ নয়। হয়তো এ একটা সূচনা। কিসের, তা সে জানেনা, ধারণা করতেও পারল না।

কিছুক্ষণ পরে দরজার গায়ে মৃদুশব্দ শুনে খুলে দিয়ে দেখল, মায়ের নিজস্ব ঝি পাঁচীর মা দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে। জন্ম থেকে এরই কোলে কাঁখে চড়ে মানুষ অভিজিৎ। দুটি চোখ থেকে সব সময়ে যেন স্নেহ ঝরে পড়ছে। এই মুহূর্তে সেদিকে চেয়ে অভির বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করে উঠল। পাঁচীর মা গম্ভীর ভাবে বলল, মা তোমাকে ডাকছে ছোট্দাদাবাবু।

—কোথায়?

—তাঁর ঘরে।

বলেই চলে গেল। অভিজিৎ একটু ব্যস্ত হয়েই বেরিয়ে এল। এ সময়ে তো মা কখনো ডাকেননা। ঘরেও থাকবার কথা নয়। সমস্ত সকালটাই তাঁর নীচে রান্না-ভাঁড়ার নিয়ে কেটে যায়।

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সুলোচনা। অভির নজর পড়ল তাঁর চোখের দিকে। পাতা দুটো ভারী, মণির চারপাশটা লাল। মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক এত নিবিড়, বুঝতে কষ্ট হল না এরই মধ্যে বেশ একটা বড় ঝড় বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে। ছেলেকে দেখেই রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন, কোথায় গিয়েছিলি অত রাত্রে? কে তোকে যেতে বলেছিল?

অভি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝল সবই, কিন্তু বলবার মত কিছু খুঁজে পেলনা। মা কী শুনেছেন, কতটা শুনেছেন না জানলেও তার এক মুহূর্তের হঠকারিতার কঠোর শাস্তি যে তাঁকেই সকলের আগে বইতে হয়েছে, এটা আর অজানা রইল না।

সুলোচনা হঠাৎ তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার মাথার উপর কপোল রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন—তোকে ছেড়ে আমি থাকবো কেমন করে?

অভিজিৎ চমকে উঠল। একথা কেন বলছেন মা? কোথায় যাবে সে?

পাশের ঘরে বাবার সাড়া পাওয়া গেল। মাঝে মাঝে গলা সাফ করবার সেই উচ্চ গম্ভীর শব্দ। অভি জানত না, এই অসময়ে তিনিও তাঁর ঘরে রয়েছেন। এ শুধু আশ্চর্য নয়, অভাবনীয়। এর অনেক আগেই তিনি সদরে গিয়ে বসেন। জ্ঞান হওয়া অবধি বরাবর সেই নিয়মই সে দেখে এসেছে। একদিনের তরেও তার নড়চড় হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

ভারী পায়ের চটির আওয়াজ এগিয়ে এল। মায়ের ঘরের সামনে দিয়েই বাইরের মহলে যাবার পথ। সুলোচনা অভিকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখের কোণ-দুটো মুছে ফেললেন। শূরজিৎ যেতে যেতে এদিকে না ফিরেই শান্ত দৃঢ়স্বরে বলে গেলেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রওনা দিতে হবে।

চটির শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অভিজিৎ চুপ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেও মুখে কিছু বললনা। শুধু একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরল মায়ের মুখের পানে। এই কয়েক মুহূর্ত আগে সেখানে যে ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছিল তার সমস্ত চিহ্ন তখন মিলিয়ে গেছে। ফিরে এসেছে সেই চিরদিনের পরিম্লান প্রশান্তি। বহুদিনের যত্ন ও অভ্যাস দিয়ে গড়ে তোলা সংযমের বাঁধে যদি কোনো সূক্ষ্ম ফাটল দেখা দিয়ে থাকে, সে ক্ষণস্থায়ী। তার একটা ক্ষীণ রেখাও আর চোখে পড়লনা। অন্তরালে যে ঝড় বয়ে চলেছে,

একটি মাত্র ঝাপটাই তার সাক্ষী হয়ে রইল। বাইরে থেকে আর কোনো আভাস পাওয়া গেল না। কণ্ঠস্বরেও তার এতটুকু বেগ ধরা পড়লনা।

ছেলের কপালের উপর থেকে অবিন্যস্ত চুলগুলো সস্নেহে সরিয়ে দিতে দিতে সহজ সুরেই বললেন সুলোচনা, কাশীতে তোর ঠাকুমার কাছে যাচ্ছিস। ওখানকার ইস্কুলে পড়বি। উনি তো তোকে কত ভালোবাসেন। খুব খুশী হবেন তোকে কাছে পেলে। …পারবি না থাকতে?

অভির বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। ছোট হলেও বুঝল, মায়ের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ তার শাস্তি। শুধু তার নয়, সেই সঙ্গে মায়েরও। তার কাছে মা যতখানি তার চেয়ে সে যে তাঁর অনেক বেশী, একথা সে যেমন জানে, এই শাস্তির বিধান যিনি দিয়েছেন তাঁরও অজানা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের কথাটাই তার বড় হয়ে দেখা দিল। জন্ম থেকে মাকে ছেড়ে কোথাও যায়নি, একদিনের তরেও কোনোখানে গিয়ে থাকেনি। তাছাড়া, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশাল পুরীর জীবনধারার সঙ্গে সে কোথাও অন্তরের যোগ খুঁজে পায়নি, সব কিছু থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। সেই বিচ্ছেদই তাকে মায়ের আরো কাছে এনে ফেলেছে। তাদের ভিতরকার বন্ধনকে ক্রমশঃ অবিচ্ছেদ্য করে তুলেছে।

ছেলে যখন বড় হয়, সে মাতৃঅঙ্কের পরিধির বাইরে গিয়ে পড়ে। নানা দিক থেকে নানা আকর্ষণ তাকে টানে, নানা বন্ধন এসে জড়িয়ে ধরে। মায়ের থেকে দিন দিন তার দূরত্ব বাড়তে থাকে। সেইটাই প্রকৃতির নিয়ম। শিশু কিশোর হয়, তার মন ডানা মেলতে শেখে। তখন কেবল মাত্র মাকে ঘিরে তার যে ক্ষুদ্র নীড় তার মধ্যে আর তাকে ধরে না। যে পরিবারে অভিজিতের জন্ম সেখানে এই বিবর্তন আরো দ্রুত। এখানে পুরুষের জীবন বেশী মাত্রায় বহির্মুখী। ছেলেরা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে এবং অন্তঃপুরের বাইরে গিয়ে পড়ে। অন্য সকলের বেলায় তাই ঘটেছে, অভির বেলাতেও না ঘটবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু এখানে দেখা দিল উলটো স্রোত। বাঁড়ুয্যে বাড়ির জীবনযাত্রার যে চিরন্তন গতি তার সঙ্গে সে ঠিক পা মেলাতে পারলনা। সেখানে কোথাও জায়গা না পেয়ে তার কিশোর মন আশ্রয় খুঁজল মায়ের কাছে, তাঁকেই আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরল।

সেই মাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে হবে। কে জানে কতদিনের জন্যে? ভাবতে গিয়ে সমস্ত বুকখানা যেন মুচড়ে ভেঙে যাচ্ছিল।

সুলোচনা এতক্ষণ ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যে-ভাষা সেখানে ফুটে উঠেছিল, তার প্রতিটি অক্ষর দাগ কেটে কেটে বসে যাচ্ছিল তাঁর বুকের ভিতর। বাইরে সে যন্ত্রনার ক্ষীণ আভাসটুকুও দেখা গেলনা। যেন অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক একটা কোনো তুচ্ছ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, এমনিভাবে হেসে বললেন, অত ভাবছিস কী! চিরদিন বুঝি মার কাছে থাকা যায়? বড় হয়েছ, এবার বিদেশে গিয়ে পড়াশুনো করতে হবে না?

অভিজিৎ বলতে পারত, গ্রামের স্কুল থেকে পাশ করে বেরোতে এখনো তার দুবছর বাকী। এখন এই বছরের মাঝখানে হঠাৎ কাশী গিয়ে পড়াশুনো করবার কী প্রয়োজন দেখা দিল? বলল না। মা কি তা জানেন না? সে শুধু তাঁর সেই হাসিটির দিকে চেয়ে রইল। তার অন্তরালে যে নিরুপায় অক্ষমতার তীব্র বেদনা তিনি বহু যত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন ঐ আবরণ ভেদ করে সেইটাই তার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখল মায়ের সেই অসহায় রূপ, কাল রাত্রে অন্ধকার বারান্দার কোণে যার দুঃসহ দৃশ্য তাকে উন্মাদ করে তুলেছিল। আজ এই হাসির মধ্যে সে যেন আরো পরিস্ফুট।

এই কথা মনে হতেই তার নিজের দুঃখ বেদনা হঠাৎ লঘু হয়ে গেল। মায়ের এই অসম্মান ও অসহায়তার যে উৎস, তার উপরে এক তীব্র ক্ষোভ এবং অভিমান কেমন করে যেন মনের মধ্যে বিপুল শক্তি বয়ে নিয়ে এল। সেও হাসিমুখে মহা উৎসাহে বলে উঠল, তুমি কিছু ভেবোনা মা। আমি ঠাকুমার কাছে খুব থাকতে পারবো।"......বলেই ছুটে গিয়ে নিজের পড়বার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

মা ও ছেলের ভিতরকার এই মর্মান্তিক ছলনাটুকু শেষ পর্যন্ত অটুট রইল। ঘণ্টা খানেক পরে মাঝের মহলের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে সুলোচনা যখন ছেলেকে বিদায় দিলেন, তখনও তাঁর মুখে সেই হাসিটি লেগে ছিল। অভিও প্রাণপণে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্নার বেগ রোধ করে রাখল।

ঘোড়ার গাড়ির দরজা পর্যন্ত গিয়ে আর পারেনি। পা-দানির উপর ভেঙে পড়েছিল। তার দাদা ইন্দ্রজিৎ তাকে জড়িয়ে ধরে জুড়ির মধ্যে

তুলে পাশে নিয়ে বসেছিলেন। কাশী পর্যন্ত তিনিই তাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

দাদার সঙ্গে পরেও কয়েকবার দেখা হয়েছে কাশীর বাড়িতে। বাবার সঙ্গেও হয়েছে একবার, ঠাকুরমাকে যেবার দেখতে গিয়েছিলেন। ছেলের সামনেই তাঁর গঙ্গা প্রাপ্তি হয়েছিল। কিন্তু মায়ের সঙ্গে অভিজিতের আর দেখা হয়নি। সে চলে যাবার পর তিনি প্রায় ছ বছর বেঁচে ছিলেন। একেবারে শয্যা না নেওয়া পর্যন্ত শেষ শক্তি দিয়ে সংসারের প্রতিটি দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করে গেছেন। কোথাও কিছুমাত্র ত্রুটি ঘটতে দেননি।

ছোটছেলের কথা তাঁর মুখে কেউ কোনোদিন শুনতে পেতনা। বাড়ির লোকেও সে প্রসঙ্গ বড় একটা পাড়ত না। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র আসতে দেরি হলে মহামায়া স্বামীকে বলে টেলিগ্রাম করিয়ে খবর আনিয়ে শাশুড়ীকে জানিয়ে দিতেন। তিনি নিঃশব্দে শুনতেন। ও নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতেন না।

যখন খুব বাড়াবাড়ি অসুখ, ইন্দ্রজিৎ একদিন বলেছিলেন, অভিকে একটা টেলিগ্রাম করে দিই। গিয়ে অবধি একবারও আসেনি।

সুলোচনা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না, থাক। ওর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে।

ইন্দ্রজিৎ মাকে চিনত। এর পরে আর ও প্রসঙ্গ তুলতে সাহস করেনি।

সুলোচনা কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, আমার অসুখের খবর তাকে জানাবার দরকার নেই।

মৃত্যু যে শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে সকলে লুকিয়ে রাখতে চাইলেও তাঁর নিজের কাছে লুকানো ছিল না। সেই অবস্থাতেও একে একে সকলের খোঁজ খবর নিয়েছেন, ঝি-চাকরদের পর্যন্ত ডেকে পাঠিয়ে তাদের ছেলেপিলে ঘর সংসারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, উপদেশ, নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু একজনের কথা মুখেও আনেননি।

কয়েকদিন পরে বৌরাণী পাশে বসে বুকের উপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। করবার তখন আর কিছুই ছিল না। শুধু সেই শেষ মুহূর্তটির অপেক্ষায় নিঃশব্দে বসে থাকা। তখনো জ্ঞান প্রায় অটুট। মাঝে মাঝে শুধু একটা

তন্দ্রার মেঘ ধীরে ধীরে এসে চেতনাকে আবৃত করে দিচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ পরে সরে যেতেই চোখ খুলে চাইছেন। হঠাৎ বোধহয় পুত্রবধূর মুখের উপর নজর পড়ল। বললেন, তুমি কাঁদছ কেন মা ? তোমার চোখে জল দেখলে আমার কষ্ট বাড়ে। সবাইকে রেখে সকলের চোখের সামনে যেতে পারছি। এতো আমার সুখের যাওয়া। শুধু—বলে থেমে গেলেন।

বৌরাণী উঠে গিয়ে তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, মা আপনার পায়ে পড়ি, একটিবার অনুমতি দিন। ঠাকুরপোকে একটা তার করতে বলি।

সুলোচনার চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বৌরাণীকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন। ধীরে ধীরে বললেন, আমার অভি এ বাড়িতে আসে এ আমি চাইনা বৌমা।

মহামায়ার মুখে আর কোনো কথা সরলনা। স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু চেয়ে রইল।

সুলোচনা বললেন, আমি যখন থাকবোনা, তুমি তাকে ডেকে পাঠিও। আমার হয়ে একটা কথা বলো। বড় শক্ত কথা। কোনো মা-ই বোধ হয় ছেলেকে তা বলেনা, বলতে পারে না।

মহামায়া রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে রইল। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে শোনা গেল কবিরাজ মশাই এর গলা খাঁকারি। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচীর মা মুখ বাড়িয়ে চোখের ইসারা করল। বৌরাণীকে উঠে বাইরে যেতে হবে। তা না হলে করিরাজ আসতে পারছেননা।

মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে উঠে পড়ল মহামায়া, ওদিকের দরজা দিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই কবিরাজ এলেন। রোগিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রবীণ চিকিৎসকের কপালে কটা কুঞ্চন রেখা পড়ল। ইন্দ্রজিৎ এসে দাঁড়িয়েছিল তার পিছনে। তার দিকে একবার চোখ তুললেন। তারপর খাটের পাশে যে চেয়ারটা ছিল, তার উপর বসে পড়ে বিছানার উপর পড়ে থাকা শীর্ণ শিথিল হাতখানা সন্তর্পণে তুলে নিলেন। নাড়িতে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে রইলেন। হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে উঠলেন। ঘাড় ফিরিয়ে ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, কত্তা মশাইকে খবর দাও। তাঁর ইঙ্গিতে

কে একজন ছুটে বেরিয়ে গেল। ইন্দ্রজিৎ সরে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মায়ের দিকে।

পাশের ঘরে ভেজানো দরজার ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বৌরাণী। প্রাচীন জমিদার বাড়ির তরুণী বধূ; তাকে বাইরের লোকের সামনে বেরোতে নেই। প্রবীণ পরিচিত গৃহ-চিকিৎসকের সামনেও নয়। কিন্তু কবিরাজ মশাই-এর ত্রস্ত কণ্ঠ কানে যেতে সে কথা আর মনে রইল না। ছুটে এসে মাতৃসমা শাশুড়ীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। মাতৃসমা কেন? মা। সেই কবে বার-তের বছর বয়সে কোন গরিব ঘর থেকে রূপ ও বংশের জোরে এসে ঢুকেছিল এই বিশাল বাঁড়ুয্যে বাড়ির অন্তঃপুরে। একদিনের তরেও আর সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়নি। নিজের মায়ের ম্লান মুখখানা ধীরে ধীরে ঝাপসা হতে হতে প্রায় হারিয়ে গেছে। তার জায়গায় দিনের পর দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর একখানা মুখ। আজ তার চোখের উপরেই তার সব আলো চিরদিনের তরে নিভে গেল।

জানা হল না, কন্যা-প্রতিমা বধূর কাছে কোন্ 'শক্ত কথাটি' তিনি রেখে যেতে চেয়েছিলেন তাঁর অভির জন্যে, কেন সেটা নিজে বলে গেলেন না; ছ-সাত বছর আগে মিথ্যা হাসির নির্মোক পরে যে কিশোর পুত্রকে তিনি বিদায় দিয়েছিলেন শেষ শয্যার পাশেও কেন একটিবার তাকে দেখতে চাইলেননা। এ কি তাঁর অপরাজেয় অভিমান, না অন্য কিছু—সবই নির্মম রহস্যের আবরণে ঢাকা পড়ে রইল।

হয়তো বলে যেতেন, বলবার জন্যে মনে মনে তৈরী হচ্ছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ আর হলনা।

কর্তা ছিলেন সদর মহলে, এ সময়ে রোজ যেমন থাকেন। স্ত্রীর ঘরের দরজায় এসে যখন পৌঁছলেন, কবিরাজ তখন বেরিয়ে যাচ্ছেন। এ পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। শুধু চিকিৎসক নন, এঁদের সুখ দুঃখ বিপদাপদের অংশীদার। একবার চোখ তুলে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করলেন।

একঘর লোক। আত্মীয় পরিজন, আশ্রিত অনাত্মীয়, দাসদাসী সকলেই উপস্থিত। সমবেত কণ্ঠ থেকে কান্নার আওয়াজ উঠছে। চাপা কান্না। ফুকরে মুখ ফুটে কাঁদতে যেন কারো সাহস হচ্ছে না। এইমাত্র যাঁর চোখের

পাতা দুটি বন্ধ হয়ে গেল তাঁর সম্ভ্রমের ব্যাঘাত ঘটবে! তিনি যেমন নিঃশব্দে চলে গেলেন, তেমনি নিঃশব্দে তাঁকে বিদায় দাও। চেঁচিয়ে, মাথা খুঁড়ে তাঁর বিশ্রামের হানি করোনা।

দরজার মুখে যারা ছিল, তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পথ করে দিল। শূরজিৎ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন শয্যার দিকে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। সকলের অগোচরে বোধহয় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল। তার পরেই মাথানত করে বেরিয়ে গেলেন।

নদীতে যখন ভাঙন লাগে, পথচারী পথিকের চোখের উপর একটার পর একটা চাপ ভেঙে পড়তে থাকে, তারা খবর রাখেনা আসল ভাঙন অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে, সকলের অজ্ঞাতে ভিতরে ভিতরে চলেছে সেই অলক্ষ্য ক্ষয় লীলা।

স্বরূপকাঁদির বাঁড়ুয্যে পরিবারেও সেই অদৃশ্য আয়োজন চলেছিল। একটি পুণ্যবতী নারী তাঁর নিষ্ঠা ত্যাগ, সেবা, শুচিতা এবং সংযমের সুদৃঢ় বাঁধ দিয়ে তাকে আটকে রেখেছিলেন। তিনি চলে গেলেন। ভাঙন তার নগ্ন রূপ নিয়ে দেখা দিল।

প্রথম বলি বংশের বড় ছেলে ইন্দ্রজিৎ। নিয়তির এমনি চক্রান্ত, বাপ যেন নিজে হাতে তাকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দিলেন।

বাখরগঞ্জের দক্ষিণে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে এঁদের একটা কাছারি ছিল। খান কয়েক গ্রাম নিয়ে সামান্য পত্তনি। প্রজার সংখ্যাও অন্যত্র অনেক বড় বড় মহলের তুলনায় নগণ্য। কিন্তু বড় দুর্ধর্ষ তারা। পোষমানা কাকে বলে শেখেনি। বোধহয় শিখতে দেয়নি সেখানকার উদ্দাম প্রকৃতি।

চোখ ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা দেখে এ পাশে গহিন গাঙ্, ও পাশে গহন বন। কোনোটাই বন্ধু নয়। দুদিকেই উদ্যত শঙ্কা, বিপদ, মৃত্যু। জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। স্নান করতে নেমে কামোটের এক কামড়ে গোটা পাখানা দেহ থেকে নিঃসাড়ে খসে যেতে পারে। কাঠ কুড়োতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে পাইথনের পেটে যাওয়াও যে কোন মুহূর্তে সম্ভব। তার উপরে আছে ঝড় আর বন্যা। কখন আসবে কেউ জানেনা, কিন্তু এটা জানে এলে কিছুই রেখে যাবে না।

রুদ্রা প্রকৃতির মধ্যে যাদের জন্ম এবং জন্ম থেকে তারই সঙ্গে নিত্য আনা-গোনা, তাদের প্রকৃতিও সেই ছাঁচে গড়া—নির্মম, কঠোর, দুর্বার।

কিন্তু বাদার প্রকৃতির আর একটা রূপ আছে। কল্যাণীর রূপ। সে শুধু ধ্বংস করে না, সৃষ্টিও করে। নেয় যেমন, তেমন দেয়ও। ক্ষেত ভরে দেয় অপর্যাপ্ত ধান, খাল বিল নদী ভরে দেয় অঢেল মাছ, বাগান ভরে দেয় সুপারি নারকেলের অফুরন্ত সম্ভার। কিন্তু বড় খেয়ালী। কখন দেবে আর কখন নেবে, সে শুধু সেই বলতে পারে।

মানুষগুলোও তেমনি। খুশী হলে উজাড় করে ঢেলে এনে দেয়, রুষ্ট হলে সর্বস্ব কেড়ে নিতে দ্বিধা করে না।

জমিদারের সঙ্গে এদের সম্পর্ক বড় ভঙ্গুর। ভাঙা-গড়ার পালা চলছে সারাজীবন। এই মুহূর্তে অনুগত, পর মুহূর্তে বিদ্রোহী। আজ যে লাঠি তাঁর পায়ের তলায়, কাল সেটা মাথায় পড়তে পারে। এবেলায় যাঁর কাছে জান কবুল করে গেল, ওবেলায় এসে তাঁর জান নিতে কসুর করবে না।

স্বরূপকাঁদির বাবুরা সে কথা বিলক্ষণ জানতেন এবং এখানকার কাছারির আমলা কর্মচারী নির্বাচনে সর্বদা মনে রাখতেন। কাছারি ছোট, আয়ও সামান্য। কিন্তু নায়েবের পদে যাঁরা আসতেন তারা অন্যান্য জায়গার তুলনায় অভিজ্ঞ, কৌশলী ও বিচক্ষণ। তা সত্ত্বেও সংঘর্ষ এড়ানো যেতনা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা-খুন-জখম এবং তাই নিয়ে কয়েক নম্বর ফৌজদারি মামলা লেগেই থাকত।

সুলোচনা যেদিন গেলেন, তারপর থেকে কর্তা প্রায় সব কিছু থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনছিলেন। রোজ একবার সেরেস্তায় গিয়ে বসতেন। কিন্তু আগেকার মত খুঁটিনাটির মধ্যে ঢুকতেন না। জটিল কোনো বিষয় হলে আদেশ, নির্দেশ দিতেন। মাঝে মাঝে সদর নায়েবকে ডেকে বলতেন ইন্দ্রকে জিজ্ঞেস কর। আমি আর কদিন? ওকেই তো সব দেখতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ তখন কিছু কিছু কাজ কর্ম দেখতে শুরু করেছেন। তাঁর সেরেস্তা আলাদা। বয়সের ধর্মে এবং বংশের ধারা অনুসারে ইয়ার-বন্ধুও জুটেছে কয়েকজন। স্বভাব বেশ দাম্ভিক, অর্থাৎ বংশগত বিভব ও মর্যাদা সম্বন্ধে অতি সজাগ। তার উপরে অকারণে রূঢ় এবং অসহিষ্ণু। পারিপার্শ্বিক

সম্পর্কে তেমন সচেতন নন। দিন কাল যে দ্রুত বদলে যাচ্ছে, জমিদার আর আগের মত প্রজাদের দণ্ড মুণ্ডের মালিক নন, তাঁকে বুঝে সুঝে চলতে হয়— এই বাস্তব জ্ঞানের অভাব ইন্দ্রনাথের মধ্যে বড় স্পষ্ট।

শূরজিৎ সেটা লক্ষ করতেন আর ভাবতেন।

এ কেমন করে হল! দুটি ছেলে তাঁর। দুজনের দেহেই তো এক রক্তধারা, বহু পুরুষের নীল রক্ত। একজনের মধ্যে তার কোনো প্রভাব পড়লনা, আরেকজনের মধ্যে সেটা অতিমাত্রায় প্রকট। একজন তার সম্বন্ধে একেবারে অচেতন, আরেকজন অতিরিক্ত সচেতন। দুটোর কোনোটাই স্বাভাবিক নয়। সংসারে অস্বাভাবিক হবার দণ্ড আছে। চারপাশের সঙ্গে মানিয়ে অর্থাৎ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে না পারলে প্রকৃতি তাকে ক্ষমা করে না। একজনকে তাই শুরুতেই সরে যেতে হল। সরিয়ে অবশ্য তিনিই দিয়েছেন। কিন্তু তিনি উপলক্ষ মাত্র। এ তারই প্রকৃতিদত্ত শাস্তি। আরেকজনকেও তার আতিশয্যের ফল ভোগ করতে হবে।

সে 'ফলভোগ' যে আসন্ন, শূরজিৎ ভাবতে পারেননি। পারলে হয়তো সতর্ক হতেন, সেটা রোধ করতে চেষ্টা করতেন।

বাখরগঞ্জের কাছারি থেকে জরুরী খবর এল তিনখানা গ্রামের প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে। তাদের পেছনে রয়েছে সেই মেহেরবক্স্, ওঁদেরই অধীনস্থ একটা ক্ষুদ্র জোতদার। লোকটা যেমন ধূর্ত, তেমনি বেপরোয়া। এতদিন নেপথ্য থেকে কাছারির বিরুদ্ধে আগুন ড়িয়ে বেড়াত। এবার প্রকাশ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। নায়েব তাকে ডেকে পাঠিয়ে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে তাঁকে কোনোরকম আমল দিতে নারাজ।

যে কর্মচারীটি নায়েবের চিঠি নিয়ে এসেছিল, লোকটা সম্পর্কে তার একটা মৌখিক রিপোর্টও পাওয়া গেল। কাছারিতে বসে একঘর লোকের সামনে সে স্পষ্ট জানিয়ে গেছে—

"আপনার লগে কোনো কথা নাই, নায়েব মশয়। আপনি কেডা? বোঝাপড়া করতে হয় আপনার মনিবের লগে করুম্। তারে আসতে কন।"

এই কটি কথা বলে এবং নায়েবের তরফ থেকে কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পত্রবাহক যখন জমিদারের সামনে তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিল, ইন্দ্রজিতও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। শ্লেষের সুরে বলে উঠলেন, আর তোমাদের নায়েব মশাই কী করলেন ?

—আজ্ঞে, তিনি আর কী করবেন ?

"অপদার্থ!" দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় গর্জে উঠলেন ইন্দ্রজিৎ। স্বগতোক্তি হলেও কথাটা সকলের কানে গেল।

শূরজিৎ তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ধীরে ধীরে গড়গড়া টানছিলেন। নলটা সরিয়ে আমলাটির উদ্দেশ্যে বললেন, আচ্ছা, তুমি এখন এসো।

সে চলে গেলে কর্তা নায়েবের চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে ছেলের হাতে দিলেন। ইন্দ্রজিৎ একবার চোখ বুলিয়েই অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি আগেই বলেছিলাম ঐ রকম গোবেচারা নায়েব দিয়ে বাখরগঞ্জের কাছারি চলবে না। কাঁচকলা সেদ্ধ আর আলো চাল খেয়ে জমিদারি চালানো যায় না। ওখানে একজন মজবুত লোক দরকার।

নায়েবটি কর্তার প্রিয়পাত্র। ধীর, স্থির, ধর্মনিষ্ঠ এবং দৃঢ়চরিত্র মানুষ। ঐ রকম একটা সমস্যাসঙ্কুল জায়গার পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত মনে করেই তাঁকে ওখানে পাঠিয়েছিলেন। তার সম্বন্ধে ছেলের এই অসম্মানজনক মন্তব্যে আহত ও অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু বাইরে তার কোনোটাই প্রকাশ পেলনা। তেমনি নিরুদ্বেগে গড়গড়া টেনে চললেন। ইন্দ্রজিৎ বললেন, আমার মনে হয় ওকে এখনি অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়ে নলডাঙা থেকে সত্য ঘোষকে পাঠানো উচিত। তিনদিনে সব সায়েস্তা করে দেবে।

শূরজিৎ যেন প্রস্তাবটা শুনতেই পাননি, এমনি ভাবে বললেন, শশীকে ডেকে বলে দাও, কাল আর হয়ে উঠবেনা, পরশু সকালেই আমি বেরিয়ে পড়তে চাই। সব বন্দোবস্ত যেন ঠিক থাকে।

"এই সামান্য ব্যাপারে আপনাকে ছুটে যেতে হবে!" একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন ইন্দ্রজিৎ, "তাছাড়া আপনার এই শরীর—"

"শরীর আমার ভালোই আছে।"...

সহজকণ্ঠে সংক্ষিপ্ত উত্তর। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ ব্যাপারটাকে অত সহজভাবে নিতে পারলেন না। তাঁর মনে হল এ যাওয়া মানে একটা ক্ষুদ্র অবাধ্য প্রজার কাছে নতি স্বীকার করা। যেহেতু সে নায়েবকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে

সরাসরি জমিদারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাইছে, অতএব তার সেই স্পর্দ্ধাকে মেনে নিতে হবে !

শূরজিৎ পুত্রের মনোভাব আন্দাজ করতে পারলেন। বললেন, আমি বুঝতে পারছি, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, আমাদের একজনের যাওয়া দরকার। তা না হলে—

—"বেশ, তাহলে আপনি কেন যাবেন ? আমি তো রয়েছি। যেতে যদি হয়ই, আমি যাবো।"

—তুমি যাবে ?

—কেন, আমি পেরে উঠবোনা, মনে করছেন ?

এ কথার পর ছেলেকে বাধা দেওয়ার অর্থ সত্যিই তাকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করা। সুতরাং কর্তাকে সম্মতি দিতে হল। তার পিছনে আর একটা সূক্ষ্ম কারণ ছিল। শূরজিতের মনে হল, তাঁর বদলে ছেলে যে নিজে যাবার জন্যে জিদ করছে, তার আসল হেতুটা এ নয়, যে সে বাবার স্বাস্থ্যের জন্যে উৎকণ্ঠিত কিংবা ওখানকার ব্যাপারটাকে লঘু করে দেখছে। ওটা মৌখিক। অন্তরের কথা হল, পিতার শাসন ক্ষমতা সম্বন্ধে সে সন্দিহান। বেশ, তাহলে নিজেই গিয়ে দেখুক একবার। জমিদারি চালানো যে কী বস্তু এতদিন তো টের পায়নি। এবার একটু পরখ করে আসুক।

বহু ঝক্কি ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে ইন্দ্রকে, যা সে ঠিক বুঝতে পারছেনা—একথা নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন শূরজিৎ। কিন্তু চরম বিপদের কথা অনুমান করতে পারেননি।

কাছারির ঘাটে যখন নৌকা ভিড়ল, বেলা প্রায় দশটা। নেমেই নায়েবকে হুকুম করলেন ইন্দ্রজিৎ, আপনার সেই মেহের বক্স্ না কি বক্স্, তাকে ধরে আনতে বলুন।

শিবদাস রায়ের বয়স হয়েছে। যখন সদর-নায়েব ছিলেন, মনিব-পুত্রকে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বললেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের ? এই তো নামলে। বিশ্রাম কর। খাওয়া দাওয়া হোক। ওবেলার দিকে ডাকলেই হবে।…ডাকতেও বোধ হয় হবে না। খবর পেলে সে নিজেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

"তাঁর সেই মেহেরবানির্ অপেক্ষায় বসে থাকতে চাইনা", শ্লেষের সুরে

বললেন ইন্দ্রজিৎ, "তিনি যে আমাদের কুটুম্ব নন, প্রজা, এটাই দেখিয়ে দেওয়া দরকার।"

শিবদাসের মুখ গম্ভীর হল। বললেন, সে একজন সাধারণ প্রজা নয়, জোতদার।

—জানি। শ পাঁচেক টাকা খাজনা দেয় বছরে।

—তাহলেও তার একটা সম্মান আছে—

"সম্মান!" হেসে ফেললেন ইন্দ্রজিৎ। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, "এই করেই আপনি ওদের মাথায় তুলে দিয়েছেন।"

এর পরেও শিবদাস যাকে ঠিক 'ধরে আনা' বলে তা করলেন না। কিন্তু মেহের বক্স্ এসে পৌঁছতেই তাঁর নায়েবের সে 'ত্রুটি' বা 'দুর্বলতা' শুধরে দিলেন ইন্দ্রজিৎ। সাধারণ প্রজারা যেখানে বসে, সরু লম্বা ধরনের একরকম পিঁড়ি, যার নাম 'আলসে' তার উপরে বসতে বললেন। সে বসল না। জমিদারের প্রশ্নের যে সব জবাব দিল, তাও উদ্ধত। ইন্দ্রজিৎ হঠাৎ হুকুম দিয়ে বসলেন, পিঠ-মোড়া করে বাঁধো।

নায়েব গোমস্তারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কিন্তু মনিবের মান রক্ষার জন্যে কারো মুখ খুলবার উপায় নেই। স্থানীয় মুসলমান পাইকরা হুকুম তামিল করতে ইতস্ততঃ করছিল। ইন্দ্রজিৎ দেশোয়ালী দারোয়ানদের ইঙ্গিত করলেন। তারা এগিয়ে এসে হাত দুটো পিছনে টেনে নিয়ে গামছা দিয়ে বাঁধল লোকটাকে। সে একটি কথাও বলল না। শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল জমিদার-পুত্রের দিকে। সে চোখ যারা চেনে, মনে মনে শিউরে উঠল। গোখরো সাপের চোখেই শুধু সে দৃষ্টি দেখা যায়।

সেই রাত্রেই আগুন লাগল কাছারিতে। ইন্দ্রজিৎ ছুটে বেরিয়ে আসতেই অন্ধকারের অন্তরাল থেকে একটা উড়ন্ত ল্যাজা এসে বিঁধল তাঁর পিঠে। বিচিত্র হাতিয়ার! সুপারি গাছের সরু তক্তার একটা দিক কেটে কেটে ছুঁচলো করা হয়েছে। আশ্চর্য শক্তি তার। দেখা গেল, দেহটা প্রায় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে।

মায়ের মৃত্যুসংবাদ যথাসময়ে অভিজিৎকে জানানো হয়েছিল। চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়ে ছিলেন ইন্দ্রজিৎ। সে আসেনি। কি দেখতে আসবে?

শ্রাদ্ধের ঘটা ? কিছুতেই মন সরল না। মায়ের শেষ কাজ—তার যেটুকু করণীয়—কাশীতেই পুরোহিত ডেকে সেরে নিয়েছিল। তারপর আর এদিকের কোনো খবর রাখেনি।

ইন্দ্রজিতের খবরটা আর তাকে দেওয়া হয়নি। মহামায়া একবার মনে করেছিলেন, দেবেন। শেষ পর্যন্ত দেননি। কী লাভ? জানতেন সে আসবে না। এসেই বা করবে কী? না-ই বা দেখল এ শ্মশান দৃশ্য! দূরে আছে, থাক।

এর পর কর্তা যেদিন গেলেন, সেদিনও বৌরাণী নিজে কিছু জানান নি। সদর নায়েবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে একথাও যেন জানানো হয়, জ্যেষ্ঠের অভাবে সে-ই পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী। কর্তার অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারও তার উপরে গিয়ে বর্তাল। সে যেন অবিলম্বে এসে সব ভার গ্রহণ করে।

উত্তরে অভিজিৎ জানিয়েছিল, শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা সে তার সাধ্যমত ওখানেই করে নেবে, মায়ের বেলায় যেমন করেছে। সম্পত্তির মালিকানা রইল বৌরাণীর হাতে। সে যেমন আছে, তেমনি দূরেই থাকতে চায়।

এই ভাবেই চলছিল। তারপর এল স্বাধীনতা এবং তার পিছন পিছন একরাশ জটিল সমস্যা। দিনে দিনে তারা জটিলতর হতে লাগল। ক্রমশঃ, যা নিয়ে সমস্যা সেই জমিদারিটাই চলে গেল সরকারের হাতে। বৌরাণী ভাবলেন ঝঞ্ঝাট বুঝি মিটল। তার পরেই বুঝলেন, মেটেনি, শুধু নতুন আকার নিয়েছে। এমন আকার, যা তিনি এবং তাঁর কর্মচারীদের কাছে একেবারে অচেনা। বড়ই বিপন্ন বোধ করলেন মহামায়া। সদর নায়েবকে পাঠালেন অভিজিতের কাছে। তার সঙ্গে একখানা চিঠি। বৈষয়িক চিঠি। শুধু বৈষয়িক যদি হত, হয়তো অভিজিৎ ওখানে থেকেই যাহোক একটা জবাব দিয়ে দিত। কিন্তু আরো কিছু ছিল তার মধ্যে, যাকে সে ঠেলতে পারলনা।

চিঠিখানার শেষ লাইনগুলো কয়েকবার পড়ল অভিজিত। এ আরেক বৌরাণী, দুধে-আলতার পাথরের উপর যাকে প্রথম দেখেছিল এক উৎসব-মুখর সন্ধ্যায়। তখন সে কতটুকু! তারপর থেকেই দুজনে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে পিঠোপিঠি ভাই বোনের মত। বৌরাণী তাকে সকলের

সামনে বলত ঠাকুরপো, আর আড়ালে বলত অভি। ক্ষুদ্র দেওরটিকেও শিখিয়ে দিয়েছিল তার নাম ধরে ডাকতে। "কী, বৌরাণী বৌরাণী কর! আমার ভালো লাগেনা।"

"বাঃ, তুমি যে গুরুজন"—মা তাকে যা বলে দিয়েছেন তারই পুনরুক্তি করল অভি। বৌরাণী সেটা এক ঝটকায় উড়িয়ে দিল—"দূর! গুরুজন না, ছাই।"

"কী বলবো তাহলে?"

"কেন, আমার কি নাম নেই? অতবড় একটা কথা বলতে যদি বাধে, শুধু মায়া বলতে দোষ কী? আমার সইরা তো আমাকে তাই বলে ডাকত।"

এখানে তার সই নেই। সঙ্গী বলতে এক ঐ অভি। কিন্তু তার যে ভীষণ লজ্জা। নাম ধরে সে কিছুতেই ডাকতে পারবেনা। তখন রফা হল —আচ্ছা, তাহলে মায়াদি ব'লো।"

তাই বলত অভি—কেউ যখন ধারে কাছে থাকত না।

বেশী নয়, কয়েকটা বছর। কত হাসি, গল্প, খুনসুড়ি অকারণে মান-অভিমান। মেঘলা দিনে দুপুর বেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, উঠোনে বেরিয়ে দুজনে মিলে বৃষ্টিতে ভেজা। সবাইকে লুকিয়ে চিলে কোটায় বসে কাঁচা লঙ্কা আর ধনে পাতা দিয়ে একরাশ টোপাকুলমাখা উড়িয়ে দেওয়া। কী স্বাদ ছিল তার! সে জীবন ঘিরে যে দিনগুলো, তার স্বাদ আরো মধুর! একদিন হঠাৎ সেখানে যবনিকা নেমে এল। সেও হয়ে গেল কতকাল!

চিঠিখানা বন্ধ করে প্যাড্ টেনে নিল অভিজিৎ। কিছুক্ষণ ধরে ভাবল কী লিখবে। কত কথাই তো ভিড় করে আসছিল মনের মধ্যে। সব সেখানেই রয়ে গেল। কলমের মুখে বেরিয়ে এল শুধু একটি লাইন— তোমার চিঠি পেলাম। তিন চার দিনের মধ্যেই যাচ্ছি।

॥ ৩ ॥

ওস্তাদজী তাঁর নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন। সেই পুরানো আসন। পুরু কাশ্মিরী গালিচা, পিঠের কাছে সেই ভেলভেট মোড়া বিশাল তাকিয়া। কিন্তু তার গাঢ় রং ফিকে হয়ে গেছে। বিস্তীর্ণ হল ঘর এবং তার আসবাব পত্রের মত ওখানেও মহাকালের নিষ্ঠুর হাতের চিহ্ন।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন বৃদ্ধ ওস্তাদজী। এই ঘরে বহুবার এসে গান শুনিয়ে গেছেন। শেষে যেবার এসেছিলেন ঠিক সামনেই আসর আলো করে বসেছিলেন কর্তাবাবু। তাঁর আশে পাশে, কিন্তু যথাবিহিত ব্যবধান রক্ষা করে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের অনেকের মুখ মনে পড়ল। কর্তার বন্ধু, আত্মীয়, কিছু কিছু অনুগ্রহপুষ্ট স্তাবক। অনেকেই সমঝদার শ্রোতা। জিলা সহর থেকে, কোলকাতা থেকে বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করে আনা হত তাঁদের। আজ সেই পরিচিত মুখগুলো অনুপস্থিত।

আজকের দৃশ্য একেবারে আলাদা। বাঁড়ুয্যে বাড়ির বর্তমান বংশধর, বংশের একমাত্র জীবিত পুরুষ অবশ্য উপস্থিত। কিন্তু পিতার সেই বিশিষ্ট আসনটিতে বসে নেই। সেটি পাতাই হয় নি। সর্ব-সাধারণের জন্যে বিছানো প্রশস্ত জাজিমের একটি কোণ অধিকার করে সে বসেছে। আশে-পাশের সঙ্গে কোনো দূরত্ব রক্ষাও করে নি। প্রধানতম নয়, অন্যতম শ্রোতা। তবু তারই উদ্দেশ্যে এবং তাকে কেন্দ্র করেই আজকের এই আয়োজন। তার পিছনে একটি ছোট ইতিহাস আছে।

বছর কয়েক আগে ওস্তাদজী তীর্থ করতে বেরিয়েছিলেন। কাশীতে নেমে যখন ভাবছেন কোথায় ওঠা যায়,– মনে পড়ল স্বরূপকাঁদির বাবুদের তো বাড়ি আছে এখানে, দশাশ্বমেধ ঘাটের খুব কাছে। অনেক দিন আগে শূরজিতের সঙ্গে এসেও ছিলেন একবার। ওখানে বসেই পান্না বাইজীর গান শুনে গিয়েছিলেন। খালি পড়ে থাকত বাড়িটা। কর্তা এসে মাঝে মাঝে উঠতেন। তারপর তাঁর মা আর দিদি এলেন কাশীবাস করতে। তাঁরা

সবাই একে একে চলে গেলেন। এখন সেখানে স্থায়ী ভাবে বাস করে তাঁর ছোট ছেলে অভিজিৎ।

ছেলেটিকে মনে পড়ল ওস্তাদজীর। তাঁর আসরেই দেখেছেন। একটি বিশেষ দিনের কথা এখনো ভুলতে পারেন নি। সবে পৈতে হয়েছে। ন্যাড়া মাথায় জরির টুপি পরে বাড়ির সকলের সঙ্গে এসে বসেছিল। সুদর্শন কিশোর। শান্ত লাজুক মুখে একটি বুদ্ধির জ্যোতি। চোখ দুটি স্বপ্নময়। মাঝে মাঝে আপনা থেকেই তার দিকে নজর পড়ছিল। হঠাৎ দেখলেন, হাঁটুর উপর হাত ঠুকে ঠুকে নির্ভুল তাল দিচ্ছে ছেলেটি। 'সম' এবং 'ফাঁকে' তার মাথার দোলা এবং হাত নাড়ার বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিটি লক্ষ্য করে আরো আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সে বুঝতে পারেনি, ওস্তাদজী তাকে দেখছেন। তন্ময় হয়ে শুনছিল।

সেদিনকার আসরে রসজ্ঞ এবং নিখুঁত সুর-তাল-জ্ঞান সম্পন্ন শ্রোতার অভাব ছিল না। তাদের মধ্যে বসে গান গেয়ে যে কোনো গায়ক আনন্দ পাবেন। ওস্তাদজীও পেয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি পেয়েছিলেন ঐ বালক সমঝদারটিকে গান শুনিয়ে। তার ভীরু চোখ দুটির নীরব অভিনন্দন অন্য সকলের সরব প্রশস্তিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

সেবার আর সময় হয়ে ওঠেনি। ওস্তাদজী মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন পরের বারে যখন আসবেন, কর্তাবাবুকে বলবেন ছেলেটির ভেতরে যে শক্তি আছে এই বয়স থেকেই তার চর্চার ব্যবস্থা করা উচিত। বলবার সুযোগ আর আসেনি। কোলকাতা থেকেই কার কাছে যেন শুনেছিলেন ছেলেটিকে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরও আর ডাক পড়েনি হল-ঘরের আসরে। তারপর কর্তা চলে গেলেন। বাঁড়ুয্যে বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ঘুচে গেল।

কাশী না এলে হয়তো নতুন করে মনে পড়বার কারণ ঘটত না। কিন্তু, টাঙায় উঠে ভাবতে লাগলেন ওস্তাদজী, যে কিশোর অভিজিৎ সেদিন মুগ্ধ হয়ে তাঁর গান শুনেছিল, সে আজ কোন মন নিয়ে বড় হয়েছে, কে জানে? তাঁকে হয়তো চিনতেই পারবেনা। চিনলেও তার বাবার সঙ্গে সেই পুরনো সম্পর্কের সূত্র ধরে এই হঠাৎ গিয়ে পড়াটা কী ভাবে নেবে, বলা কঠিন। তার চেয়ে অন্য কোথাও গিয়ে ওঠা যাক।

চিন্তার গতি যে পথই ধরুক, টাঙা সেই পুরনো পথেই চলল। হয়তো

অনেকদিন আগে অনেক মানুষের মধ্যে দেখা ছুটি তন্ময় চক্ষু তাঁকে তাঁর অজ্ঞাতসারেই টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ভিড়ের মধ্যে দেখলেও সে ঠিক ভিড়ে হারিয়ে যাবার জিনিস নয়।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। কিন্তু অভিজিৎ নেই। লোকজন যারা ছিল তাদের কাছে শুনলেন কয়েকদিন আগে সে হরিদ্বারের দিকে রওনা হয়ে গেছে। সেখানে কদিন কাটিয়ে আরো উপরে উঠবে; কোথায় কোথায় ঘুরবে সে-ই জানে। ছু-এক বছর অন্তর এমনি হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো তার নিয়ম। কবে ফিরবে, বলে যায়নি। কোনোদিন বলে যায় না।

ওস্তাদজী চলে যাচ্ছিলেন! কিন্তু পুরনো সরকারটি তাঁকে যেতে দিল না। কর্তার আমলের লোক, ওস্তাদজীকে সে চেনে, এই বাড়িতেই দেখেছে। কর্তার কাছে যে আদর আপ্যায়ণ তিনি পেয়েছেন, তাও তার দেখা। সেই সব উল্লেখ করে অনুরোধ জানাল। এড়াতে পারলেন না।

পরদিন কাপড় গামছা নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন ওস্তাদজী। পাশেই অভিজিতের ঘর। দরজা খোলা, ঝাড়পোছ করা হচ্ছে। ভিতরে নজর পড়তেই লক্ষ্য করলেন দেয়ালে ঝোলানো একটি তানপুরা। জিজ্ঞাসা করে জানলেন ওটি বর্তমান মালিকের, এবং এখানে যখন থাকেন মাঝে মাঝে ওর ব্যবহার চলে। মনটা খুশী হয়ে উঠল। ছেলেটি সম্পর্কে তাঁর মনে একদিন যে আকাঙ্খা জেগেছিল, সেটা তাহলে ব্যর্থ হয় নি। ব্যর্থ হতে পারে না। এ জিনিস কখনো যাবার নয়, সুপ্ত থাকে। তারপর কোথা দিয়ে কেমন করে মাথা তুলে উঠে কেউ বলতে পারে না।

এ পর্বের এইখানেই শেষ হতে পারত। হল না। বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ একখানা চিঠি পেলেন স্বরূপকাঁদির বাঁড়ুয্যেদের সদর নায়েবের কাছ থেকে। লিখেছেন—তাঁদের বর্তমান মালিক কাশী থেকে দেশে ফিরে এসেছেন এবং সেই উপলক্ষ্যে একটি গানের আসরের আয়োজন করা হয়েছে। বৌ-রাণীর একান্ত ইচ্ছা আগেকার মত একটি সন্ধ্যা ওস্তাদজী এসে তাঁর পুরনো আসনটিতে বসে তাদের আনন্দ দান করেন, ইত্যাদি। ওস্তাদজী সঙ্গে সঙ্গে 'না' বলতে যাচ্ছিলেন। যথেষ্ট বয়স হয়েছে, কোথাও বিশেষ যান না। গানও প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন

বলা চলে। হঠাৎ মনে পড়ল, 'বর্তমান মালিক' তো সেই ছেলেটি। রাজী হয়ে গেলেন।

বিশেষ করে তাঁর শ্রোতাদের দিকেই বারবার তাকিয়ে দেখছিলেন ওস্তাদজী। অভিজিতের কাছাকাছি যারা বসেছে, অচেনা হলেও অনুমান করতে পারলেন, তাদের মধ্যে কিছু কিছু গ্রামের লোক; বেশির ভাগই সহর থেকে নিমন্ত্রিত। পদস্থ, সংগতিপন্ন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সঙ্গীতাদির বৈঠকে পুরোভাগে আসন গ্রহণ করেন। কতটা রস গ্রহণ করেন, বলা শক্ত। তবে একটা জিনিস সুষ্ঠুভাবে করে থাকেন—আসরের শোভা বর্ধন।

এখানেও প্রধান শ্রোতা তাঁরাই।

একটু তফাতে জাজিমের অনেকটা জায়গা যারা দখল করে বসেছে, তারা অপ্রধান। যদিও সংখ্যায় ছোট নয়। চেহারায় বেশভূষায় মালিন্যের ছাপ। কিন্তু চোখে মুখে উৎসাহের অভাব নেই। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের আসরে এই জাতীয় "নিম্নশ্রেণীর" শ্রোতা বড় একটা দেখা যায় না। এরা কারা, এখানে কেন এসেছে বোঝা গেল না। ডাকা হয়েছে, কিংবা না ডাকতেই এসেছে সেটাও ওস্তাদজীর কাছে দুর্বোধ্য রয়ে গেল। বাঁড়ুয্যে বাড়ির হলঘরে এ দলটি রীতিমত বেমানান।

পুরনো সারঙ্গীকে সঙ্গে করে এনেছিলেন ওস্তাদজী। কিন্তু তাঁর তবলচীটি শেষ মুহূর্তে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারে নি। তার জায়গায় অন্য একজনকে জুটিয়ে আনতে হয়েছে। ততটা পাকা নয়। সেজন্য মনটা খুঁতখুঁত করছিল। আসরে বসে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে ভিতরে ভিতরে আরো অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ পেতে দিলেন না। অভিজিতের দিকে চেয়ে হাসি মুখে বললেন, কী শুনবে?

"আপনার যা ইচ্ছে।" —সসম্ভ্রম বিনীত উত্তর।

একখানা ইমন ধরলেন ওস্তাদজী। বয়স হয়েছে, নিয়মিত চর্চা নেই। স্বরগ্রামের নানা স্তরে কণ্ঠের সে সতেজ ও স্বচ্ছন্দ বিহার আগের তুলনায় কিছুটা শ্লথ। কিন্তু কাঠামোটা এখনো অবিচল। আলাপ শুরু হতেই তার পরিচয় পাওয়া গেল। যখন গাইছিলেন চোখ দুটি বারংবার এসে মিলিত

হচ্ছিল অভিজিতের চোখে। ধীরে ধীরে তারা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ঠিক সাড়াটি পাওয়া গেছে। সেইটুকুই গায়কের পুরস্কার। এ জিনিস তো জনতার জন্যে নয়। নাইবা নিল আর কেউ। একজন যে নিয়েছে, নিতে পেরেছে, তাতেই শিল্পীর তৃপ্তি। সেই একজনের কাছেই তিনি নিজেকে উজাড় করে দিতে পারেন।

ওস্তাদজী সেই জাতের শিল্পী। কত লোক এল তাঁর আসরে, তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। সংখ্যাটা তাঁর কাছে অবান্তর। এক হাজার অর্থহীন মুখের মাঝখানে একটিমাত্র অর্থপূর্ণ দৃষ্টি যদি দেখতে পান, মনে করবেন, তাঁর শিক্ষা ও সাধনা সার্থক হল।

অনেক বছর আগে ওস্তাদজী যখন আসতেন, তাঁর ছু' একটা আসরের স্মৃতি অভিজিতের মনের মধ্যে গাঁথা ছিল। সেই দিনের কথা ভেবে এবং গান-সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান সে অর্জন করেছে তার থেকে এটা বুঝেছিল এমন একজন গায়ককে টেনে এনে আজকের সেই হলঘরে বসানো ঠিক হবে না। এখন আর তাদের পক্ষে তাঁর যোগ্য আয়োজন করা সম্ভব নয়। তাই মহামায়ার প্রস্তাবে প্রথমটা রাজী হতে চায়নি। কিন্তু বৌরাণী যে এখনো সেই পুরনো বাঁড়ুয্যে বাড়ির বিগত দিনরাত্রির মধ্যেই বিচরণ করছেন এবং বহুকাল পরে তার শেষ বংশধরকে ফিরে পেয়ে তাকে আশ্রয় করে লুপ্ত ইতিহাসের যথাসম্ভব পুনরুদ্ধারই তাঁর একান্ত কামনা,—মহামায়ার এই মনোভাবটি অনুভব করবার পর আর বাধা দেয়নি। কাদের কাদের ডাকা হবে সে ভারও ছিল বৌরাণীর উপর। তিনি সদরনায়েবের সঙ্গে পরামর্শ করে তালিকা তৈরি করেছিলেন। জিলা ও মহকুমা সহরের কিছু কিছু উঁচু-মহলের সরকারী কর্মচারী এবং কয়েক জন বেসরকারী প্রধানদের নাম স্বভাবতই তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত সমাজের একটা অংশও ছিল, যারা বাঁড়ুয্যে পরিবারের পুরনো সুহৃদ। অর্থাৎ তুজনে মিলে কর্তার আমলের আবহাওয়াটিকে যতটা সম্ভব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন।

ঘরের পাশে এই জবর-দখল কলোনীটি তাঁদের সুদূর কল্পনাতেও স্থান পায়নি। 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত' উচ্চস্তরে লোকের জন্যে। এরা তার কি বোঝে? যদি কেউ বোঝেও, এই হলঘরে এনে তাকে বসানো যায় না। তালা খুলতে এসে সেই আধপাগলা মিস্ত্রীটা যখন আবদার করে বসল—"আমরা একটু

শোনবো না ?" বৌরাণী মনে মনে কৌতুক বোধ করছিলেন, এবং অভিজিৎ যখন সেটা মঞ্জুর করল, তখন প্রথমটা একটু বিস্মিত হলেও পরে তার উপরে আর কোনো গুরুত্ব দেননি। মনে করেছিলেন অল্পবুদ্ধি অতি-সরল লোকটাকে নিয়ে একটু মজা করছে অভিজিৎ। ঐ কথার উপর নির্ভর করে সত্যি সত্যি তারা দল বেঁধে এসে উঠবে এই হলঘরে, এবং বাড়ির মালিক তাদের সমাদর করে বসাবে, এটা কখনো ভাবতে পারেননি। সেই অভাবনীয় কাণ্ডই ঘটল। নায়েব নিরুপায় দর্শকের ভূমিকা নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তাঁর মুখখানা থমথম করতে লাগল। বৌরাণীও ভিতর ভিতরে অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। তারপর নিজেকে বোঝালেন এই বাড়ির ছেলে হলেও অনেক দিন পরে হঠাৎ বাইরে থেকে এসে এখানকার হালচাল এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। আস্তে আস্তে যখন পারবে, তখন নিজেকে শুধরে নেবে।

হালচাল বুঝুক আর না বুঝুক, এ বাড়ির ছেলে হয়ে অভিজিৎ এটুকু অন্ততঃ বুঝেছিল, যে আগেকার দিনে এই জাতীয় শ্রোতারা কোনক্রমেই এখানে প্রবেশাধিকার পেত না। সে অধিকারের মাপকাঠি ছিল আলাদা—শ্রোতাটি কোন স্তরের মানুষ। কিন্তু আজকের দিনে সেই কাঠিটা আঁকড়ে ধরে রাখা চলে না। তাছাড়া, আসলে সেটা ভুল মাপ। গানের আসরে, বিশেষ করে এই জাতীয় রাগপ্রধান গান যেখানে পরিবেশন করছেন কোনো সুদক্ষ শিল্পী, সেখানে তাদেরই অগ্রাধিকার, যারা তাঁর সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, তার ভিতরকার তত্ত্বটি যারা জানে এবং রসটুকু উপলব্ধি করে। সে জ্ঞান এবং অনুভূতি কোনো বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নয়; শিক্ষিত, অশিক্ষিত উন্নত, অনুন্নত—সব সমাজের মধ্যেই তারা ছড়িয়ে আছে। শিক্ষা, পদ, অর্থ কিংবা সামাজিক মর্যাদার বলে তাঁর কাছাকাছি যাঁরা আসন পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে যেমন থাকা সম্ভব, তেমনি ঐগুলো আয়ত্ত করতে পারেনি বলে তাঁর থেকে দূরে যারা অবাঞ্ছিত অতিথির ভিড়ের মধ্যে বসে আছে, সেখানে থাকাও অসম্ভব নয়।

তবে একটি ভাবনা ছিল অভিজিতের—ওস্তাদজী ওদের কী চোখে দেখবেন। বাইরে হয়তো কিছু বলবেন না, কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হবেন কিনা। তিনি যেখানে, যেসব সমাজে বিচরণ করেন, সেখানে এরা যেতে পারে না। এদের দেখতে তিনি অভ্যস্ত নন। তিনি সেকালের লোক।

সারাজীবন ধরে দেখে এসেছেন, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর যে দুটি দান—বীণা এবং পুস্তক, তার দ্বিতীয়টির বিতরণে তিনি কোনো কার্পণ্য করেন না, কোনো বাছবিচারও নেই, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই সেটি আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু প্রথমটির বেলায় দেবী রীতিমত দৃঢ়মুষ্টি। মুষ্টিমেয়রাই শুধু সে বিদ্যাটি লাভ করতে পারে। তার জন্যে তাদের দুটি বস্তু আয়ত্তে থাকা চাই—প্রচুর সংগতি, ও প্রচুরতর অবসর। জীবন-যুদ্ধের তাড়না যাদের সইতে হয় না, জীবনযাত্রার পথটি স্বচ্ছন্দ ও সচ্ছল, তারাই বাগ্-দেবীর ঐ বাম হস্তের যন্ত্রটির দিকে হাত বাড়াতে পারে। এ বিদ্যায় শুধু অভিজাতের বিশেষ অধিকার। ওস্তাদজীর মত গুণী ব্যক্তিরা তাঁদেরই দাক্ষিণ্যে লালিত। এঁদের মধ্যে যে সহজ প্রতিভা, ধনী সম্প্রদায়ের আনুকূল্য না পেলে তার উন্মেষ ঘটত না, হয়তো চিরদিন লুপ্ত থেকে যেত। সর্বসাধারণ বলতে যাদের বোঝায় তারা এঁদের কিছু দেয়নি। এঁরা যা কিছু পেয়েছেন, শুধু স্বীকৃতি ও পুরস্কার নয়, সচ্ছল জীবনের স্থূল উপকরণ, সব এসেছে ঐ ধনীদের কাছ থেকে। রাজদরবারের কিংবা বড় বড় জমিদার-গোষ্ঠীর আশ্রয় ও পোষণ না পেলে বহু খ্যাতিমান গায়ক-বাদক-চিত্রকরের উদ্ভব ঘটত না।

সুতরাং ওস্তাদজীর যদি অভিজাতের উপর কিঞ্চিৎ পক্ষপাত থাকে এবং সেই মনোভাব থেকে এই লোকগুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

আসনে এসে বসবার পরেই এদের দিকে যখন নজর পড়ল, তাঁর চোখের সেই ভ্রূকুটি—সেটা অবজ্ঞা বা অসন্তোষ যাই হোক—অভিজিতের দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু সেটা স্থায়ী হয়নি দেখে আশ্বস্ত হল। বুঝল, ইনি সেই জাতের শিল্পী যাঁরা একবার তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে ডুবে গেলে পারিপার্শ্বিকের কথা মনে রাখেন না।

তবলচীকে নিয়ে ওস্তাদজী থেকে থেকে বিব্রত বোধ করছিলেন। সে যখনই হোঁচট খাচ্ছিল, নিজে থেমে গিয়ে তাকে আবার সঙ্গে নিয়ে চলতে হচ্ছিল। অর্থাৎ তার দিকে ফিরে মাথা নেড়ে নেড়ে বোলগুলো বলে বলে দিচ্ছিলেন। অনেকেই সেটা বুঝতে পারেনি। মনে করছিল, ওটাও হয়তো গানের অঙ্গ। অভিজিৎ অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু কী করবে ভেবে

পাচ্ছিল না। এখানে কোথায় তবলচী আছে, থাকলেও পাওয়া যাবে কিনা তার জানা নেই।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করছিল অভিজিৎ। তার অতিথিদের চোখেও পড়ে থাকবে। হয়তো ওস্তাদজীর নজরও এড়ায়নি। তবলাসঙ্গতে যখনই কোনো ত্রুটি হচ্ছিল, কলোনীদলের সামনের দিকে একজন লোক চঞ্চল হয়ে উঠছিল। কখনো বিরক্তি, কখনো হতাশায় ঘন ঘন মাথা নাড়ছিল। চোখ-মুখের ভাব থেকে মনে হচ্ছিল ভিতরে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। মাঝে মাঝে উঃ, ঈস্—জাতীয় দু'একটা চাপা শব্দও বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে।

এবারে একটা বড় রকমের বিভ্রাট বাধিয়ে বসল তবলচী। ওস্তাদজী হঠাৎ থেমে গিয়ে তানপুরার তার থেকে আঙুল তুলে নিলেন। সারঙ্গী তার ছড় নামিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল তবলচীর দিকে। আর সেই লোকটি একটি কাণ্ড করে বসল। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে উঠে তর্জনী তুলে হুঙ্কার দিল—"উইঠ্যা যাও···।"

হলঘরের মধ্যে যেন আচমকা একটা বোমা এসে ফেটে পড়ল। যে যেখানে ছিল সকলের চমকিত দৃষ্টি ঐ একটি লোকের দিকে! সে ততক্ষণে ঝুপ করে বসে পড়েছে। ভীষণ লজ্জায় নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাইছে মাটির সঙ্গে—এ কী করে বসলাম! মুহূর্তের জন্যে সত্যিই জ্ঞান ছিল না।

সারা আসর স্তব্ধ। গানের দিকে কান বা মন ছিল কম লোকেরই। এখানে ওখানে ছোট ছোট দলে চাপা গলায় এক আধটু গল্প সল্পও চলছিল। হঠাৎ সব বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে—এবার কী হয়।

কেউ কিছু বলবার বা করবার আগে সামনে বেরিয়ে এলেন সদর নায়েব। তিনি আসরে বসেননি। বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনা, আসরের সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলা রক্ষা—সব ভার তাঁর উপর। তাই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন কলোনীর লোকেরা যেখানে বসেছিল সেই দিকটায়। হাতে তুড়ি দিয়ে সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে, এদিকে শোনো।

সে শশব্যস্তে উঠতে যাচ্ছিল। পাশ থেকে একটি যুবক তাকে থামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত জোড় করে ওস্তাদজীর দিকে চেয়ে বলল, আমি

ওঁর হয়ে আপনার কাছে মাপ চাইছি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন উনি হঠাৎ অমনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। উনি একজন ভালো তবলচী।

নায়েব যুবকটির উপরে খুশী ছিলেন না। থাকবার কথাও নয়। এই শম্ভুই যে গোটা কলোনীর নেতা (তাঁর পরিভাষায় 'ন্যাতা') এবং এদের মাথায় নানা রকম দুর্বুদ্ধি যুগিয়ে থাকে, তিনি ভালো ভাবেই জানেন। এ ব্যাপারেও তার এই 'নেতাগিরি', বিশেষ করে তাঁর প্রতি এই ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা তিনি স্বভাবতই বরদাস্ত করতে পারলেন না। রুক্ষ ভাবে বললেন, তোমাকে তো এর মধ্যে কেউ কথা বলতে ডাকেনি।

"আজ্ঞে, আমি আপনাকে কিছু বলিনি"—বক্তার দিকে কোনরকম দৃক্‌পাত না করে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল শম্ভুচরণ। "আপনাকে"—শব্দটার উপর এমন একটু বিশেষ জোর দেওয়া হল, যে উপেক্ষাটা শুধু নায়েবমশায়ের নিজের কাছে নয়, আরো, আরো অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। অর্থাৎ ভাবখানা যেন এই রকম—'আপনি কে মশাই? আমি ওস্তাদজীর সঙ্গে কথা বলছি।'

ব[illegible] বাহুল্য বাঁড়ুয্যে বাড়ির সদর নায়েব এতে অভ্যস্ত নন। বিশেষ করে আজকের এই আয়োজন তাঁরই, তিনিই বৌরাণী[illegible] প্রতিনিধি হিসাবে সকলকে আমন্ত্রণ করেছেন, শুধু এই লোকগুলো ছাড়া। তাদেরই একজনের কাছ থেকে এই অপমানটা বড় বাজল। একে হজম করা যেমন শক্ত, তেমনি এমন কিছুও করা যায় না, যা এই অনুষ্ঠানের পক্ষে অশোভন। তবু একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নজরে পড়ল তাঁর নতুন মনিব উঠে পড়ছে, এবং ঐ দিকেই তার গতি। আ[illegible]তঃ চুপ করে গেলেন।

অভিজিৎ ওখানে গিয়ে পৌঁছবার আগেই পিছন থেকে ওস্তাদজীর গলা শোনা গেল, ওকে এখানে আসতে বলুন।

কথাটা শম্ভুর উদ্দেশে। কিন্তু সে অভিজিৎকে লক্ষ করছিল। বোধ হয় কোনো সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে মনে মনে তৈরী হচ্ছিল। ওস্তাদজীর কথাটা ঠিক কানে যায়নি। সেদিকে তার মনোযোগ নিয়ে এল পাশের একটি ছেলে—তোমারে কী য্যান কইলেন, শম্ভুদা।

"আমারে?"

"হু।"

"কেডা ?"

ছেলেটি গুস্তাদজীর দিকে আঙুল তুলে দেখাল। শম্ভু দাঁড়িয়েই ছিল। এবারে নীচু হয়ে হাত দুটো সামনে রেখে ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে যেমনি বেরিয়ে আসবার আয়োজন করছে, ওস্তাদজী বললেন, ওকে একবার পাঠিয়ে দিন আমার কাছে।

"যাও নবীন কাকা"। সেই লোকটির দিকে হাসিমুখে ফিরল শম্ভু।

"আমি !"

"হু ; তোমারে ডাকতেছেন ওস্তাদজী।"

নবীন তখনো ইতস্তত: করছে দেখে ভরসার সুরে জোর দিয়ে বললেন, ডর কিসের ? যাওনা ?

নবীনকে উঠতে হল। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এদিক ওদিক চেয়ে এমন ভাবে চলল, যেন এখনই কোনো ঘোর বিপদের মুখে গিয়ে পড়তে হবে।

অভিজিৎ নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েছিল। তার সামনে দিয়ে পথ। সেখানে থেমে আভূমি নত হয়ে নমস্কার করল নবীন। তারপর এগিয়ে গিয়ে ওস্তাদজীর সামনেও নিজেকে অমনি করে নুইয়ে দিয়ে সসন্ত্রমে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

তিনি হাসিমুখে বাঁয়া তবলার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বললেন, হবে নাকি একহাত ?

নবীন জবাব দিল না। শুধু জিভটা অনেকখানি বেরিয়ে এল এবং তার উপরে দাঁত চেপে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল।

"কেন, আপত্তি কী ?"

"আপনার কাছে মিছে কথা কমু না। মাঝে মাঝে এক-আধটু বাজাই। তাই বইল্যা আপনার লগে ! ও সব্বোনাশ !"

"আচ্ছা, বসে বড়। তারপর দেখা যাবে।"

নবীন মুহূর্তকাল কি ভাবল। তারপর গভীর ভক্তিভরে ওস্তাদজীর পায়ের ধুলো মাথায়, জিহ্বায় এবং বুকে ঠেকাল। তিনি হাত তুলে বললেন, হয়েছে, হয়েছে। তবলচী আগেই এক পাশে সরে গিয়েছিল। নবীন পিছন দিক দিয়ে ঘুরে প্রথমেই তার কাছে ক্ষমা চাইবার সুরে বলল, "কিছু

মনে কইরো না ভাই।" সে বোধহয় এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। থতমত খেয়ে অস্ফুষ্ট স্বরে কি একটা বলল, বোঝা গেল না।

তবলচীর আসনে বসেই নবীন যন্ত্র দুটিকে স্পর্শ করে সেই হাত কয়েক বার মাথায় লাগাল, সেই সঙ্গে চোখ বুজে মনে মনে বোধহয় তার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করল। যখন চোখ খুলল, তার মুখে ক্ষণকাল আগেকার সেই অপরাধ-বোধ-জড়িত কুণ্ঠার ভাবটা আর নেই। তার জায়গায় ফুটে উঠেছে আত্মপ্রত্যয়ের শান্ত দৃঢ়তা।

প্রথমে কিছুক্ষণ হাতুড়ি ঠোকার পালা। সেটুকু শেষ হতে যখন অভ্যস্ত হাতের প্রথম আঘাত পড়ল তবলার উপর এবং সেখান থেকে একটি পরিচিত ঝঙ্কার উঠল, ওস্তাদজী প্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিপ্রসাদ হাসি মুখে মাথা নুইয়ে গ্রহণ করল নবীন।

ওদিকে সারেঙ্গের তারেও তখন ছড় পড়েছে। এক যন্ত্রের ডাকে সাড়া দিয়েছে আরেক যন্ত্র। যন্ত্রীদের মধ্যেও নীরব ভাষায় সস্মিত দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল। তার মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার ইঙ্গিত—যার অর্থ আমরা সমব্রতী, আমাদের উভয়ের যে কাজ তার নাম 'সংগত'। অর্থাৎ 'সংগতি' বা মিলনই আমাদের একমাত্র সম্পর্ক। যাঁর দুপাশে আমরা বসেছি, যিনি আমাদের মধ্যমণি, নিজ নিজ পথে তাঁকে আমরা অনুসরণ করে যাবো। আমরা প্রতিযোগী নই, সহযোগী।

অতবড় ওস্তাদের খাস সারেঙ্গী। তার সম্বন্ধেও মনে মনে ভয় ছিল নবীনের। কিন্তু তার চোখে যে আশ্বাস ছিল, তার থেকেই অনেকখানি ভরসা পেয়ে গেল। বিশ্বাস এল নিজের উপর।

ওস্তাদজী একটি ভজন ধরলেন। মীরার ভজন। যে ভাষায় তার রচনা, এখানকার শ্রোতাদের কাছে সেটি বোধ্য নয়। তার ব্যাকরণ এরা জানে না। কিন্তু গানের ব্যাকরণ আলাদা। সঙ্গীতের একটি নিজস্ব ভাষা আছে যা বুঝতে হলে বুদ্ধি বা শিক্ষার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু একটি রসসিক্ত মন। সব গান হয়তো সে দলে পড়ে না। গান মাত্রেই সংগীত বা 'মিউজিক' নয়। কিন্তু মীরার ভজন নিঃসন্দেহে সেই জাতের। তার পদ বা কাঠামোর সঙ্গে পরিচয় থাক বা না থাক ভিতরের রূপটি শ্রোতার কাছে অনায়াসে ধরা পড়বে, যদি অবশ্য তাকে অন্তরের ঠিক

জায়গাটিতে পৌঁছে দেওয়া যায়। সে ভার গায়কের। গায়ক একা নয়। সুর তার বাহন। তবু সব গায়ক কি তা পারে? সকলের কণ্ঠে কি সে জাদু আছে? সে বিশেষ মন্ত্রটি কি সর্বায়ত্ত?

তা যদি হত, সংসারে 'প্রতিভা' বলে কোনো কিছু থাকত না। সকলে সব কিছু পারে না। কেউ কেউ একটা বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মায়। কেমন করে কোথা থেকে সে শক্তি এল কেউ জানে না। কোনো উৎস যখন তার খুঁজে পাওয়া যায় না, তার নাম দেওয়া হয় দৈবশক্তি। হয়তো তাই, হয়তো নয়। ঐখানেই সৃষ্টির রহস্য, যার আবরণ এখনো উন্মোচিত হয়নি। কে জানে কোনোদিন হবে কিনা।

প্রতিভাটা ঈশ্বরের দান হলেও তার উন্মেষের জন্যে দায়ী মানুষ। ঈশ্বর যেটুকু দেন সে শুধু বীজ কিংবা বড় জোর অঙ্কুর, তাকে পত্রে পুষ্পে সুশোভিত করে তুলবার ভার মানুষের।

শুধু বিধাতা তো এই বিশ্ব-সৃষ্টি করেননি, তার প্রতি স্তরে স্তরে ছড়িয়ে আছে মানুষের হস্তচিহ্ন।

ওস্তাদজীর মধ্যে সম্ভবতঃ এই দুয়ের একটি সুষম মিলন ঘটেছিল। ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর দীর্ঘজীবনব্যাপী সাধনা। অনেক দিন পরে ঐ সন্ধ্যাটিতে তিনি যেন তার সবটুকু উজাড় করে দিলেন। কাদের কাছে, কারা তাঁর শ্রোতা, সে জ্ঞান রইল না। থাকলে হয়তো পারতেন না। অভিমান এসে বাধা দিত, মর্যাদা-বোধ এসে কাঁধ চেপে ধরত। কিন্তু যারা তাঁর সামনে বসে আছে, তাদের অনেকেই যে তাঁর অত বড় দানের যোগ্য পাত্র নয় সে কথা তিনি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন আপন সৃষ্টির মধ্যে। তার চেয়েও বড় কথা, সুরের স্রোতধারায় শুধু শিক্ষা ও সাধনা নয়, ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত হৃদয়। গানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

হয়তো ঐ বিশেষ গানটি, তার ভাষা, সুর, অন্তর্নিহিত আবেদন তাঁর সহায় হয়েছিল। মীরা যখন তাঁর গিরিধারীলালকে গান শোনাতেন তখন যেমন ভুলে যেতেন তিনি রাজেন্দ্রাণী, ভুলে যেতেন তাঁর সমস্ত আভিজাত্য, অহংকার, গৌরব, মর্যাদা; একটি অতি সামান্য রমণীরূপে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিতেন তার পাথরের শ্রোতার কাছে, তেমনি ওস্তাদজীও এই মুহূর্তে

তাঁর সারা জীবনের অর্জিত বিদ্যা, যশ, সম্মান, স্বাতন্ত্র্যবোধ, সব কিছু ভুলে গিয়ে একজন সাধারণ গায়কের মত নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা-হীন আনাড়ী শ্রোতাদের মধ্যে।

তার ফল ফলল সঙ্গে সঙ্গে। যারা এতক্ষণ তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, সমীহ এবং তার সঙ্গে কিছুটা ভয় ছাড়া আর কিছু দেয়নি, তারা যেন একটা অলক্ষ্য আকর্ষণে কাছে সরে এল। যে চোখে এক ধরণের বোবা নির্বিকার ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছু ছিল না, সেখানে দেখা দিল ঔৎসুক্যের আলো। তার মধ্যে ফুটে উঠল পাওয়ার আনন্দ। শ্রোতাদের মনে হল একটা কিছু পাচ্ছি, কোথায় যেন সাড়া জাগছে। ঐ যে মানুষটি গাইছেন উনি শুধু ওস্তাদ নন, ওঁর মধ্যে যেন একটি আপন জনের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। উনি আমাদের চেনা মানুষ, কাছের মানুষ।

গান যখন শেষ হল সমস্ত আসরের মেজাজ বদলে গেছে। গায়কের সঙ্গে শ্রোতার একটা অন্তরঙ্গতার সূক্ষ্ম সূত্র গড়ে উঠেছে। সকলেই উৎফুল্ল, উদ্দীপিত, কেউ কেউ মুগ্ধ, কারো কারো দৃষ্টি ভাবগভীর!

সেই মিস্ত্রীটি তালা খুলতে এসে যে 'গান শোনবার' আবেদন জানিয়েছিল 'নতুন কত্তার' কাছে, গানের মধ্যেই মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল। এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে মাথা লুটিয়ে দিল ওস্তাদজীর সামনে। তারপর মুখ তুলে ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, পায়ের ধুলা ত্থান কত্তা। ত্যাশ ছাড়বার পর এ জিনিস আর শুনি নাই।

বলতে বলতে কোটরে ঢোকা চোখ দুটিতে জল এসে পড়ল। বোধহয় হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই দেশের কথা, কতদিন হল যাকে ছেড়ে এসেছে এবং যেখানে আর ফিরে যাবার উপায় নেই। এমনি কোনো মধুর করুণ অনুভূতির স্পর্শ তাকে শুধু মনে করিয়ে দেয়।

ওস্তাদজী বাধা দিলেননা। কত লোকেই তো তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে থাকে। তাঁর মত একজন প্রসিদ্ধ প্রবীন গুণী ব্যক্তির প্রাপ্য সম্মান। সেই হিসাবেই দেখেন তাকে। অভ্যাসের বশে তার মধ্যে মনকে নাড়া দেবার মত বিশেষ কিছু পাননা। কিন্তু এই মূর্খ, দরিদ্র গ্রাম্য লোকটার সরল উচ্ছ্বাস এবং প্রগাঢ় স্পর্শে এক ধরনের তৃপ্তি পেলেন, সমঝদার শ্রোতাদের সুরচিত প্রশস্তির মধ্যে যা পাওয়া যায় না।

মিস্ত্রীর কাঁধ স্পর্শ করে হাসি মুখে বললেন, ভালো লেগেছে তোমাদের ?

"সে আর কী কমু !"

এবার তাঁর সহসালব্ধ তবলচীর দিকে ফিরলেন ওস্তাদজী। স্নেহের সুরে বললেন, কী নাম তোমার ?

—"আইজ্ঞা, নবীন দাস।"

—"সুন্দর বাজিয়েছ। বেশ মিষ্টি হাত।"

"হইবে না !" মিস্ত্রীর দরাজ গলায় যেন ঢাক বেজে উঠল, "ময়রার পোলা তো। চিনির রস ঘাইটা ঘাইটা হাত মিঠা হইয়া গেছে।"...বলে, নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্চরোলে হেসে উঠল। কলোনীর লোকেরা জোর গলায় সাড়া দিল, বিশেষ করে কিশোর ও তরুণ দল। সম্ভ্রান্ত শ্রোতাদের কারো কারো মুখেও খানিকটা হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

সামনের দিকটা এবার ফাঁকা হতে শুরু করেছিল। এখান ওখান থেকে দু-একজন করে উঠে পড়ছিলেন অতিথিরা। কেউ দূর থেকে কেউবা কাছে এসে হাসিমুখে। অভিজিৎকে নমস্কার জানিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। কেউ কেউ আরেকটু এগিয়ে ওস্তাদজীকেও একটা ধন্যবাদ কিংবা কিছু সাধুবাদ জানিয়ে সরে পড়ছিলেন।

কলোনীর দলটা তখনো অটুট। তারা গান শুনতে এসেছে। শেষ পর্যন্ত শুনবে। মাঝখানে উঠে পড়ার মধ্যে যে একটা বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ আছে সে বোধ তাদের নেই। কিংবা বোধ হয়তো ছিল—(নিতান্ত যারা সাধারণ তারাই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত থাকে, এটা তারা লক্ষ্য করেছে)—কিন্তু বিশিষ্ট হবার লোভ ছিলনা। অসাধারণত্বের দাবি নিয়েও আসেনি। সুতরাং বসে রইল, এবং ঠিক চুপ করে নয়। গানের বিরতির সময় কথাবার্তা গল্প সল্প চালাতে দোষ কী ? চাপা গলাতেই অবশ্য চলছিল সেটা, এবং হলঘরের ওদিকটা জুড়ে একটা গুঞ্জরন উঠেছিল।

হঠাৎ একটি তরুণ উঠে দাঁড়াল। তার হাতের ইঙ্গিতে গুঞ্জনটা থেমে যেতেই ওস্তাদজীকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, এবার একটা আধুনিক হোক স্যর।

সামনের সারিতে কয়েকজন প্রাচীন ব্যক্তি বসেছিলেন। এই আসরের

পুরনো শ্রোতা, ওস্তাদজীর বিশেষ ভক্ত এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গোড়া সমঝদার। তাঁরা রীতিমত চমকে উঠলেন। অভিজিৎও কম চমকায়নি। তার ঠিক পাশে যিনি আসন নিয়েছিলেন তার কানে কানে কিন্তু যথেষ্ট বিরক্তির সুরে বললেন, এরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। অভিজিৎ কিছু বলবার আগেই ও পাশ থেকে আরেকজন চড়া গলায় ধমকে উঠলেন, তোমরা কি পেয়েছ? কাকে কী বলছ!

তরুণটি একটু অপ্রস্তুত হল, "কেন, উনি কি আধুনিক গান জানেন না?"

"না, ভাই," শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে উত্তর দিলেন ওস্তাদজী, "আমি সেকেলে মানুষ। ও বিদ্যেতো শিখিনি। ওটা বরং তোমরা কেউ এসে চালাও"—বলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন এবং পাশের দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

সামনের দিকে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও উঠে পড়লেন। অভিজিৎও ওস্তাদজীর অনুসরণ করল। সঙ্গে সঙ্গে বেনো জলের মত হুড়মুড় করে এগিয়ে এল কলোনীর লোকগুলো, এবং মুহূর্ত মধ্যে সামনেকার সমস্ত জায়গাটা দখল করে বসল!

বৌরাণী গানের আসরে যাননি। যাবার যে ইচ্ছা ছিল না, তা নয়। অনেকদিন পরে ওস্তাদজী এসেছেন গান শোনাতে, বিশেষ করে তাঁরই অনুরোধে, শুনবার আগ্রহই বরং ছিল। কিন্তু কোথায় বসবেন? আগেকার দিনে মেয়েদের আসন পড়ত গায়কের আসনের ডান দিকে, খানিকটা তফাতে; সামনে থাকত প্রশস্ত চিকের আড়াল। শুধু এই পরিবারের মহিলারা এবং এদের আত্মীয়ারা নয়, বাইরে থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে যাঁরা আসতেন, কিংবা নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করে গ্রামের যে সব সাধারণ মেয়েরা ভিড় করত, সকলেরই জায়গা ছিল ঐখানে। পুরুষদের আসরে যেমনি, তেমনি ওখানেও আসনের তারতম্য ছিল, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ব্যবধান রক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

আজকের আসরে চিক টাঙানো হয়নি। নায়েব একবার প্রস্তাব করেছিলেন, বিশেষ করে বোধহয় বৌরাণীর কথা ভেবে। কিন্তু মহামায়া 'অত হ্যাঙ্গাম' করতে দেননি। মনে মনে জানতেন চিকের যুগ চলে গেছে। এ বাড়িতে তিনি একা। সংক্ষিপ্ত আয়োজন। আত্মীয়-স্বজনদের ডাকা

হয়নি। গ্রামের মেয়েদেরও বাঁড়ুয্যে বাড়ির আমোদ উৎসবের উপর সে আকর্ষণ নেই। নিমন্ত্রিত সরকারী এবং অসরকারী পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে স্ত্রী কন্যা ভগিনীরা কিছু আসবেন। তাঁরা পুরুষদের মধ্যেই বসবেন, বড়জোর একটুখানি অচিহ্নিত ফাঁক থাকবে মাঝখানে। তাঁরা এ কালের মেয়ে। জানালা-দরজার অলংকরণ ছাড়া পরদার আর কোনো ব্যবহার জানেন না। চিকের পিছনে আত্মগোপন তাঁদের আত্মসম্মানে বাধে।

নায়েবকে অবশ্য এসব কথা বলেননি মহামায়া। নিজের অসুবিধার কথাটাই শুধু জানিয়ে দিয়েছিলেন—"মেয়েদের আলাদা করে বসাতে গেলে দেখাশুনো করা দরকার। সেটা কে করবে? আমি তো সারাক্ষণ এদিকটা নিয়েই ব্যস্ত থাকবো।"

এদিক বলতে অনেক কিছু। বিশিষ্ট অতিথিদের জলযোগের আয়োজন করা হয়েছিল। ওস্তাদজীর মত কয়েকজনের নৈশ আহারের ব্যবস্থাও ছিল। সব তো তাঁকেই দেখতে হবে। মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন, সেগুলো সেরে রেখে যদি সময় হয় একবার গিয়ে বসবেন হলঘরের পাশের কামরায়। মাঝখানের দরজার পাশেই ওস্তাদজীর আসন। কপাটটা একটু ফাঁক করলেই তাঁকে দেখা যাবে, গানও শোনা যাবে। শ্রোতাদের নজর সেখানে পৌঁছায় না।

হঠাৎ কার কাছে যেন শুনলেন, ওস্তাদজী নেমে আসছেন। আশ্চর্য হলেন মহামায়া। এত শীগগির! এ বাড়ীতে অনেক আসর দেখেছেন তিনি। ভাবনা হল, তবে কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন ওস্তাদজী? বয়স হয়েছে, শরীরটাও তেমন ভালো নেই।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন ভিতর মহল থেকে। মাঝের মহলের দরজার কাছে নায়েবের সঙ্গে দেখা। সারা মুখময় গাম্ভীর্যের ঘনছায়া। একবার তাকিয়েই বুঝলেন, গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে থেমে গেলেন। কি জানি কি শুনতে হবে।

নায়েব হতাশাময় দৃষ্টিতে তাকালেন বৌরাণীর দিকে। তারপর ডান হাতের আঙ্গুলগুলো উলটে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "হয়ে গেল।" একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। অতি দুঃখে মানুষের মুখে সে হাসি ফুটে বেরোয়।

"কি হল, নায়েব মশাই?" আরেকটু কাছে সরে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন বৌরাণী।

—যা হবার, যা আশঙ্কা করেছিলাম। তোমায় আমি বলিনি মা, যা নিয়েছে, তাই নিয়েই ওরা থামবে না? ওদের আসল লক্ষ্য এই ভদ্রাসন। তার বুকেও একদিন জবর দখলের নিশান উড়বে। তাই হল। ঐ হলঘর থেকে শুরু। সবচেয়ে মর্মান্তিক কথা, আমরাই তার সুযোগ করে দিলাম। ডেকে এনে বললাম—নাও।

—আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বৌরাণীর এই উদ্বেগাকুল কথাকটি নায়েবের কানে গেল না। তিনি তখন নিজের মনে বলে চলেছেন, "যাবে, আমি জানতাম। আশা করেছিলাম তার আগে আমি যেতে পারবো। তা আর হল না। নিজের চোখের ওপরেই—"

কথাটা শেষ হল না। অভিজিৎ এসে পড়েছিল। তার দিকে চেয়ে থেমে গেলেন নায়েব এবং যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। অভিজিৎ বলল, আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম নায়েব কাকা। বাইরে থেকে যাঁরা এসেছেন, কেউ যেন চলে না যান। আমি তো সবাইকে চিনি না।

—আচ্ছা, আমি দেখছি।

নায়েব চলে গেলেন। অভিজিৎ বৌরাণীর দিকে ফিরে বলল, তোমার এদিকে কদ্দুর? মানে, খাবার দাবার—

মহামায়া সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার মাঝখানেই বলে ফেললেন, ওখানে কি কোনো গণ্ডগোল হয়েছে, ঠাকুরপো?

—গণ্ডগোল! না তো।

—এত তাড়াতাড়ি আসর ভেঙে গেল!

—আসর ঠিক ভাঙেনি। ওস্তাদজী উঠে পড়লেন। এবার তোমার ঐ কলোনীর দল নিজেদের মধ্যে একটু গান বাজনা করছে।

"কলোনীর দল!"—বৌরাণীর কপালে কয়েক সার কুঞ্চন রেখা দেখা দিল, "সেইজন্যেই বুঝি ওস্তাদজীকে উঠে আসতে হল?"

—না, উনি নিজেই উঠে পড়লেন। 'ওস্তাদ' বলতে আমরা যা বুঝি, দেখলাম উনি তা নন। কোথায় থামতে হয়, জানেন। সে যাক।

আমি যাই, তোমার গেষ্ট্‌দের আগলাইগে। হয়ে গেলে একটা হুকুম পাঠিয়ে দিও।

"এই তো হয়ে এল, আর দেরি নেই"—হঠাৎ যেন জোর করে সব দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গৃহকর্ত্রীর আশু কর্তব্যে ফিরে এলেন মহামায়া। "ডিস সাজাতে দিয়ে এসেছি। এবার চায়ের জল চাপাতে বলছি।"

ব্যস্তভাবে ভিতর মহলে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। থমকে দাঁড়ালেন। হলঘর থেকে একটা হল্লার ঝাপটা কানে এসে লাগল। সে দিকে মাথা তুলে একবার তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন।

সেই অসহিষ্ণু চোখ দুটি অভিজিতের দৃষ্টি এড়াল না। বাইরের মহলে যেতে যেতে তার ওষ্ঠ প্রান্তে একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল। ঐ হলঘর থেকে ভেসে আসা এমনি বহুকণ্ঠের উল্লাসধ্বনি এ বাড়িতে নতুন নয়। বহু বছর আগেও শোনা যেত। এর চেয়েও আরো বেশী অসংযম, আরো বেশী মত্ততা ছিল তার মধ্যে। তবু তাকে এরা সয়ে নিয়েছিলেন, মেনে নিয়েছিলেন। আজ পারছেন না। বড় কানে লাগছে। তখন যারা চেঁচাত, আর এখন যারা চেঁচাচ্ছে তাদের মধ্যে দুস্তর তফাৎ। সেইখানে বাধছে।

এই কটা বছরের মধ্যে কাল বড় দ্রুত এগিয়ে গেছে। বৌরাণী আর নায়েব মশাইরা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেন নি।

॥ ৪ ॥

অভিজিৎকে যখন কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হল, তখনো তার গ্রামের স্কুল থেকে পাশ করে বেরোতে দুটো ক্লাস বাকী। হেডমাষ্টার তাদের পড়াতেন না। তবু বাঁড়ুয্যে বাড়ির ছেলে বলে তাকে চিনতেন। স্কুলে এবং তার বাইরেও যোগাযোগ ছিল। তার আর একটা কারণ—এবং সেইটাই সম্ভবতঃ প্রধান—ছেলেটির মনে, কথায় বার্তায়, আচরণে জমিদার বাড়ির ছাপ ছিল না, যা, ওখান থেকে আগে যারা এসেছে তাদের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যেত। দুর্গামোহনবাবু অনেকদিন আগে থেকেই এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত। তরুণ বয়সে এসেছিলেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টীচার হয়ে, ক্রমশ উপরে উঠেছিলেন। তার জন্য একদিনের তরেও কারো দ্বারস্থ হননি।

অভির প্রতি দুর্গামোহনের একটা অলক্ষ্য আকর্ষণ ছিল। স্নেহের তো বটেই। তার সঙ্গে জড়ানো আরেকটা জিনিস, যাকে বলা যেতে পারে সমবেদনা। এই শান্ত, লাজুক, কিশোর ছেলেটির চোখের দিকে চেয়ে তিনি বুঝতে পারতেন, এর মনের মধ্যে কিসের একটা দুঃখ আছে, এবং ওর হয়ে সেটি অনুভব করতেন। তার উৎসটা তাঁর জানা ছিল না। তবে লক্ষ করতেন অভি যেখানকার ছেলে, যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ, তার সঙ্গে যেন নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছেনা। বাঁড়ুয্যেদের ঐ বিশাল পুরীতে ও যেন বড় একা। তার বাইরে যে ছোট্ট জগৎ তার সঙ্গেও নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারছে না। মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওদের ঐ উঁচু-পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটা। বাধাটা ওর দিক থেকে যতখানি, বাইরের দিক থেকে তার চেয়ে আরো বেশী। ও কাদের ছেলে, সেকথা ও ভুলতে চাইলেও গ্রাম ওকে ভুলতে দেয় না।

যেদিন শুনলেন, অভি চলে যাচ্ছে, এবার থেকে কাশীবাসিনী পিতামহীর কাছে থেকে পড়াশুনো করবে, তাঁর ইচ্ছাতেই যাচ্ছে, (এই কথাই প্রচার করা হয়েছিল) দুর্গামোহন একদিকে তার অভাবটা যেমন তীব্রভাবে অনুভব

করলেন, আরেকদিকে তেমনি খুশী হলেন। মনে মনে বললেন, এ ভালোই হল। 'নিজগৃহে পরবাসী' হয়ে থাকার চেয়ে বাইরের প্রবাস-জীবন অনেক সুখকর। প্রিয়জনের যে বিচ্ছেদ, তার মধ্যে বেদনা আছে, বিশেষ করে ঐটুকু ছেলের পক্ষে সেটা ছোট নয়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় মুক্তির আনন্দ। এখানে থাকলে ওর মনটা টবে তৈরী গাছের মত দিন দিন শুকিয়ে যেত, এবারে সে ডালপালা মেলে সজীব হয়ে উঠবে।

হেডমাষ্টার মশায়ের সঙ্গে অভিজিতের দেখা শুনো হত কালে ভদ্রে, কথাবার্তা যা হত তাও সামান্য এবং নিতান্ত মামুলী। তবু কোনো অজ্ঞাত কারণে তাঁকে একান্ত আপনজন বলে মনে হয়েছিল। স্বরূপকাঁদি থেকে যেদিন চলে যেতে হল, তারপর সারাজীবন ধরে সে এই ভাগীরথীর তীরে ফেলে আসা জীবনটাকে ভুলে যাবার চেষ্টাই করে এসেছে। পারেনি। হয়তো পারত যদিনা তিনটি মানুষের অলক্ষ্য আকর্ষ সূক্ষ্মতন্তু মেলে তার অন্তরের চারদিকে জড়িয়ে যেত। তার মধ্যে সব চেয়ে যেটি দৃঢ়মূল, অনেকদিন আগেই তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টির টান উপেক্ষা করতে পারেনি বলেই এতকাল পরে আবার তাকে ফিরে আসতে হয়েছে; তৃতীয়টির সম্বন্ধে মনে মনে সন্দিহান হয়ে ফিরেছিল। কীজানি কি দেখবে এসে? মনোভূমিতে অক্ষয় হয়ে থাকলেও সংসারের মাটি কাউকে চিরদিন ধরে রাখেনা। এসে শুনল, তার আশঙ্কা অমূলক। দুর্গামোহনবাবু আছেন। শুধু 'আছেন' নয়, মনের দিক থেকে এখনো সজীব, শরীরও একেবারে অশক্ত নয়।

দীর্ঘ কর্মজীবন যে মাটিতে কাটিয়েছেন, অবসর জীবনে বোধহয় তার মায়া কাটাতে পারেননি। স্কুল থেকে কিছুটা দূরে গঙ্গার 'নাবাল' অর্থাৎ নীচু তটভূমি যেখান থেকে শুরু, তার ঠিক উপরে একখানি ছোট বাড়ি করেছেন। তাঁর বেশী সঙ্গতি নেই, প্রয়োজনও নেই। স্ত্রী অনেকদিন গত। ছেলেরা কেউ কোলকাতায়, কেউ অন্যত্র নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। একটি মেয়ে; নিঃসন্তান বিধবা। সে-ই থাকে বাপের আশ্রয়ে। অথবা তারই কাছে আশ্রয় নিয়েছেন বৃদ্ধ অসহায় বাপ। দুর্গামোহন অন্ততঃ তাই মনে করেন, বলেও থাকেন লোকের কাছে। তাঁর বিশ্বাস, বিধাতা কাউকে পুরোপুরি বঞ্চিত করেন না।

জলসাতে তিনি আসতে পারেননি। সঙ্গীতে অনুরাগ আছে, কিন্তু এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় বসে শুনবার মত দৈহিক সামর্থ্য নেই। মাঝখানে উঠে পড়াটা তাঁর মতে গায়কের প্রতি অসম্মান। কাজেই ওখানে না যাওয়াই স্থির করেছিলেন এবং ঐমর্মে অভিজিৎকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তার আগেই অভিজিৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছে।

জলসার কয়েকদিন পরে একদিন সকালের দিকে আবার গিয়ে হাজির হল। দুর্গামোহন বাবু কলেজে সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, স্কুলেও প্রধানতঃ ইংরেজি পড়াতেন, কিন্তু অবসর কাটাচ্ছেন দর্শন চর্চায়। সম্প্রতি 'সাংখ্য' নিয়ে পড়েছিলেন। খুব যে একটা আনন্দ পাচ্ছিলেন, তা নয়। অভিজিৎকে দেখে মনে মনে প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। বই বন্ধ করে হাসিমুখে বললেন, এসো অভি।

অভির ইচ্ছা হচ্ছিল মাষ্টার মশাইকে একটা প্রণাম করে। কিন্তু তিনি অব্রাহ্মণ, কিছুতেই ব্রাহ্মণ-সন্তানের প্রণাম গ্রহণ করবেন না। নমস্কারটা বড়ই মামুলী শিষ্টাচার বলে মনে হল। তাই নিঃশব্দে গিয়ে বসল তাঁর ক্যাম্পচেয়ারের পাশটিতে। উভয় তরফে কুশল প্রশ্নাদির পর বলল, বেশ ছিলাম স্যর। বৌরাণীর উপরোধ এড়াতে না পেরে এলাম। মনে করলাম, জমিদারির ঝঞ্ঝাট আর নেই, কটা দিন নির্বিবাদে কাটানো যাবে।

দুর্গামোহন বললেন, জমিদারি গেছে বলে তার ঝঞ্ঝাটও থাকবেনা, তা কেমন করে আশা করছ?

—তাই দেখছি। ঝঞ্ঝাট আরো বেড়েছে। তার ওপরে এই দেখুননা আবার এক নতুন সমস্যায় পড়া গেল।

বলে, পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। দুর্গামোহন বললেন, কী ওটা?

—আপনাকে একবার পড়ে দেখতে হবে স্যার, আর এ ব্যাপারে কী করা যায়, সে সম্বন্ধে একটু উপদেশও দিতে হবে।

"উপদেশ?" হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে ভাঁজ না খুলেই বললেন দুর্গামোহন, "আমি তো চিরকাল শুধু একটা বিষয়েই উপদেশ দিয়ে এসেছি, বাবা—কি করে পরীক্ষায় পাশ করা যায়। এখন তাও দিতে হয় না, আর তোমার তাতে প্রয়োজনও নেই।"

—এও এক পরীক্ষা মাষ্টারমশাই ; স্কুল কলেজের পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশী জটিল।

—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে অবিশ্যি সারাজীবনটাই আমরা পরীক্ষা দিয়ে চলেছি। তার সময় অসময় নেই, নোটিশ নেই, বিষয়টাও আগে থেকে জানা যায়না। বসতেই হবে। পেট কামড়াচ্ছে বলে শুয়ে পড়ে থাকবে, সে উপায়ও নেই।

বলতে বলতে হাতে লেখা কাগজখানা পড়তে শুরু করলেন দুর্গামোহন।

সদর নায়েবের চিঠি। অভিজিতের উদ্দেশে লেখা। কিন্তু যে অভিজিৎ তাঁর স্নেহভাজন, এই পরিবারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের আন্তর সম্পর্কের জোরে যাকে তিনি নাম ধরে 'তুমি' বলে ডাকেন, সে নয় ; যে অভিজিৎ তাঁর বর্তমান মনিব, তাঁর অন্নদাতা জমিদার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাকেই সম্বোধন করেছেন।

সম্ভাষণও সেই অনুযায়ী।

মহামহিমবরেষু

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর অধীনের বিনীত নিবেদন এই, দীর্ঘকাল যাবৎ আমি আপনার সেরেস্তায় সদর নায়েবের পদে অধিষ্ঠিত আছি। আপনার পরলোকগত পিতৃদেবের আদেশ ও ইচ্ছা বিশ্বস্তভাবে পালন করিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর পরম শ্রদ্ধেয়া বধূরাণীর সহিত পরামর্শ ক্রমে তাঁহারই নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি। জ্ঞানতঃ কোন ত্রুটি করি নাই।

যেদিন হইতে সরকার জমিদারির অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার পরেও জমিদারের তরফে যাহা যাহা করণীয়, আপনার প্রতিনিধি হিসাবে যথাসাধ্য পালন করিয়াছি।

বর্তমানে আমার ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। জমিদারের বেতনধারী কর্মচারী হিসাবে তাঁহার স্বার্থরক্ষাই আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। সে সম্বন্ধে আমি সর্বদা সচেতন। যদি দেখিতে পাই কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির কোন নীতি বা নির্দেশ তাহার পরিপন্থী, তখন তাহা পালন না করা যেমন অবাধ্যতা, পালন করাও তেমনই আমার বিবেক ও কর্তব্য-জ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ।

এই অবস্থায় কার্যভার ত্যাগ করাই আমার একমাত্র পথ বলিয়া স্থির করিয়াছি।

বলা বাহুল্য কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কিংবা সাময়িক উত্তেজনা বশে আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি নাই।

বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই অনেক চিন্তার পর নিতান্ত অনিচ্ছাভরে আমাকে এই পদত্যাগ পত্র পেশ করিতে হইল।

আমার বিশ্বাস, ইহার দ্বারা সেরেস্তার প্রকৃত মঙ্গল হইবে। আপনার আস্থাভাজন কোন উপযুক্ত ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া আপনিও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

আমার অনিচ্ছাকৃত দোষ ত্রুটি মার্জনা করিয়া আমাকে অবিলম্বে মুক্তি দিলে বাধিত হইব।

ইতি

একান্ত বশংবদ

যজ্ঞেশ্বর সরকার

সদর নায়েব।

চিঠিখানা শেষ করতে কয়েক মিনিট লাগল। তারপরেও বেশ কিছুক্ষণ মাষ্টার মশাই ক্যাম্প চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চুপ করে রইলেন। অভিজিৎও কোন কথা বললনা। আরো খানিকক্ষণ কেটে যাবার পর সোজা হয়ে বসে গলাটা পরিষ্কার করে বললেন, কি করবে স্থির করেছ?

—স্থির করতে পারিনি বলেই তো আপনার কাছে এলাম।

—বৌরাণী জানেন এ চিঠির কথা?

—জানেন। তাঁকে দেখিয়েছি।

—কী বললেন?

—বললেন, তুমি যা ভালো বোঝ, কর।

—তাছাড়া আর কী বলবেন? সকলেই তাই বলবে। এতদিন দূরে ছিলে, ওঁরা যা ভালো বুঝেছেন, করেছেন। এবার সব দায়িত্ব তোমার।

—এসব দায়িত্ব নেবার জন্যে আমি আসিনি স্যর। তারজন্যে তৈরীও নই। তাহলে তো বাবার মৃত্যুসংবাদ যেদিন পেলাম আর সেই সঙ্গে শুনলাম

দাদা তাঁর আগেই গেছেন, তখনই আসতাম। আমি এসেছি, বলতে গেলে বৌরাণীর জন্যে। ওঁর চিঠিটা পড়ে মনে হল একবার দেখে আসি। শুধু কদিনের জন্যে আসা।

—কিন্তু ওঁর দিকটাও তো দেখবার আছে। এতবড় একটা বাড়িতে একেবারে একা। উনিই বা কার জন্যে এসব ঝঞ্চাট পোহাতে যাবেন? একটি সন্তান যদি থাকত, তাহলেও না হয় কথা ছিল।

অভিজিৎ চুপ করে রইল। এর উপরে বলবার কিছু নেই। সে নিজেও এ কথা ভেবেছে, বিশেষ করে আসবার পর, যখন নিজের চোখে দেখেছে এই রিক্তা রমণীর নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা। অবাক হয়ে গেছে, কেমন করে কী নিয়ে আছে বৌরাণী! যে-সব মেয়েদের মন বলে কোনো বালাই নেই, শুধু দম দেওয়া কলের মত চলে, সংসার নামক যন্ত্রের চলমান অংশ, সকাল থেকে সন্ধ্যা একটা বাঁধাধরা পথে আবর্তিত হচ্ছে, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু মহামায়া সে জাতের মেয়ে নন। তাঁর অনুভূতি আছে, সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণধার অনুভূতি। সব কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে। ভাবতে জানেন, চোখের উপর যা দেখেছেন এবং এখন দেখছেন, তার সম্বন্ধে সচেতন। তা সত্ত্বেও যে এতগুলো বছর, এত ওলট পালট, শোক-তাপ-সংঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, ভেঙে পড়েননি, পালিয়ে যাননি, তার মূলে রয়েছে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁর অসামান্য মনোবল এবং সকলের উপরে তাঁর অত্যাজ্য কর্তব্যবোধ।

অভিজিৎকে নীরবে বসে থাকতে দেখে দুর্গামোহন বোধহয় ওর চিন্তাধারাটা আঁচ করতে পারলেন এবং তারই উপর জোর দিলেন। বললেন, উনি তো বাড়ির বৌ, বয়সও হল, প্রৌঢ়াই বলা চলে। ওঁরই কাশী চলে যাবার কথা। কিন্তু যাননি। একমাত্র কর্তব্যজ্ঞান ওঁকে আটকে রেখেছে। যে পরিবারের বধূ তার প্রতি ওঁর দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারেননি বলেই পড়ে আছেন। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে।

অভিজিৎ এ প্রসঙ্গ আপাততঃ আর অগ্রসর হতে দিল না। চিঠিটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এটার সম্বন্ধে কী করা যায়?

দুর্গামোহন খোলা কাগজখানার উপর আরেকবার দৃষ্টি ফেলে বললেন,

আমার মনে হয়, যজ্ঞেশ্বর যখন যেতে চাইছে, ওকে আর আটকে না রাখাই ভালো। এই চিঠির ভেতর একটা জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছে—ওর সততা, যাকে বলতে পার সিনসিয়ারিটি অব পারপাজ। মনে এক মুখে আর নয়। কোথায় ওর বাধা, স্পষ্ট করে বলে কয়ে বিদায় চাইছে। এটা খুব প্রশংসনীয়। অন্য কেউ হলে আসল কারণটা এড়িয়ে গিয়ে হয়তো বলত, বয়স হয়ে গেছে, শরীর ভালো নেই, এবার চলে যেতে চাই। ও তা বলেনি। ওর যেখানে অসুবিধা, অকপটে খুলে বলেছে। তারপরে আর থাকতে বলা যায় না। বললেও থাকবে না।

অভিজিৎ বলল, ওঁর আসল ব্যক্তব্যটা যদি শুধু এই হত যে ওঁরা যে যুগের মানুষ সেটা আর নেই, যে মনোভাব নিয়ে এতকাল জমিদারী চালিয়ে এসেছেন সেটাও বদলাতে হবে—যা ওঁর পক্ষে শক্ত—আমার পক্ষেও ওঁকে ছেড়ে দেওয়াটা সহজ হত। কিন্তু উনি ঠিক তা বলেননি। ওঁর কথার মধ্যে আমার ওপরে একটা প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ আছে। সেইটাই আমাকে বিঁধছে। এতকালের একজন অনুগত বিশ্বস্ত কর্মচারী চলে যাবার সময় একটা অভিযোগ নিয়ে যাবেন—

কথাটা সম্পূর্ণ না করলেও দুর্গামোহনের বুঝতে অসুবিধা হলনা অভিজিৎ কি বলতে চায়। বললেন, ঐ লাইনটা আমিও লক্ষ্য করেছি। যেখানে বলছে—আপনার আস্থাভাজন কোনো উপযুক্ত লোকের উপর ভার দিলে আপনিও নিশ্চিত হতে পারবেন। ওটাকে ক্ষোভ না বলে বরং অভিমান বলতে পার। সে তো একটু থাকবেই। যাদের জন্যে আছি, সারাজীবন ধরে খাটছি, তাদের সঙ্গে যদি আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং-এর অভাব হয়, মত বা আদর্শের অমিল দেখা দেয়, আঘাত তো লাগবেই। ওর ওপর কোন গুরুত্ব দিওনা। এখনই যদি ডেকে পাঠিয়ে বল, আপনার ওপর আমার আস্থার অভাব নেই, তার কোন কারণও ঘটেনি ; ওর মনের যা কিছু তাপ সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে যাবে। ওকে আমি চিনি, তোমার চেয়ে অনেক বেশী দিন ধরে দেখছি। অনেক দুষ্কর্ম্ম করেছে জীবনে, কিন্তু মনটা সরল।

এতদিনের পুরনো, অনুগত এবং কর্মঠ কর্মচারী একটা দুঃখ নিয়ে চলে যাবে এবং সে নিজেই তার উপলক্ষ, একথা ভেবে অভিজিৎ মোটেই স্বস্তি পাচ্ছিলনা। মাষ্টার মশায়ের কথায় সেদিক দিয়ে অনেকখানি আশ্বস্ত হল।

এই ব্যাপার নিয়ে এতক্ষণ ভিতরে ভিতরে যে কাঁটাটা বিঁধছিল, তার থেকে মুক্তি পাওয়া গেল।

যজ্ঞেশ্বর সরকার যে নিজে থেকেই চলে যাচ্ছেন, সেটা ভালোই হল। তা না হলে হয়তো সে অপ্রিয় কর্তব্যটি অভিজিতকেই পালন করতে হত। মনে মনে সে পরিস্থিতির জন্য সে তৈরী হচ্ছিল। সদর নায়েব হিসাবে তার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত, বাঁড়ুয্যে পরিবার তার কাছ থেকে যে সার্ভিস্, যে অক্লান্ত সেবা পরিচর্যা এবং আনুগত্য পেয়ে এসেছে, তারও কোনো তুলনা নেই। তবু তার যাবার প্রয়োজন এসে গিয়েছিল।

কর্মী মাত্রেরই একটা নির্দিষ্ট কাল আছে, যার বেশী তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। যতবড় প্রতিভাই হোক, তার বিকাশের এবং পূর্ণতার একটা সীমা আছে, যেখানে তাকে থামতে হয়। মানুষ যেমন অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে জন্মায়না, তেমনি তার শক্তি এবং তার প্রয়োগ ক্ষেত্রও অখণ্ড নয়। তার শেষ আছে। সেই লাইনটি পেরিয়ে গেলে তার মূল্য পড়ে যায়। তখনও যদি সে সরে না যায়, গদি আঁকড়ে পড়ে থাকে, কালই তাকে সরিয়ে দেয়; ইতিহাসের ভাষায় তখন সে অ্যানাক্রনিজম্, যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

সদর নায়েব যজ্ঞেশ্বর সরকারও তেমনি তার যুগ পেরিয়ে এসেছেন। তাকে যে যেতে হচ্ছে, এ তার দোষ নয়, অক্ষমতার জন্যেও নয়, যেতে হচ্ছে কালের প্রয়োজনে, সময়ের যে স্বাভাবিক স্রোত তারই অলঙ্ঘ্য বিবর্তনে।

যে ক্ষমতার তিনি ধারক ও বাহক, তার অবসান ঘটেছে। সেটা গ্রহণ করেছেন দেশের সরকার। জমিদারি গেছে, তার সঙ্গে তার প্রতাপ চলে গেছে, কিন্তু তাপটুকু যায়নি। সেটা গিয়ে জড়ো হয়েছে এঁদের মনে। তাতে এসে ইন্ধন যোগাল এই উদ্বাস্তুরা। জমিদারি চলে যাবার পরেও যে জমিতে এঁদের অখণ্ড এবং একচ্ছত্র অধিকার তারই উপর এসে জোর করে চেপে বসল। আগেকার দিন হলে এই অন্যায় জুলুমের উপযুক্ত জবাব দিত লাঠি। এই লোকগুলো জানে, লাঠি নেই। থাকলেও তার সে জোর নেই। তাই এত দুঃসাহস। এ যেন পঙ্গু হৃতশক্তি বাঁড়ুয্যেদের বিরুদ্ধে একটা উদ্ধত চ্যালেঞ্জ,—ক্ষমতা থাকে ঠেকাও। হ্যাঁ, জোরকরে নিয়েছি। 'জবর দখল' কথাটার মধ্যেই তো তার স্বীকৃতি আছে। তোমার জোর থাকে আমাদের আবার বেদখল কর।

সদর নায়েব এই ভাবেই দেখেছেন এই কলোনীর ব্যাপারটাকে। অন্য ভাবে দেখবার দৃষ্টি তাঁর নেই। এর যে আর একটা দিক আছে, সেটা তিনি ভাবতেও পরেন না। কারা এরা, কেন এসে পঙ্গপালের মত উড়ে এসে পড়ল তাদের জমিতে, কারা এদের এই অন্যায় অনধিকারের পথে ঠেলে দিয়েছে—এসব প্রশ্ন তাঁর কল্পনাতেও আসেনি। অন্য কেউ তুলতে গেলে অবান্তর বলে উড়িয়ে দেবেন।

কিন্তু অভিজিৎ জানে, এসে অবধি ভেবে দেখেছে। এই প্রশ্নগুলোকে আজ আর এড়িয়ে যাবার উপায় সেই। আইন অবশ্য এখনো নায়েব এবং তাঁর মনিব পক্ষের পিছনে এসে দাঁড়াবে। ঘটনা নিয়ে তার কারবার। কী ঘটেছে? ব্যাপারটা কী? হোয়াট আর দি ফ্যাক্ট্স্ অব দি কেস্? এই টুকুই তার প্রশ্ন। উত্তর অতি সরল। কতগুলো বাইরের লোক এসে জবরদস্তি করে দখল করেছে এত বিঘা জমি। কার জমি? "আমাদের" এগিয়ে এসে বলবেন সদর নায়েব, "এই তার প্রমাণ"। বলে দাখিল করবেন লোহার সিন্দুকে সযত্নে তুলে রাখা বিবর্ণ জীর্ণ দলিল, হয়তো মোগল বাদশা কিংবা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফরমান। তার থেকে দেখা যাচ্ছে, এ জমি শ্রীল শ্রীযুক্ত অমুক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বসত বাটীর অন্তর্গত, তাঁর বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে এটা ভোগ দখল করে আসছেন। বর্তমান মালিক শ্রীঅভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই দখলিকার।

ব্যস্, আর কিছু দরকার নেই। স্বত্ব এবং দখল—এই দুটি শব্দের উপর দাঁড়িয়ে আদালত তার রায় দেবেন—উৎখাত কর লোকগুলোকে, দে আর ট্রেস্পাসার্স্। ঘর দোরগুলো ভেঙে দাও—দে আর আনঅথরাইজড্ স্টাক্চারস্।

অতঃপর মালিক পক্ষ থেকে কিছু তদ্‌বির তদারক। সে গুলো যদি ঠিকমত এবং ঠিক জায়গায় লেগে যায় পুলিশ এসে কোর্টের হুকুম তামিল করবে। কার পুলিশ? গভর্মেণ্টের। কোন্ গভর্মেণ্ট্? যার মূঢ়তা, অক্ষমতা, এবং হয়তো গোপন অভিসন্ধি এই হতভাগা গুলোকে তাদের বহু পুরুষের স্বত্ব এবং দখল থেকে উপড়ে এনে ফেলেছে এইখানে। সেখানে কোন আইন ছিল না, এখানে আইনের রাজত্ব। ফল উভয় ক্ষেত্রেই এক। লাঠির জোরে উৎখাত।

আর একটু তফাৎ আছে। ওখানকার লাঠি শুধু তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত

হয়নি। গোরু ভেড়ার মত মারতে মারতে নিয়ে এসেছে দীর্ঘ পথ। শুধু কি মার? তার সঙ্গে আর যা জুটেছে, গোরু ভেড়ার উপর তা কেউ করেনা। পুরুষের গেছে পৌরুষ, নারীর গেছে শুচিতা, সম্ভ্রম। যাদের প্রাণ গেছে তারা তো গেলই। সেই প্রাণটা নিয়ে যারা কোনরকমে আসতে পেরেছে, তারা হারিয়ে এসেছে ধন, মান, আপনজন এবং তার চেয়েও বেশী মূল্যবান, মানুষের উপর বিশ্বাস।

এই উদ্বাস্তু কলোনীর মানুগুলোর চোখে মুখে কপালে লেখা আছে সেই নির্লজ্জ কিন্তু জীবন্ত ইতিহাস। তার কথা বাদ দিয়ে এদের কথা ভাবা যায়না। প্রশ্নটা শুধু আইনের নয়। কেবলমাত্র অধিকার আর অনধিকারের বাঁধা ফরমুলায় ফেলে এদের বিচার চলেনা।

মাষ্টার মশায়ের কাছে আসবার আগে অভিজিৎ বসে বসে ভাবছিল, মানুষ আইনকে অনুসরণ করে চলবে, একথা যেমন সত্য, আইন মানুষকে অনুসরণ করে তৈরী হবে, একথাও তেমনি সত্য। মানুষের চিন্তাধারা, জীবন যাত্রার রীতি নীতি সামাজিক অবস্থা যেমন যেমন বদলায়, আইনকেও ভেঙে চুরে বেঁকিয়ে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পুরনো যুগের আইন দিয়ে নতুন যুগের সমস্যার সমাধান কি সম্ভব?

এ তো গেল সরকারের ভাবনা। মানুষের জীবনে যখন কোনো নতুন প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দেয়, তার বেলাতেও সেই কথা। আমার পুরনো মন, পুরনো দৃষ্টি নিয়ে এগোতে গেলে তার মূলের নাগাল পাবো না। তাকে বুঝবার মত, তার অন্তর্নিহিত রূপটি উপলব্ধি করবার মত নতুন মন চাই। তা যদি আমার না থাকে, এমন কারো শরণ নিতে হবে যার আছে।

এই কলোনীর ব্যাপারে তেমন একজনের অভাব অনুভব করছিল অভিজিৎ। সেই কথাই এবার সে মাষ্টার মশায়ের কাছে উপস্থিত করল—নায়েক কাকাকে তাহলে ছেড়ে দিই। কিন্তু তারপর?

তুর্গামোহন বাবু বললেন, নতুন নায়েব নেবার কথা বলছ? তার কি তেমন দরকার আছে? এখন সেরেস্তার যা সামান্য কাজ, মুহুরিদের দিয়েই বোধহয় চলে যাবে।

—আমি সেরেস্তার জন্য ভাবছি না, স্যার। ভাবছি ওদের কথা—শম্ভুচরণ অ্যাণ্ড কোম্পানী।

দুর্গামোহন বাবু হাসলেন। শম্ভুচরণের নামটা আগেই তাঁর কানে এসেছিল। বলতে যাচ্ছিলেন, ওটা কি আর কাউকে দিয়ে হবে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কিছুক্ষণ আগেই অভিজিৎ বলছিল, শুধু কদিনের জন্যে আসা। তাই থেমে গেলেন।

অভিজিৎ হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, আচ্ছা সে কথা আরেকদিন হবে। আজ উঠি, আপনার চান করবার বেলা হল।

বাড়ি ফিরবার একটা কোনাকুনি পথ ছিল, মাঠের উপর দিয়ে। সেটা দিয়ে না এসে অভিজিৎ একটু ঘুর পথ ধরল, গঙ্গার ধার দিয়ে এল। কিছুদূর আসতেই শুরু হল তাদের বাড়ির সীমানা, নদীপর্যন্ত তার বিস্তৃতি। সব জায়গাটা এখন কলোনীর দখলে চলে গেছে। সদর মহলের দোতলা থেকে ওপাশটা তার নজরে পড়েছে। এদিকটা ভালো করে দেখা হয়নি। এলো পাতাড়ি গড়ে-ওঠা টিন আর টালির কুঁড়েগুলো তাকে নতুন করে পীড়া দিল। একটা অসুন্দর আর অব্যবস্থার রাজ্য। 'প্ল্যান' বলে কোন বালাই নেই, রুচি বলে কোনো বস্তু নেই। শেষেরটা যে একেবারে নেই, তাই বা বলে কেমন করে? কোনো কোনো কুটিরের সামনেটা বাখারি কিংবা কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে দুচারটা শিশু কলাগাছ সতেজ ভঙ্গিতে মাথা তুলে উঠছে। কোথাও কোথাও দুটি একটি ঝুমকো অথবা অপরাজিতার লতা অনেকটা যেন আপন মনে বয়ে চলেছে। কিংবা যথেচ্ছভাবে বেড়ে উঠছে এক সার গাঁদা ফুলের চারা।

রুক্ষ কঠিন প্রয়োজনের এলাকায় একটুখানি অপ্রয়োজনের অনুপ্রবেশ।

ওগুলো আপনা থেকে আসেনি। এই লোকগুলোই কোথা থেকে এনে বসিয়েছে। এদের বাইরেটা যতই শীর্ণ শুষ্ক হোক, ভিতরটা হয়তো এখনো একেবারে শুকিয়ে যায়নি। আস্তে আস্তে যাবে, যাবার পথ ধরেছে। সদ্যোবিগত অতীতের নৃশংস ইতিহাস আর বর্তমানের কঠোর জীবনযাত্রার নির্মম তাড়না যে পথে এদের নিয়ে চলেছে তার মধ্যে হয়তো সৌন্দর্যের, মাধুর্যের একটা বিন্দুও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। ঠিক রাস্তাটা ধরতে পারলে যে লোকগুলো একটি সুন্দর সুসংবদ্ধ সুস্থ মানবগোষ্ঠীর রূপ নিতে পারত, এইভাবে চলতে থাকলে তারাই একটা কুৎসিত, নীচাশয়, উচ্ছৃঙ্খল 'জনতায়'

পরিণত হবে। সেই প্রচণ্ড অপচয়ের হাত থেকে এতগুলো মানুষকে রক্ষা করবার কি কোন উপায় নেই ?

এই প্রশ্নটা ক'দিন থেকে অভিজিৎকে স্বস্তি দিচ্ছিল না, এবং এই মুহূর্তে গঙ্গাতীরের রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে সেই কথাগুলোই সে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে দেখছিল।

একপাল উলঙ্গ এবং অর্ধোলঙ্গ ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি করতে করতে অভিজিতের সামনে দিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছিল, বোধহয় স্নান করতে। হঠাৎ নজরে পড়ল, যেতে যেতে কয়েকটা ছেলের মধ্যে মারামারি লেগে গেছে। এ বয়সী ছেলেগুলো মারামারি করে থাকে, সেটা কিছু নয়, কিন্তু এর ধরণটা যেন আলাদা। তাছাড়া, কীল, ঘুষি ধাক্কাধাক্কির সঙ্গে যে সব কদর্য গালাগালি চালাচ্ছিল তারা, শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। অথচ একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এরা সবাই, যাদের নিম্নশ্রেণী বা চলতি ভাষায় ছোটলোক বলে, সে স্তর থেকে আসেনি। নাম জিজ্ঞাসা করলে 'উচ্চবর্ণের' উপাধিও কিছু পাওয়া যাবে।

আরেকটা জিনিস বড় চোখে লাগল অভিজিতের। দলটির মধ্যে কয়েকটা বড় ছেলে যেমন ছিল, তেমনি কিছু মেয়েও ছিল যাদের ছোট বলা চলে না। সকলেরই পরণে ময়লা ফ্রক, কারো কারো ছেঁড়া। তাদের সঠিক বয়স তার জানা নেই। কিন্তু এ কথা জানে, যে-দেশ থেকে এরা এখানে এসে জুটেছে সেখানে কোনো বয়স্কা আত্মীয়া বা প্রতিবেশিনীর সঙ্গে ছাড়া এই রকম মেয়েরা শুধু ছেলের দলে মিশে স্নান করতে যেত না। যেমন, এই অঞ্চলে যাদের বাস, তারাও যাবে না। অবশ্য পশ্চিমের তুলনায় পূর্বাঞ্চলের মেয়েরা একটু বেশী 'ফ্রী'; চলাফেরায় স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। কিন্তু সে অন্য জিনিস। তার মধ্যে শালীনতার অভাব নেই। একটু বড় হয়ে উঠলেই ছেলের তুলনায় মেয়ের আব্রু রক্ষার দিকে নজর দেবার বিশেষ প্রয়োজন তারা অবশ্যই মেনে চলে। এটা শুধু তার অনুমান নয়, সে দেখেছে। কাশীতে বসেও লক্ষ করেছে। কাশী তো সারা ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। সব অঞ্চলের সব রকম মানুষকে সেখানে কাছ থেকে দেখা যায়। বিশেষ করে যখন বড় বড় 'যোগ' লাগে, নানাবেশী, নানাভাষী, নানা বয়সী নরনারী, অলিতে গলিতে, মাঠে মন্দিরে ঘাটের সিঁড়িতে দু'দিনের

জন্যে সংসার পাতে ; তাদের জীবনযাত্রার খাঁটি অনাবৃত রূপটি সহজেই ধরা পড়ে। সেখানে অন্ধ্র, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাবের সঙ্গে পূর্ববাংলাকেও সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে, দেখে আকৃষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে দু'চারটি সাধারণ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে। এরা তার অচেনা নয়। মেয়েদের সম্ভ্রম ও শ্লীলতাবোধ এদের কারো চেয়ে কম নয়, তাও সে প্রত্যক্ষ করেছে।

আজ এই মেয়েগুলোকে দেখে মনে হল, সেখানেও ভাঙন ধরে গেছে। এদের বাপ-মা অভিভাবকেরা ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না। ওগুলো যেন এখানে অনাবশ্যক। ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে যে মেয়েগুলো বড় হয়ে উঠেছে তাদেরও ভব্যতা, শালীনতা, চালচলন, পোষাক-আষাকের দিকে নজর দেবার আর প্রয়োজন নেই। এইটাই যেন মনোভাব। ওরা যেখানে এসে পৌঁছেছে, সেই অবস্থা থেকেই তার উৎপত্তি।

ঝড় কিংবা বন্যার বেগে যে নৌকার নোঙর ছিঁড়ে গেছে, তার যেমন আর কোনো দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ থাকে না, একমাত্র লক্ষ্য কোনো-রকমে প্রাণটুকু বাঁচানো, এরাও আজ তাই। সমাজবন্ধন থেকে এমনভাবে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার পর তার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই। তার নিয়মকানুন মেনে চলবার দরকারও ফুরিয়ে গেছে। এখন একমাত্র দরকার শুধু বেঁচে থাকা, জৈবিক অস্তিত্বটা বজায় রাখা।

আরেকটা জিনিস বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছিল অভিজিৎ। ছেলের দলের মারামারিটা বড় মেয়েকটাও হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। সেই অশ্রাব্য গালাগালি শুনেও তাদের কোনো ভাবান্তর নেই। তার নোংরা রসটাও হয়তো মনে মনে উপভোগ করছিল। তা যদি নাও করে থাকে, যা লজ্জাকর তার থেকে লজ্জা পাবার যে স্বাভাবিক বোধশক্তি সেটুকু তারা হারিয়ে বসেছে। দেহে কৈশোরের, কারো কারো আসন্ন যৌবনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে চোখে মুখে যে মধুর সঙ্কোচ-নম্র স্নিগ্ধ ছায়াটি নেমে আসে, তার দেখা নেই। এর চেয়ে বড় শূন্যতা আর কী আছে মানুষের জীবনে? কোন্ পথে চলেছে এরা? হয়তো এখনো এদের ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু কেমন করে?

মহামায়া ব্যস্ত হয়ে ঘরবার করছিলেন। অভিজিৎ ফিরতেই তীব্র

অনুযোগ—কোথায় গিয়েছিলে বল তো? কত বেলা হল, হুঁস আছে?"

"কোথায় বেলা! সবে তো বারোটা বেজে কুড়ি। ওখানে থাকতে—"

"থাক; ওখানে কি করতে না করতে আমি তো দেখতে যাইনি। এখানে তাই বলে এত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে পেটে পিত্তি পড়বে, সে হবেনা।

অভিজিৎ ছদ্মগাম্ভীর্যের সুরে বলল, স্বরাজ যে কি মূল্যবান বস্তু এতদিনে বুঝতে পারছি।

মহামায়া রান্নামহলের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। ফিরে দাঁড়িয়ে চাপা হাসিটা ঠোঁটে চেপে রেখেই বললেন, কেন, আমি তো তোমার স্বরাজে কোথাও হাত দিচ্ছিনা। করনা যা খুশি। শুধু—

"ঐ 'শুধু' গুলোই হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিচ্ছে স্বরাজ আর বৌরাণী-রাজে কত তফাৎ।

মহামায়া মনে মনে খুশী হলেন। হাসিটা স্পষ্ট হল। বললেন, বৌরাণীর রাজত্ব আর কদ্দিন? আসল রাণীটি এসে যখন পাটে বসবেন, তখন দেখবো স্বরাজের জন্যে এই আপসোস কোথায় থাকে।

অভিজিৎ কি একটা বলতে যাচ্ছিল। বৌরাণী বাধা দিলেন, "আর কথা নয় শীগগির চান করে এসো। আমি খাবার দিতে বলি।"

খেতে গিয়ে অভিজিৎ অবাক। ঘরটা ঠিক আছে। সেই ঘর, যেখানে বসে তার বাবা খেতেন সেই কত বছর আগে, মা পাখা হাতে নিয়ে বসতেন তাঁর বাঁ পাশটিতে। বিশাল পিঁড়ির সামনে তার সঙ্গে মানানসই রূপোর থালা, তার তিনদিক ঘিরে নানা আকারের বাটি। অভির খাবারও এবার শুরু থেকে সেখানেই দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন বৌরাণী। অনেকটা সেই পুরনো ধরণে, শুধু তার রাজসিক ভাবটা কিছু কিছু বাদ দিয়ে।

আজকের ধরণ একেবারে আলাদা। পিঁড়ি, ভারী ভারী থালা গেলাস, বাটি সব অন্তর্হিত। তার জায়গা নিয়েছে সাদা ধবধবে ঢাকা ঘেরা খাবার টেবিল, পাশে তারই সঙ্গে জোড় মেলানো চেয়ার। বাসনগুলো অবশ্য খাগড়াই কাঁসার, আকারে অনেকটা ছোট, হালকা, এবং নকসা-কাটা নয়। ঝকঝক করছে পালিস, যেন মুখ দেখা যায়।

ঠাকুরের পিছন পিছন বৌরাণী ঘরে ঢুকতেই অভি তাঁর দিকে চোখ তুলে

তাকাল। তার মধ্যে সপ্রশ্ন বিস্ময়! তিনি বললেন, ছাখ, সব ঠিক হয়েছে কিনা। আমার বিছে তো জান। এসব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ী। তবে কিষণের পছন্দ হয়েছে।

কিষণ অভির বেনারসী ভৃত্য। মনিবের সঙ্গে সব জায়গায় ঘোরে, এখানেও এসেছে।

অভি বলল, "এসব তোমাকে কে করতে বলল?"

—"বলবে আবার কে? এর সঙ্গে কাঁচের বাসন হলেই অবিশ্যি মানাত ভাল। কিষণেরও দেখলাম তাই ইচ্ছে। আমার পছন্দ হল না। তাছাড়া আমার ঝিয়েদের যা হাত, ছুদিনেই সব ভেঙে সাবাড় করে দেবে। তার চেয়ে এই ভালো। এতে তো কোনো অসুবিধে নেই। কী বল?"

—না, না; অসুবিধে কিসের? এতদিন যেভাবে খাচ্ছিলাম, তাতেই বা কী অসুবিধে ছিল? এতেই বরং একটা 'সকড়ি'-সমস্যা দেখা দিতে পারে।"

—কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। তুমি বসো দিকিন।

পিঁড়ি বা আসনে পা মুড়ে বসে ঝুঁকে পড়ে খাওয়া অনেকদিন অভ্যাস নেই। সেটা আবার নতুন করে ধরতে গিয়ে অভিজিৎ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিল, যদিও সেটা প্রকাশ করেনি এবং হাবভাবে প্রকাশ না পায় সেই চেষ্টা করেছে। তা সত্ত্বেও বৌরাণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হয়তো সেটা লক্ষ করেছে। তাই সনাতন রীতি পালটে দিয়ে সে যাতে অভ্যস্ত সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি, জানতে পর্যন্ত দেননি। সরঞ্জামগুলো রাতারাতি আমদানী করে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

খাবার সময় দেওরের যে অস্বস্তি বা আড়ষ্টতা বৌরাণীর নজরে পড়েছে, তিনি হয়তো জানেন না, যে তার আসল কারণটা অনভ্যাস নয়। তার মূল আরো গভীরে। খাওয়া নামক ব্যাপারটাকে ঘিরে যে 'শো' এবং আড়ম্বর, সেইখানে তার বাধছিল। আসন এবং বাসনগুলোর জাত, আকৃতি, ওজন ও সংখ্যা, খাদ্যবস্তুর বিপুল বাহুল্য এবং তার চেয়েও বেশী, সেইগুলোর মধ্যে নিহিত যে একটি বিশেষ মানসতা, তার সঙ্গে সে রফা করে উঠতে পারছিল না। বৌরাণীকে তা মুখ ফুটে বলা যায় না। তাঁর কাছে ঐ

জিনিসগুলো এই পরিবারের মর্যাদার অঙ্গ। তার ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। ওর ভিতরকার অসারতা তিনি উপলব্ধি করবেন অতটা তাঁর কাছে আশা করা যায় না। কিন্তু অভিকে তো তিনি জানেন, এই কদিন ধরে খুব কাছ থেকে দেখছেন। তার থেকে হয়তো বুঝতে পেরেছেন, এইগুলোর মধ্যে সে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছেনা।

সেই কথা ভেবেই আরো বেশী বিস্ময় বোধ করছিল অভিজিৎ এবং এই মুহূর্তে বৌরাণীর প্রতি তার মনটা শ্রদ্ধায় ভরে গেল। সেই সঙ্গে সে আরেকটা বিষয়ে আশান্বিত হয়ে উঠল, দুর্গামোহনবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই পথটা আসতে আসতে যে কথা সে ভাবছিল। এই কলোনীটাকে আশ্রয় করে তাদের যে সমস্যা, সেগুলোকেও হয়তো শুধু বাঁড়ুয্যে বাড়ির বধূর মন দিয়ে দেখবেন না মহামায়া, অভির দিকে চেয়ে তার মনটাকেও বুঝতে চেষ্টা করবেন। তার কোনো কাজে তিনি বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না কিংবা সেটা মনঃপূত না হলেও নীরব থাকবেন, এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সেইটুকুই তো যথেষ্ট নয়। শুধু একটা অনিচ্ছুক সায় কিংবা নির্লিপ্ত সম্মতি পেলেই তার চলবে না। বৌরাণীর সমর্থনও তার চাই। সেটা যে সে শুধু কামনা করে, তাই নয়, সেটা তার প্রয়োজন। সে সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বিশেষ আশ্বস্ত হতে পারছিল না। এবারে অনেকটা ভরসা পেল। বাইরের দিক থেকে ব্যাপারটা অতি সামান্য, পিঁড়ির বদলে চেয়ার টেবিল। কিন্তু অনেক সময় অনেক তুচ্ছ বস্তুর মধ্যেও বৃহৎ কিছুর ইঙ্গিত থাকে।

খেতে দেবার পদ্ধতির বদল হলেও এই সময়টিতে বৌরাণীর যে নিত্য কর্ম সেটা ঠিক আছে। তফাৎ এই,—আগে সে পর্বটি চলত বসে বসে, এখন পাশে এসে দাঁড়াতে হল। শুরু করতে যাবেন এমন সময় অভি বলে উঠল, উঁহুঁ, ওটা চলবে না।

"কোনটা ?"

"ঐ পাখা।"

"কেন ?"

"ইংরেজিতে ওকে বলে অ্যানাক্রনিজম্। মানে যে যুগের যেটা নয়, তাকে সেই যুগে টেনে আনা। ইতিহাসের চোখে ভীষণ দোষ।"

"কিন্তু এই বেয়াড়া মাছিগুলো তা শুনছে কই? ওরা তো ইতিহাসের ধার ধারে না।"

"তাহলে এক কাজ কর। আমার মত এমনি একখানা উচ্চাসন আনতে বল।"

"কিচ্ছু দরকার নেই। তুমি খাও। এতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।"

"তোমার না হলেও আমার হচ্ছে। একে তো এই ব্যাপারটাতেই আমার আপত্তি। একজন আরাম করে খাবে, আরেকজন কষ্ট করে তাকে হাওয়া করতে থাকবে, এটা আমার ভারী খারাপ লাগে। তার ওপরে আবার এমনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বসছি......"

চাকর ডেকে চেয়ারের ব্যবস্থা করলেন মহামায়া। বসতে বসতে বললেন, "এই সামান্য ব্যাপারটা তোমার খারাপ লাগে! তার কারণ, তুমি যে আসল জায়গায় ভুল করে বসে আছ।"

অভিজিৎ বুঝতে না পেরে চোখ তুলতেই যোগ করলেন, "এতে যে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না সেই সহজ কথাটা জান না।"

একটু থেমে অনেকটা স্বগতোক্তির মত বললেন, "তোমার দোষ নেই। জানবার সুযোগ তো আমরা দিই নি।"

মহামায়ার কণ্ঠে একটি উদাস সুর লাগল। মুখখানা ম্লান হয়ে উঠল। কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে হাওয়া করে চললেন। অভিও নীরবে খেতে লাগল। বৌরাণীর শেষ কথাটার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল, সেটা তার কাছে অস্পষ্ট রইল না।

কয়েক মিনিট কেটে যাবার পর অভিই প্রথম কথা বলল। বোধহয় আবহাওয়াটা একটু হাল্কা করে দিতে চাইল—"তোমাকে দেখে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে বৌরাণী।"

"কী গল্প, শুনি?" হাসিমুখে হাল্কা সুরে বললেন মহামায়া।

"এখন থাক। গল্প বলতে গেলে আজ আর তোমার খাওয়া হবে না।"

"না, না; তুমি বল।"

"বিদ্যাসাগর মশায়ের বন্ধু ছিলেন হ্যারিসন সাহেব। শুধু বন্ধু নন, ভক্ত

বলতে পার। মেদিনীপুরে যখন কালেক্টর হয়ে গেলেন, সাহেবের কি খেয়াল হল, বিদ্যাসাগরের মাকে একবার দেখবেন। এরকম ছেলে যাঁর, না জানি তিনি কি আশ্চর্য মানুষ। ব্যাপারটা বোঝ একবার। সেকেলে বামুন পণ্ডিতের বাড়ির গৃহিণী সাহেবের সামনে বেরোবে কী! একে ম্লেচ্ছ, তায় বিদেশী। তার ওপরে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট! সাহেবকে কি করে ঠেকানো যায় তাই নিয়ে যখন জল্পনা-কল্পনা চলেছে, ভগবতী দেবী বলে বসলেন, না, ওকে আসতে বল। হলই বা অতবড় সাহেব। আমার ঈশ্বরের বন্ধু তো। নিজে থেকে আসতে চাইছে। 'না' বললে ঈশ্বরের মান থাকে না।

ব্যস্, আর কথা কী? হ্যারিসন এলেন বীরসিংহের বাড়িতে। কোনোদিন যিনি গ্রামের বাইরে পা দেননি, ছেলের শত অনুরোধেও না, এমন একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ মহিলা, রীতিমত পর্দানশিন বলা চলে, অতি স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে। যেন কোনো নিকট আত্মীয়কে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন বাড়ির গিন্নী। ছেলের মুখেই শুনেছিলেন সাহেবরা চেয়ারে বসে। সে ব্যবস্থা আগেই ছিল। তাতে বসিয়ে নিজেও একখানা চেয়ার দখল করে খাস মেদিনীপুরী ভাষায় গল্প জুড়ে দিলেন এক খাস বিলেতী সিভিলিয়ানের সঙ্গে। একথা ওকথার পর বলে বসলেন, তোমাকে খেয়ে যেতে হবে। আমি নিজে হাতে তোমার জন্য রান্না করেছি।

সাহেব শুধু থ' হয়ে চেয়ে রইল।

ঐ চেয়ারের সামনেই পাতা হল টেবিল। কী, কী, খেতে দিয়েছিলেন সাহেবকে, বিদ্যাসাগরের কোনো জীবনীতে তার উল্লেখ নেই। নিশ্চয়ই বিলিতীখানা নয়, ডালভাত, সুক্তো, ঘণ্ট, মাছের ঝোল। কিংবা মেদিনীপুরের মেয়ে, ঝোলের বদলে হয়তো টক রেঁধেছিলেন রুই মাছের। আর পোস্ত-চচ্চড়ি অবশ্যই ছিল। একটা কথা বলতে ভোলেননি জীবনীকার। ঐ চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিয়ে পাখা হাতে হাওয়া করতে করতে এটা খাও, ওটা খাও করে খাইয়েছিলেন ছেলের বন্ধুকে।

যে সব গল্প করেছিলেন, হ্যারিসন তাঁর সামান্য বাংলা-বিদ্যা নিয়ে তার কতটা বুঝতে পেরেছিলেন বলা শক্ত, কিন্তু একটা জিনিস নিঃসন্দেহে বুঝেছিলেন, এরকম মা না হলে তাঁর কোলে অতবড় ছেলে জন্মায় না।

মহামায়া তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। তাঁর হাতের পাখা কখন বন্ধ হয়ে

গেছে টের পাননি। হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠলেন। কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

হয়তো জানবার ইচ্ছা ছিল, (অভিজিৎ যা বলে শুরু করেছে) তাঁকে দেখে আজ হঠাৎ এই চমৎকার কাহিনীটি তার মনে হল কেন। স্বভাবতই সঙ্কোচ হল মহামায়ার। তাঁর দেওরটি যে গভীর প্রকৃতির মানুষ, এই কদিনেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আজকের এই তুচ্ছ ব্যাপারটার মধ্যে সে কী আবিষ্কার করে বসেছে, সেই জানে। গল্পের যে ঘটনা, তার সঙ্গে এর একটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সেটা নিতান্তই বাইরের সাদৃশ্য। অভি যদি তাকে আরো গভীরে টেনে নিয়ে ভগবতী দেবীর সঙ্গে তাঁর কোনো জায়গায় মিল দেখাবার চেষ্টা করে, মহামায়াকে রীতিমত লজ্জায় পড়তে হবে। তাই ও প্রসঙ্গে না গিয়ে অন্য কথা পাড়লেন, গল্পে গল্পে তোমার কিন্তু খাওয়া হল না ঠাকুরপো।

কথাটা বোধহয় অভিজিতের কানে গেল না। গেলেও জবাব না দিয়ে নিজের চিন্তার সূত্র ধরে বলল, সংস্কার জিনিসটা কাটিয়ে ওঠা যে কত কঠিন, আমি জানি, বিশেষ করে তাদের পক্ষে, সেই সংস্কারের মধ্যে যারা সারা জীবন জড়িয়ে আছে। সে যাক। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে বৌরাণী। এখন নয়, সন্ধ্যাবেলা। তোমার সময় হবে তো?

"আমার কাজটা কী যে সময় হবে না?··· ভাত কটা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একটু বসো; আমি দুটো গরম ভাত আনতে বলছি।"

ঠাকুরকে ডাকতে যাচ্ছিলেন। অভিজিৎ বাধা দিল, "না, না; এগুলোই বেশ গরম আছে। আর আনতে হবে না।"

বলতে বলতে বাকী খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জন্যে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল।

॥ ৫ ॥

তাঁর সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলতে চায় অভিজিৎ বৌরাণী কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যদিয়ে তার মনের যে বিশেষ রূপটি উদ্ঘাটিত হল, সেটা একেবারে অভাবিত।

ঐ উদ্বাস্তু লোকগুলোকে নিয়ে অভিজিতের মনে যে একটি গভীর উৎকণ্ঠা এসে বাসা বেঁধেছে, এসে অবধি প্রায় সর্বক্ষণ ওদের কথাই ভাবছে, তা তিনি জানতেন। উৎকণ্ঠা তাঁদেরও কম ছিলনা, কিন্তু সেটা অন্য ধরণের। এই যে এতগুলো লোক বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসল, তাঁদের বসত-বাড়ির সংলগ্ন—সংলগ্ন কেন অন্তর্ভুক্ত—এতখানি জমি প্রকাশ্যে নির্বিবাদে জোর করে দখল করে নিল, এইটাই ছিল তাঁদের ভাবনার বিষয়। সদর নায়েব প্রথমটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, পরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। জমিদারি চলে গেছে সরকারের হাতে। লাঠি সড়কি পাইক বরকন্দাজও সেই সঙ্গে বিদায় নিয়েছে। তিনি শুধু রয়ে গেছেন, কিন্তু ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সরদার। সরকারী আফিসে ঘোরাঘুরি করলেন কয়েকদিন। থানায় গেলেন, দেখা করলেন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে। কী করে এই জমিটা উদ্ধার করা যায়। কারো কাছ থেকেই বিশেষ কোনো ভরসা পেলেন না। উদ্বাস্তু ঘাঁটাতে কেউ রাজী নয়। তারপর বৌরাণীকে দিয়ে চিঠি লেখালেন খোদ মালিকের কাছে। দীর্ঘকাল দেশছাড়া হলেও সেই তো সব সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। সে আসুক।

সে যখন এল, দেখল, তার মনেও প্রথম উৎকণ্ঠা জাগল ঐ উদ্বাস্তুদের নিয়ে। কিন্তু সেটা একেবারে অন্য জাতের। বৌরাণী বুঝতে পারলেন। পেরে চুপ করে রইলেন। সদর নায়েবও বুঝলেন, কিন্তু চুপ করে রইলেন না, দাখিল করলেন ইস্তফা পত্র। পরিষ্কার করে জানালেন, মালিকের সঙ্গে মূল নীতি নিয়েই যখন মতান্তর, তখন আর তাঁর থাকা চলেনা।

অতদিনের অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত এবং শুভানুধ্যায়ী প্রধান কর্মচারীকে বিদায়

দেবার ইচ্ছা ছিল না অভিজিতের। প্রথমটা বড় অসহায় বোধ করল। তারপর ভাবল, শুধু তার নিজের দিকটা দেখলেই তো চলবে না, নায়েবের দিকটাও দেখতে হবে। সেটা যখন উপলব্ধি করল, বুঝতে পারল ওঁকে আর আটকে রাখা ঠিক নয়। তার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক দুর্গামোহনও সেই কথা বললেন। বৌরাণী কিছু বললেন না। বিচার বিবেচনার সব ভার তার উপরেই ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু তাঁর মনের কথাটা অনুক্ত হলেও অভিজিতের কাছে অস্পষ্ট রইল না। এই নায়েবই ছিল বাঁড়ুজ্যে বাড়ির শেষ স্তম্ভ। এর সমস্ত কাঠামোটাই দাঁড়িয়েছিল তার কাঁধের উপর। সে কাঁধটা সরে গেলে আর রইল কী? তবু বৌরাণী নীরব রইলেন। তারপর বোধহয় এই কথা দিয়ে বোঝালেন নিজেকে, ঐ নায়েবের মত তিনিও সেই প্রাচীন যুগের স্মৃতিচিহ্ন; কিন্তু তফাৎও আছে। নায়েব চলে যেতে পারে, তিনি পারেননা। তিনি যে এই বাড়ির হাড় পাঁজরার সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। সেখান থেকে বেরোবেন কেমন করে?

আরো ভাবলেন, তিনি তো এ বাড়ির বধূমাত্র। কর্তাদের মন যুগিয়ে চলা, তাঁদের তালে তাল রাখাই তাঁর কাজ। সেই এতটুকু বয়সে এখানে এসে যখন ঢুকেছিলেন, তখন থেকে এই কথাটাই শিখেছেন, এবং সে শিক্ষার পরীক্ষাও দিয়ে এসেছেন। ফেল করেননি কোনদিন। মাঝখানে যখন একা পড়ে গেলেন, মাথার উপরে কেউ রইলনা, তখনো সেই পুরনো তালে তাল দিয়ে গেছেন। সদর নায়েব যখনই তাঁর কাছে আদেশ, নির্দেশ চাইতে এসেছেন, প্রতিবার একটি মাত্র কথাই তিনি উচ্চারণ করেছেন—আমি আর কী বলবো, নায়েব মশাই? কত্তাদের আমল থেকে যা করে এসেছেন তাই করুন।

এমনি করেই চলে গেছে দীর্ঘদিন।

অভিজিৎ এসে যখন দাঁড়াল, তার দিকে তাকিয়ে, তার সঙ্গে দুটো একটা কথা বলে তার হাবভাব ধরণ ধারণ দু একবার লক্ষ করেই মনে হল মহামায়ার, কত্তাদের আমল বুঝি এবার শেষ হয়ে গেল। যতদিন যেতে লাগল, ততই সে ধারণা দৃঢ় হল। বুঝলেন, তাল বদলাতে হবে। এই নতুন মালিকের চলার ছন্দ আলাদা। তাঁকেও তার সঙ্গে ছন্দ মেলাতে হবে।

সেই পথ ধরলেন বৌরাণী। খুব যে অসুবিধা হল তা নয়। বিধাতা পুরুষ এ দিক দিয়ে তাঁদের পরম সহায়। নতুনের সঙ্গে, অনভ্যস্ত এবং অপরিচিতের সঙ্গে মানিয়ে নেবার একটি আশ্চর্য শক্তি তিনি তাঁর এই নারী নামক সৃষ্টিকে বিশেষ ভাবে দান করেছেন। তারা সব পারে। অল্পায়াসে সব অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। নিজের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, খেয়াল খুশি, অভ্যাস আদর্শ সব কিছু কেটে ছেঁটে নতুন ফ্রেমে ঢুকে পড়ে। পুরুষ তা অত সহজে পারে না, এখানে বাধে ওখানে বেঁধে, নিজেকে ঠিক মত ঠিক খোপটিতে বসাতে গিয়ে নানা জায়গায় টান পড়ে, উঠতে বসতে খটখট চলতে থাকে।

আরেকটা জিনিস অনুকূল ছিল মহামায়ার। অভিজিতের সঙ্গে তাঁর প্রথম বধূজীবনের সম্পর্ক। সেদিনের সেই কিশোরী মেয়েটি যখন একটা সামান্য স্বল্পবিত্ত গহস্থের ঘর থেকে কেবলমাত্র রূপের জোরে এতবড় বাঁড়ুয্যে বাড়ির বড় বৌ হয়ে এল, এবং চারদিকে চেয়ে কোন কূল-কিনারা দেখতে পাচ্ছিল না, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করল ঐ ভীরু, লাজুক, মুখচোরা 'পুচকে' দেওরটিকে —বিশাল দরিয়ার মাঝখানে একটি স্নেহঘেরা ছোট্ট দ্বীপ। অভিরও সেদিন পিতৃপিতামহের বিরাট পুরীতে মা ছাড়া আর কোনো আশ্রয় ছিলনা। কিন্তু মাকে আর কতটুকু পাওয়া যায়? গোটা সংসারের দাবি তাঁর উপর। তাই মস্ত বড় একটা ফাঁক ছিল ওর জীবনে। সেই ফাঁক ভরে দিয়েছিল বৌরাণী।

তারপর দীর্ঘ অদর্শনের পালা। শুধু অদর্শন নয়, অলক্ষ্য যোগাযোগও ছিলনা। তবু দেখা গেল কৈশোরের সেই সখ্য-বন্ধনটি হারায়নি। চাপা ছিল মাত্র। দুজনে দুজনের কাছে এসে দাঁড়াতেই তার স্বর্ণসূত্রটি দেখা দিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মহামায়া তাঁর কাজকর্ম সেরে এসে যখন বসলেন, অভিজিৎ ঐ উদ্বাস্তুদের কথাই তুলল। এদের নিয়ে যে সমস্যা, তার নানা দিকটা দেখাবার চেষ্টা করল। এই লোকগুলোর উপর তার যতই সহানুভূতি থাক, তাদের এই 'জবর দখল' ব্যাপারটাকে সে সমর্থন করে না। কেবল মাত্র সংখ্যার জোরে এবং দুরবস্থার দোহাই দিয়ে অন্যের জায়গায় অনধিকার প্রবেশ সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। কোনো সমাজ ব্যবস্থাই তাকে মেনে নেবেনা। দেশের প্রচলিত আইনের চোখেও এটা গুরুতর অপরাধ। অপরাধটা হঠাৎ

চারদিকে একই সঙ্গে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে বলে গভর্মেণ্ট কিছুটা বিব্রত এবং কোন পথ ধরবে সে সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত। সমস্যাটা তো তাদেরই সৃষ্টি, তাদের ভুল নীতির বিষময় ফল। কিন্তু তাই বলে এই জুলুমের কাছে কোনো সরকারই নতি স্বীকার করতে পারেনা ; করলে রাষ্ট্রের ভিৎ নড়ে যাবে। সরকারী সাহায্য নিয়েই এদের উৎখাত করা যায়। কিছু সময় লাগবে, কিছু অর্থ যাবে এবং কিছু লোকের মাথা ফাটবে। সবটাই করা যেত, এই রকম পরিস্থিতির দেখা দিলে আগেকার দিনে কর্তারা যা করে গেছেন। কিন্তু একটা জিনিষ ভাববার আছে।

সেই কথাটা, অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা আগে দুর্গামোহন বাবুর বাড়ি থেকে ফিরবার পথে যা সে ভাবতে ভাবতে আসছিল, যে দৃশ্যগুলো তাকে পীড়া দিচ্ছিল সব এবার বৌরাণীর কাছে ব্যক্ত করল! শুধু সেইটুকুই নয়, তাকে আশ্রয় করে চলে গেল আরো পিছনে, যে জীবন এরা ছেড়ে এসেছে—ছেড়ে এসেছে বলা ঠিক হলনা ; মানুষবেশী একদল হিংস্র জানোয়ার যে জীবনের দৃঢ় মূল থেকে এদের টেনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—সেই দিনগুলোয়।

"জানো বৌরাণী, কদিন আগেও এই লোকগুলো ছিল নিরীহ শান্তিপ্রিয় স্বাভাবিক মানুষ। চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি করে খেত ; ছেলেমেয়েরা কত কষ্ট করে জল কাদা ভেঙে পড়তে যেত দূরের স্কুলে, ফিরে এসে পড়াশুনোর ফাঁকে বাপমাকে সাহায্য করত সংসারের নানা কাজে। যেমন বাধ্য, তেমনি শান্ত, তেমনি আদর্শবান। বৌঝিরা নিরাপদে স্নান করতে, গা ধুতে যেত অন্য পাড়ার পুকুরে, ঘড়া কাঁখে জল আনত দূরের কোন টিউবওয়েল থেকে। পুরুষেরা সারা দিনের কাজকর্মের পর খোল করতাল নিয়ে গানের আসর বসাত কোনো প্রতিবেশীর বারান্দায়। ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, মামলা মোকর্দমা এগ্রামে ওগ্রামে রেষারেষি দলাদলি যে ছিলনা তা নয়। দুটো চারটে বরং লেগে থাকত সারাবছর। এখানে ওখানে কিছু কিছু সমাজ-বিরোধী মনোভাবও নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তাতে করে এদের বাঁধা পথে চলা সমাজজীবনের কোনো হানি হয়নি। শৃঙ্খলার অভাব ঘটেনি। সমাজবন্ধন বলতে যা বোঝায় সেটা অটুট ছিল।

সেই লোকগুলোর আজকের এই ভেতর-বাইরের পরিবর্তনটা একবার যদি দেখতে ? মানুষের এমন লক্ষ্মীছাড়া রূপ আমি আর কোথাও দেখিনি।"

বলতে বলতে সেই বিবর্তিত রূপটাই যেন মনে মনে আরেকবার দেখে নিল অভিজিৎ। বৌরাণী লক্ষ করলেন, তার মুখের উপর একটি ম্লান করুণ ছায়া ফুটে উঠেছে। পরমুহূর্তেই আবার সে ফিরে গেল তার পুরনো প্রসঙ্গে।

"আমার ইচ্ছাটা কি জানো বৌরাণী? সেই জীবনে ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা। পুরোপুরি হয়তো পারা যাবেনা। তবু যতটা হয়।"

মহামায়া এদিকটা এমন করে কখনো ভেবে দেখেননি, যদিও এই বেয়াড়া লোকগুলোর উপর দেওরের যে একটি সস্নেহ এবং সংবেদনশীল দৃষ্টি আছে সেটা তার কথাবার্তা এবং কার্যকলাপ থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। গোড়ার দিকে খানিকটা বিরক্তও হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এদের আসলরূপটা ঠিক চিনে উঠতে পারেনি অভিজিৎ। বাইরের দুর্দশা দেখে অহেতুক প্রশ্রয় দিচ্ছে। আজ এই কথাগুলোর মধ্যে তার মনের তলদেশটাও যেন দেখতে পেলেন। মনে হল, এটা শুধু করুণা বা সহানুভূতি নয়, তার মূল আরো গভীরে।

অভি বলল, কাজটা যে বড় শক্ত তা আমি জানি। সবচেয়ে বড় কথা হল, কে এই ভার নেবে।

"কে আবার?" বিনা দ্বিধায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন মহামায়া, "ভার তোমাকেই নিতে হবে। করবার লোকের অভাব হবে না।"

অভিজিতের মনে পড়ল, দুর্গামোহনও তার প্রস্তাব শোনামাত্র এই কথাই বলেছিলেন। সকলেই তাই বলবে। একটুখানি নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলল, না, আমার দ্বারা হবে না।

"কেন, আবার বুঝি পালাতে চাও? সেটি হচ্ছেনা। দাঁড়াও না, পায়ে শেকল পরাবার ব্যবস্থা করছি।"

বলে, মুখটিপে হাসলেন বৌরাণী। তারপরেই লক্ষ করলেন, তাঁর স্নেহ-মধুর পরিহাসটি দেওরের কাছ থেকে কোনো সাড়া পেলনা। যেন শুনতেই পেলনা। যেমন বিরস মুখে বলেছিল, আমার দ্বারা হবেনা, তেমনি ভাবেই বলল, এই যেমন ধর নায়েব কাকা। ওঁর মত কর্মঠ লোক কজন আছে? কিন্তু এই ব্যাপারটা ওঁর দ্বারা চলবেনা। আর চলবে না বলেই উনি নিজে থেকে সরে দাঁড়ালেন, আমিও দেখলাম ওঁকে ধরে রেখে লাভ নেই।

—"ওঁর কথা আলাদা। সারাজীবন যে সব জিনিস যে ভাবে দেখে এসেছেন, এই বয়সে সেগুলো অন্য চোখে দেখবেন তা আশা করা যায়না। তার চেয়েও বড় বাধা—এই লোকগুলো ওঁকে অনেক জ্বালিয়েছে, অযথা অনেক অপমান করেছে, সে সব ভুলে গিয়ে—"

—"জানি বৌরাণী, ওঁর দিকটা আমি খুব বুঝতে পারি। ওঁকে কোনো দোষ দিচ্ছিনা। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, আমারও একটা বাধা আছে, সেটা ওর চেয়ে অনেক বড়।

বৌরাণী স্বভাবতই সেটা অনুমান করতে না পেরে অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন। অভিজিৎ বলল, কথাটা তোমায় ঠিক বোঝাতে পারবো কিনা জানিনা। হয়তো হেঁয়ালির মত শোনাবে। তবু বলছি, এ আমার তত্ত্বকথা নয়। এটা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করি।....যে কাজের বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, আমি বেশ বুঝতে পারি, আমি তার অযোগ্য। যাকে কর্মক্ষমতা বলে, সে দিক দিয়ে নয়, মনের দিক দিয়ে। অর্থাৎ এই লোকগুলোর ওপর যতই আমার দরদ থাক, সহানুভূতি থাক, এদের মধ্যে নেমে গিয়ে, সমান স্তরে দাঁড়িয়ে এদের সুখ দুঃখ, চিন্তা ভাবনার সঙ্গে নিজেকে কখনো মিশিয়ে দিতে পারবো না। মাঝখানে এসে দাঁড়াবে এই বাঁড়ুয্যে বাড়ি, এর সঙ্গে আষ্টে পৃষ্টে জড়ানো একটা, কী বলবো—বিশেষ মানসতা, মনের একটা বিশেষ গড়ন। তুমি যদি ইংরেজি জানতে, আরো সহজ করে বলতাম, ফ্রেম অব মাইণ্ড্। তার থেকে অনেক দিন দূরে থাকলেও রক্তের মধ্যে তাকে আমি বয়ে নিয়ে চলেছি। আমার বাবার সেই দৃষ্টি, যা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার এই দুটো চোখের মধ্যেও রয়ে গেছে। তাকে এড়াবো কেমন করে? লোকে বলে আমার গলার স্বরটাও নাকি তাঁর মত। তার ওপর তো আমার কোনো হাত নেই। তুমি বলবে, আমার মনটা তো তাঁর মত নয়। হতে পারে। কিন্তু অমিল যদি থাকে, সেটা হচ্ছে মনের যেখানে বিকাশ, সেইখানে। তার কাঠামোটা তো এক। সেটা যে আমার জন্মগত উত্তরাধিকার। সম্পত্তির স্বত্ব নয়, যা ইচ্ছা করলেই ত্যাগ করা যায়। এ উত্তরাধিকার আমার রক্ত মাংসের, মেদ মজ্জার, এবং এখানে যেটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আমার অন্তরাত্মার।

তার বক্তব্যটা যতখানি সম্ভব সরল করবার চেষ্টা করে অভিজিৎ এতক্ষণে

থামবার অবকাশ পেল। বৌরাণী একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অভি যে বাধার কথা বলছিল, সে যে এইখানে, কল্পনাও করতে পারেননি। তার মনের অনেক কথাই তিনি জানতেন। কিন্তু এই দিকটা তাঁর সম্পূর্ণ অগোচরে পড়ে ছিল। তার কথাগুলো যে তিনি মেনে নিলেন তা নয়, কিন্তু প্রতিবাদ করতেও পারলেননা। অনেক দূর পিছনে চলে গেলেন। কত দিনের কত কথা মনের মধ্যে ভিড় করে এল। এই বাঁড়ুয্যে বাড়ির চিন্তা-ধারা, অভি যার নাম দিয়েছে একটি বিশেষ মানসতা, তার সঙ্গে শুরু থেকেই তো তার বিরোধ, সে বিরোধিতার দণ্ডও সে দিয়েছে ; দীর্ঘ দিন ধরে দিয়েছে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে গেছে এখান থেকে। তবু সেইটাই আজ এত বড় হয়ে দেখা দিল !

অভিজিৎ বলল, "কোথায় বাধবে জানো ? এই যে তোমাদের শম্ভু-চরণ আর তার চেলারা। কলোনী নিয়ে কিছু করতে গেলেই ওরা এসে দাঁড়াবে সকলের আগে। ওদের একটা ভাষা আছে, ব্যাকরণ আছে। আসলে ওদের নয়, এপারে এসে রাজনীতিওয়ালাদের কাছে শুনে শুনে রপ্ত করেছে। সেটা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। 'এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার' কি 'এগুলো পেলে ভালো হ'ত—এই সোজা কথাটা না বলে, ওরা বলবে—'এই রইল আমাদের ষোল দফা দাবি'। বলবার ধরনটাও একটু বেয়াড়া। অনেক সময় বিনা প্রয়োজনে রূঢ়।

"আমরা যেখানে বলবো, 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল' ! ওদের ভাষা হল—'আপনার সামনে এই প্রস্তাব রাখলাম।' এমন সুরে রাখবে যে শোনা মাত্র আমার নায়েব কাকার কপাল কুঁচকে উঠবে, আমার বাবা কিংবা দাদার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠত। আমার হয়তো তার কোনোটাই হবেনা। শান্তভাবে মোলায়েম মুখে শুনে যাবো, উত্তরে যা বলবো তার মধ্যেও কোনো উত্তাপ থাকবে না। কিন্তু ওদের কথাবার্তার ধারা, ওদের দুর্বিনয়, ওদের অসঙ্গত দাবির বহর কোনো সময়েই আমার ভিতরে যে রক্তধারা বইছে তাকে একটুও তাতিয়ে তুলবেনা একথা কেমন করে বলি ? তার মধ্যে তো শূরজিৎ বাঁড়ুয্যের গরম রক্ত মিশে রয়েছে। কাজেই নিজের ওপরে আমি পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছিনা। আমার বিশ্বাস, কোনো কাজে নামতে গেলে সকলের আগে যেটা ত্যাগ করা দরকার তার নাম

উত্তেজনা, এবং সেই সঙ্গে যেটা গ্রহণ করা দরকার তার নাম নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত মন।

"যে সম্পত্তি ওরা জোর করে দখল করে বসেছে, সেটা আমার, তার উপরে আমার আসক্তি আছে। এ বোধ কখনো না কখনো আমার মধ্যে জেগে উঠবে। এবং যখনই উঠবে, আমার এই হাত দুটো পুরো জোর পাবেনা। আমি ওদের কল্যাণ চাই বৌরাণী। কিন্তু চাওয়া এক জিনিস আর তাকে কাজের মধ্যে রূপ দেওয়া অন্য জিনিস।

"একাজের ভার আমার নেওয়া চলবেনা। আমি অবশ্যই থাকবো, কিন্তু পেছনে।"

—"তাহলে এগিয়ে আসবে কে ? প্রশ্ন করলেন মহামায়া।

—"এমন কেউ, যে ঐ লোকগুলোর নাড়ি নক্ষত্র জানে, যে ঝড় ওদের উড়িয়ে এনে ফেলেছে, তার ঝাপটা খানিকটা অন্ততঃ নিজেও সয়েছে, যে ওলট পালট ঘটে গেল ওদের জীবনে, সেটা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারবে।"

—"কোথায় পাবে তেমন লোক ?"

—"যোগাড় করতে হবে। খুঁজে বের করবার একটা রাস্তা মনে মনে আমি ঠিক করেও রেখেছি। তোমাকে বলবো, তার আগে মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার। কটা বাজল ?"

—"অনেক কটা। এখন আর বেরোতে হবেনা। কাল যেও।"

রাত বেশী না হলেও বৌরাণীর কথা মেনে নিল অভিজিৎ। ওবেলা তাঁর উপরে অনেকখানি উৎপীড়ন করে ফেলেছে। তার মাত্রাটা আর বাড়াতে চাইলনা।

মহামায়া রান্না মহলের দিকে যাচ্ছিলেন। অভিজিৎ পিছন থেকে বলল, ওঃ, আর একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। নায়েব কাকার জন্যে একটা পেন্সনের ব্যবস্থা করলে কেমন হয় ?

—"পেন্সন ?"

—হ্যাঁ, মানে, এষ্টেট্ থেকে একটা মাসিক বরাদ্দ! এটা অবিশ্যি এখানে কখনো ছিলনা। তবু ওঁর ব্যাপারটা আলাদা।

মহামায়ার মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, খুব ভালো

হয় ; ওঁর দরকারও খুব। একটা ছেলে নেই যে দেখবে। সব মেয়ে। সামান্য কয়েক বিঘে জমি মাত্তর সম্বল।

—উনি আবার আপত্তি করবেন না তো ? তুমি বরং বুঝিয়ে বলো। এটা কারো দয়ার দান নয়। এটা ওঁর প্রাপ্য। উনি যা দিয়েছেন, সারাজীবন ধরে, তার সামান্য স্বীকৃতি।

"নিশ্চয়ই বলবো"—সাগ্রহে বললেন মহামায়া।

॥ ৬ ॥

কাশীতে যে ওস্তাদের কাছে অভিজিৎ গান শিখত তিনি বলেছিলেন, যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন তাঁরা যেমন আহ্নিক করেন, রোজ সকালে কিংবা সন্ধ্যায় একবার অন্ততঃ গিয়ে বসেন ঠাকুর ঘরে, বারান্দার কোণে অথবা কোন নিরালা জায়গায়, ইষ্ট দেবতার নাম জপ করেন, এও তোমার সেই আহ্নিক, নিত্যকর্ম। যত কাজই থাক, তানপুরাটি নিয়ে একবার বসবে। তাতে যে শুধু গলা খুলবে, তা নয়, কিছুক্ষণের জন্যে তোমার মন হাজার রকম বিক্ষেপ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে একটি বিশেষ কেন্দ্রে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াবে। সেই জন্যেই সঙ্গীতকে বলা হয়েছে সাধনা। এও এক ধরণের ব্যায়াম, তোমরা যাকে বল exercise, শুধু গলার নয়, তার চেয়ে বেশী মনের।

ওখানে যতদিন ছিল এ নির্দেশ সে নিয়মিত মেনে এসেছে। এখানে আসবার পর আর হয়ে উঠছে না। ওস্তাদজী যাকে চিত্ত-বিক্ষেপ বলেছিলেন, সেটা এখানে বরং অনেকখানি বেড়ে গেছে। অথচ তার থেকে মুক্তির যে পথ তিনি বাৎলে দিয়েছিলেন, তার অনুসরণ করতে পারছে না।

অভির আসার পরেই প্রথম যেদিন ভোরবেলা তার ঘর থেকে তানপুরার সঙ্গে আলাপের সুর ভেসে এল, বৌরাণী মনে মনে খুশী হয়েছিলেন। গান বাজনা তো এ বাড়ির প্রাচীন ঐতিহ্য। মাঝখানে অনেকগুলো বছর সে ধারাটি একেবরে শুকিয়ে গিয়েছিল। সেখানে আবার একটি মৃদু স্রোত দেখা দিল। একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, চেষ্টা করতে হবে যাতে এর ক্রমশঃ বিস্তার ঘটে। মনে মনে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি নায়েব মশাইকে দিয়ে হল ঘরে জলসার আয়েজন করেছিলেন, ডেকে এনেছিলেন সেই পুরনো ওস্তাদজীকে, বাঁড়ুয্যে বাড়ির সঙ্গে যার একদিন নিবিড় সম্পর্ক ছিল, বহুদিন বহু আনন্দ দিয়ে গেছেন সবাইকে। সে সব দিনের সে সমারোহ এবং ঔজ্জ্বল্য ফিরে না আসুক (কেমন করে আর আসবে ?) সেই পরিবেশটি যেন ফুটে ওঠে, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

তারপর যা ঘটল, শেষ পর্যন্ত তাঁর অত সাধের আসর যেখানে গিয়ে দাঁড়াল, সেটা শুধু একটা হতাশাময় স্মৃতি হয়ে আছে।

সেই থেকে গান বাজনা সম্পর্কে আর কোন উৎসাহ দেখান নি মহামায়া। অন্য কী একটা কথা প্রসঙ্গে অভিজিৎ একদিন বলেছিল, গান বাজনার একটা লৌকিক দিক আছে, যাকে অবহেলা করা যায় না। এটা শুধু জনকতক রসজ্ঞ শ্রোতার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকবে, সেটা সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। সাধারণ মানুষকেও তার ভাগ দিতে হবে।

মহামায়া প্রতিবাদ করেছিলেন, সাধারণ মানুষের জন্যে সাধারণ জিনিস আছে। এসব উঁচু দরের রাগ-রাগিণী তারা কী বুঝবে? এসব জিনিস তাদের ডেকে এনে শোনানো মানে উলু বনে মুক্ত ছড়ানো।

কথাটার মধ্যে কিঞ্চিৎ উষ্মা ছিল, এবং সেইটাই প্রত্যাশিত। বৌরাণী যে বাড়ির বৌ, সেই কিশোর বয়স থেকে যে ভাবধারার মধ্য দিয়ে এসেছেন, তারই সুর এটা, শুধু ওঁর নিজের নয়। অভিজিৎ আর তর্ক করেনি।

তাছাড়া, পরে ভেবে দেখেছিল, কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। সব জিনিস সকলের জন্য নয়, এতো মানতেই হবে। কিন্তু তাই বলে একটা বিশাল মানব গোষ্ঠী চিরকাল একটি মহৎ বস্তুর স্বাদ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে, এই বা কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত' নিম্নাঙ্গে নেমে আসুক, এটা কেউ চায় না, কিন্তু এমন কিছু কি করা যায় না যাতে করে 'নিম্ন স্তরের' শ্রোতারাও তার কিছুটা রস উপভোগ করতে পারে? তা যদি না যায়, আস্তে আস্তে সে লুপ্ত হয়ে যাবে। সামান্য কজন লোক কাঁধ দিয়ে তাকে অতটা উঁচুতে ধরে রাখতে পারবে না, যদি আরো কাঁধ এসে না লাগে তার সঙ্গে।

দিন কালও বদলে গেছে। এটা হল কাঁধে কাঁধ মেলাবার যুগ।

যাই হোক, এ নিয়ে বৌরাণীর সঙ্গে আর কথা হয়নি।

তাঁর উক্তি থেকে একেবারে ভিন্ন ধরণের একটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছিল সেদিন। অভিজিৎ তখন ছোট। কী একটা বড় উৎসব চলছিল বাড়িতে। মায়ের ব্রত প্রতিষ্ঠা, কিংবা ঐ রকম কিছু। অনেক লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। নানা জাতের লোক। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ তো ছিলই, তার

সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর যে দলটি ছিল, সেও ছোট নয়। জমিদার বাড়ির সব কাজে কর্মে তাদের বরাবর ডাক পড়ত। সেবারেও পড়েছিল। বিশাল আয়োজন। অভি তার ছেলে-বয়সের ঔৎসুক্য নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখছিল। হঠাৎ তার নজর পড়ল দই-ওয়ালাদের দিকে। সে একটা দৃশ্য। বাঁক কাঁধে নিয়ে লাইন করে অনেক লোক আসছে, দুধারে ঝুলছে থরে থরে সাজানো দইয়ের ভাঁড়। একই সঙ্গে দুলছে হাঁড়িগুলো। লোকগুলোও যেন সেই তালে নেচে নেচে চলেছে।

সেরেস্তার একজন আমলা ছিল দই মিষ্টির ভাঁড়ারের সামনে। আর ছিল রাজেন ঘোষ—বাঁড়ুয্যে বাড়ির বাঁধা গয়লা। সব ব্যাপারেই দই যোগানের ভার তার উপর। সে-ই বেছে বেছে হাঁড়িগুলোকে দু-দলে ভাগ করে রাখছিল। তদারক করছিল ঐ আমলটি।

অভি জিজ্ঞাসা করল, দুভাগে রাখছে কেন হাঁড়িগুলো?

"দুরকম দই কিনা, তাই"—উত্তর দিল আমলাটি।

"দুরকম কেন?"

"ইতর-ভদ্র সবাইকে কি আর এক রকম জিনিস দেওয়া যায় ছোটবাবু? এদিকের এগুলো হচ্ছে খুব ভালো দই। এটা দেওয়া হবে ব্রাহ্মণদের আর অন্যসব ভদ্দর লোক যাঁরা আসবেন, তাঁদের। আর ওটা রইল বাজে লোকদের জন্যে।"

"ওগুলো বুঝি খারাপ?"

"খারাপ কেন হবে?" এবার উত্তর দিল রাজেন ঘোষ, "তবে এতটা সরেস নয়। চাষাভুষোরা খাবে তো।"

দইএর মত গানেরও শ্রেণী-ভেদ আছে। 'ইতর ভদ্র' সকলের জন্যে এক জিনিস নয়।

গল্পটা এই সূত্রে মহামায়াকে শোনাবে কিনা ভাবছিল অভিজিৎ। শোনালনা। সে এর ভিতরে যে রস পাচ্ছে, তিনি হয়তো তা পাবেননা। দুজনের দেখবার চোখ আলাদা। হয়তো মনে মনে আঘাত পাবেন।

অনেক দিন পরে কী মনে করে সেদিন ভোরে উঠে তানপুরা নিয়ে বসেছিল অভিজিৎ। মহামায়া তার আগেই উঠে পড়েন। ওদিন ওঠেননি।

ঘুম ভেঙে যাবার পরেও চুপ করে শুয়েছিলেন। আগের রাত্রে অভি যে সব কথা বলেছিল, তার থেকে তার মনের একটা নতুন দিক খুলে গিয়েছিল তাঁর সামনে। অনেকক্ষণ ধরে তার কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেছিলেন। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে ঘুম ভাঙতেই সেই ছিন্নসূত্রগুলো ফিরে এল।

উদ্বাস্তু লোকগুলোকে নিয়ে অভিজিতের চিন্তা ভাবনাগুলো এতদিন তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল না। তার বাবা বা দাদা বেঁচে থাকলে তাঁদেরও 'চিন্তা' হত। তার চেহারা আলাদা। তাঁরা ভাবতেন কী করে এদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, এ ভাবছে কী করে এদের এই বর্তমান জীবনের বহুরকমের গ্লানি থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। সেইটাই এখন ওর ধ্যান জ্ঞান। এ পর্যন্ত বৌরাণীর কাছে সরল। এটুকু তিনি সহজেই বুঝতে পারেন। তার পরের অংশ তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। অভিজিতের মন আছে, কর্তব্য-বুদ্ধি আছে, উৎসাহ আছে, এদের প্রতি দরদেরও অভাব নেই। তবু কাজের ভার নিয়ে নেমে পড়তে চাইছেনা। যে বাধার কথা বলছিল, সেইটাই তাঁর কাছে এখনো বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে।

কিছুটা আশঙ্কাও হচ্ছে সেই সঙ্গে। কে জানে আসলে হয়তো এটা ওর পালিয়ে যাবার একটা মনে মনে খাড়া করা যুক্তি। ঐ তানপুরা আর চাকরটি নিয়ে আবার গিয়ে বসবে কাশীর সেই নির্জন কোণটিতে, যেদিন খুশি পথে বেরিয়ে পড়বে, এতদিন যা করে এসেছে। যেতে পারছেনা। ঐ হতভাগাগুলো পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। আর কারো ঘাড়ে ওদের চাপিয়ে দিতে পারলেই ছুটি।

গোড়াতে এসে সেই কথাই তো বলেছিল—শুধু তোমার জন্যে এলাম বৌরাণী। তোমার হুকুম কি ঠেলতে পারি?

বৌরাণীর চিঠিতে কোনো উল্লেখ না থাকলেও অভিজিৎ জানে এবং এখানে আসবার পর বুঝতে পেরেছে ঐ কলোনী-ঘটিত সমস্যার জন্যেই তাকে তিনি আসতে লিখেছিলেন। তার একটা সমাধানের পথ বের করতে পারলেই আবার চলে যাবে।

আসলে কি শুধু ঐ কারণেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মহামায়া? আর সে-ও কি শুধু সেই কারণেই সাড়া দিয়েছিল?

গানের আওয়াজ কানে যেতেই চিন্তার তার ছিঁড়ে গেল। ধড় মড় করে উঠে বসলেন। অনেক দেরি হয়ে গেছে অন্য দিনের তুলনায়।

দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এর আগেও একথা তাঁর মনে হয়েছে, এখন আরো স্পষ্ট করে অনুভূত হল। বাবার সেই গম্ভীর এবং গভীর স্বর অনেকখানি পেয়েছে অভিজিৎ। ও নিজেও তা জানে, কালই বলছিল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন মহামায়া। মনে পড়ল, অনেক-অনেক বছর আগে শ্বশুরও ঐ ঘরটিতে বসেই এমনি আলাপ করতেন। রাগ-সঙ্গীতে ভালো দখল ছিল তাঁর, মাঝে মাঝে চর্চা করতেন। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর আর তাঁর কণ্ঠ শোনা যায় নি। গান কেন, কথাবার্তাও বড় একটা বলতেন না। খড়মের আওয়াজ শুনে তাঁদের বুঝতে হত, কখন কোথায় আসছেন কিংবা যাচ্ছেন।

সেই দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে কোন সূত্র ধরে কেমন করে যেন একটা দৃঢ় সংকল্প জেগে উঠল বৌরাণীর মনে—অভিজিৎ চলে যেতে চাইলেও যেতে দেওয়া হবে না, তাকে ধরে রাখতে হবে, এবং সেটা তাঁরই দায়িত্ব। যাকে যে ভার সে দিতে চাইছে, দিক। কিন্তু তাকেও থাকতে হবে।

খানিকটা বেলা হতেই অভিজিৎ এসে বলল, একটু ঘুরে আসি বৌরাণী। একবার মাস্টার মশাই-এর ওখানে যাবো।

মহামায়া জানতেন। কাল রাত্রেই যেতে চেয়েছিল, তিনি যেতে দেন নি। বললেন, বেশী দেরি ক'রো না।

দুর্গামোহনের সঙ্গে যে আলোচনা আগের দিন শুরু হয়েছিল, সেটা আরো খানিকটা এগিয়ে গেল। তার নিজের তরফে যে বাধা, যে অক্ষমতা অভিজিৎ মনে মনে অনুভব করছে, বৌরাণীর কাছে যেমন করে বলেছিল, তাই অন্য ভাষায় এবং একটু অন্য ভাবে মাস্টার মশাই-এর কাছেও ব্যক্ত করল। দুর্গামোহন কাল এটা অনুমান করতে পারেননি। আজ যখন শুনলেন, বিস্মিত হলেননা। অভিজিৎকে তিনি চেনেন। তার মনের বিশেষ গড়নটিও তাঁর জানা। অন্য কেউ হলে কি করত সে প্রশ্ন অবান্তর। অভির পক্ষে এইটাই স্বাভাবিক। এটা ওর সংস্কার। সংস্কারের কাছে যুক্তি চলেনা।

সুতরাং এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। ঐখানে অন্ততঃ ওকে মেনে নিয়ে তারপর অগ্রসর হতে হবে।

ভার যেই নিক, প্রথম কাজ একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা। কিন্তু যাদের জন্যে সেটা অভিপ্রেত, একেবারে কাঠামো তৈরি থেকেই তার মধ্যে তাদের হাত থাকবে। তা যদি না থাকে সে জিনিস যতই সুষ্ঠু, উদার ও কল্যাণকর হোক, তার পিছনে যতই শুভেচ্ছা থাক, তারা তাকে শুরু থেকেই সন্দেহের চোখে দেখবে, নানা দিক থেকে পদে পদে বাধা আসবে। তারপর একদিন দেখা যাবে সব বানচাল হয়ে গেছে; অর্থ ও শক্তির অপচয় ছাড়া আর কোনো ফল পাওয়া যায় নি।

দুর্গামোহনের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে অভিজিতের চেয়েও বেশী। তিনি একটির পর একটি সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে দেখেছেন। তার প্রধান কারণ, সবটাই উপর থেকে এদের মাথার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরা তার সঙ্গে হাত মেলায়নি, শুধু ছিদ্র বার করবার চেষ্টা করেছে এবং সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছে বড় বড় টাকার বাণ্ডিল।

"সরকার সে লোকসান কাটিয়ে উঠতে পারে", দুর্গামোহন কতগুলো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বোঝাচ্ছিলেন অভিজিৎকে, "কারণ, সরকারী অর্থ অর্থাৎ যাকে আমরা বলি গভর্ণমেণ্ট রিসোর্সেস, তার তো আর শেষ নেই, যেমন যাবে তোমার আমার পকেট কেটে আবার পূরণ হবে। কিন্তু তোমার রিসোর্স আর কতটুকু? কাজেই, তুমি যা বলছ, আমারও সেই মত। গোড়া থেকেই ওদের ঐ নেতাটিকে, কি নাম যেন?

অভিজিৎ মৃদু হেসে বলল, শম্ভুচরণ।

"হ্যাঁ, ঐ শম্ভুচরণকে চাই। ওকে বাদ দিয়ে কিছু করা চলবে না।"

"তার আগে এ তরফেও আর একটি শম্ভুচরণ দরকার।"

"সেইখানেই তো মুস্কিল", মাথা নেড়ে বললেন দুর্গামোহন, "তুমি যে রকম লোক চাইছ, ফস করে জোটানো যাবে বলে তো মনে হয় না।"

"আপনার জানাশুনো মহলটি তো ছোট নয়। তার মধ্যে যদি কেউ—"

"একজনের কথা ভাবছিলাম। ছেলেটি হৃদয়বান। ঐ অঞ্চলেই বাড়ি। ওদের সমস্যাগুলো বুঝবে, এবং সহানুভূতি দিয়ে দেখবে বলেই মনে হয়।"

"আমরাও ঠিক তাই চাইছি। আপনি ওকে আসতে লিখে দিন। কোথায় আছেন উনি ?"

"এখন কোলকাতাতেই আছে।"

"তাহলে তো দু'চার দিনের মধ্যেই এসে পড়তে পারেন।"

"তা পারে। কিন্তু আমি আরেকটা দিকে ভাবছিলাম, অভি। এইমাত্র তুমি বলছিলে, আমাদের তরফেও আর একটি শম্ভুচরণ দরকার। কথাটা কিন্তু খুব সত্যি, যদিও তুমি সে অর্থে বলনি আর শম্ভুচরণও হয়তো ঠিক সে ধরণের লোক নয়। ওদের দুর্দশার দিকটাই তোমার বেশী চোখে পড়েছে। তোমার পক্ষে তা-ই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যারা ঐ লোকগুলোকে অনেকদিন ধরে দেখছি, তারা জানি, ওদের মধ্যে বেশ কিছু লোক আছে, দুঃখ দুর্দশাটা যাদের কাছে শুধু একটা সুবিধাজনক অস্ত্র। তার আড়ালে বসে এমন দুষ্কর্ম নেই যা তারা করে না। বাইরে অতি ভালোমানুষ, যেন কিছু জানে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নীচ, ঠক ফেরেববাজ। কাজেই আমাদের লোককেও শুধু ভালো মানুষ হলে চলবে না, চালাক চতুর হতে হবে, যাতে করে ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে।

তাই বলছিলাম চাকরিই যখন দিচ্ছ তুমি, তখন উপযুক্ত লোক বেছে এবং বাজিয়ে নেবার যে সনাতন পথ রয়েছে, সেটা ধরতে দোষ কী ?"

—"আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি, স্যর। কিন্তু আমি চাইছিলাম যতটা সম্ভব নিঃশব্দে কাজ করা। তাছাড়া, এ এমন কিছু ব্যাপার নয়, যার জন্যে শুরু থেকেই ঢাক ঢোল পিটিয়ে—"

—সেটা আমিও চাইনা। ঢাক ঢোল না পিটিয়ে যতটুকু করা যায়, দেখতে হবে। আরো খানিকটা খোঁজ খবর নেওয়া যাক। তুমিও ছাখো। দরকার হলে কাগজেও দেওয়া যেতে পারে। কী বল ?

"আপনি ভেবে দেখুন" বলে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠবার উদ্যোগ করল অভিজিৎ—"আজ উঠি। বৌরাণী আবার সকাল সকাল ফিরতে বলে দিয়েছেন।"

দুর্গামোহন হাসিমুখে মাথা নাড়লেন, "আমাকে চেনেন তো। একে বেকার মাষ্টার তায় বুড়ো ; বকবক করতে পারলে আর কিছুই চায় না।

এহেন ব্যক্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। তাই আগে থেকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন।"

"তাঁর ধারণা কিন্তু উল্‌টো।"

"কী রকম?"

"আমিই এসে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাই, নানারকম অনিয়ম করতে বাধ্য করি।"

"তাই নাকি? তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো, তিরিশ বছর এক নাগাড়ে নিয়মের জোয়াল টেনে কাঁধ ছটোতে কড়া পড়ে গেছে। এক আধটু অনিয়ম আর সেখানে লাগে না। বরং ভালোই লাগে। কিন্তু—"

গলা খাটো করে ভিতরের দরজার দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে বললেন, যে গার্জেনের আণ্ডারে বাস করি, নিয়মের পান থেকে চূণ খসতে দিলে তো? ওঠা বসা চলা সব একেবারে ঘড়ি ধরে—

কথাটি চাপা গলায় বললেও যার উদ্দেশে বলা, সেখানে ঠিক পৌঁছে গেল। হয়তো ভিতরে ভিতরে সেই উদ্দেশ্যই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের উত্তর—কে বলছে তোমাকে ঘড়ি ধরে চলতে? যা ভালো লাগে করলেই পার।

পরক্ষণেই স্বরটি আরো কাছে সরে এল, এবং তার সুর একেবারে আলাদা—বাবা,

'কী মা।'

"অভিদাকে বলে দাও কাল ছপুরবেলা এখানে ছটো ডাল ভাত খাবেন।"

"কেন, কাল কী আছে?"

"কী আবার? এমনিই।"

"ও, কিন্তু বৌরানীকে আগে থেকে না জানিয়ে—"

"সে জন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না। সে আমি তাঁর সঙ্গে ঠিক করে নেবো।"

"ব্যস, তা হলেই হল। তুমি চান কর কখন অভি?"

"সকালেই সেরে ফেলি। কাশীর অভ্যাস।"

"তাহলে গোটা দশেকের মধ্যে চলে এসো।"

"ভিতর থেকে প্রতিবাদ উঠল, "অত সকালে কিন্তু আমার রান্না হবেনা।"

"বেশ তো, রান্না তুই যখন খুশি করনা। তার আগে আমাদের কি কোনো কাজ থাকতে পারে না ? কি বল অভি ?"

অভি শুধু একটু হাসল। আড়াল থেকেও কোনো জবাব এলনা। না এলেও তুজনের বুঝতে অসুবিধা হলনা যে সেখানেও একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। তার অর্থ অতি স্পষ্ট—'তোমাদের 'কাজ'টা যে কী আমার বিলক্ষণ জানা আছে।'

অভি উঠে দাঁড়িয়েছে। তখন বাইরে থেকে একটি অচেনা গলার ডাক শোনা গেল—মাষ্টারবাবু আছেন ?

"কে ?" সাড়া দিলেন তুর্গামোহন।

"আজ্ঞে আমার নাম শম্ভুচরণ সরকার। উদ্বাস্তু কলোনী থেকে আসছি।"

তুর্গামোহন উঠে এসে দোর গোড়ায় দাঁড়ালেন—"আসুন।"

"আপনার কাজের ক্ষতি করছিনা তো ?" নমস্কার করে সবিনয়ে, কিন্তু বেশ সপ্রতিভভাবে বলল শম্ভুচরণ।

"না, না, আমার আর কী কাজ এখন ?"

ভিতরে ঢুকে অভিজিতের দিকে নজর পড়তেই শম্ভু মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়াল। তারপর হাসিমুখে তাকেও একটা নমস্কার করল।

অভিজিৎ প্রতি নমস্কার করে বলল, ভালো আছেন ?

"আজ্ঞে হাঁ।"

ওপাশের দেয়ালের গায়ে খান তুই কাঠের চেয়ার ছিল। সেই দিকে ইঙ্গিত করে তুর্গামোহন বললেন, বসুন।

শম্ভু একটু ইতস্ততঃ করে বলল, আপনারা কথা বলছিলেন। আমি বরং অন্য এক সময়ে—

তুর্গামোহন বাধা দিলেন—"বসুননা। আমরা এমনি বসে গল্প করছিলাম।

অভিজিৎ যোগ করল, আমি এখনই যাচ্ছিলাম। বলে, বেরিয়ে গেল। তুর্গামোহন তাকে বাগানের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বসতে বসতে বললেন, তারপর শম্ভুবাবু, আপনাদের খবর-টবর ভালো ?

"বলছি। তার আগে একটা অনুরোধ আছে, মাষ্টার মশাই।"

"কী, বলুন।"

"ঐ 'বাবু'টা বাদ দিতে হবে। এখন আর ওটা আমাদের মানায় না।"

"কেন?"

"আমরা কী, কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, কীভাবে আছি, সবই তো জানেন। নিজের চোখেই দেখছেন।"

"তা অবিশ্যি দেখছি এবং আপনাদের অবস্থাও মোটামুটি জানি। কিন্তু সেইটাই যদি 'বাবু' না বলবার কারণ বলে মনে করেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।"

শম্ভুচরণ তর্কের সুরে বলল, 'বাবু' আমরা কাদের বলি? যারা ভদ্রলোক। আমাদের চেহারায়, পোষাক-আষাকে কাজকম্মে 'ভদ্র' বলে কিছু আছে কি?

"তার মানে আপনি বলতে চান, মানুষ যখন দুঃস্থ অবস্থায় পড়ে তখন আর তাকে 'ভদ্র' বলা চলে না। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমার কাছে ইতর ভদ্র বিচার করবার মাপকাঠি আলাদা। তার মধ্যে, আপনি যা-যা বললেন তার কোনোটাই পড়ে না। এটা একদম ভেতরের জিনিস। আমি তাকেই ভদ্রলোক বলবো যার মন ভদ্র, আচরণ ভদ্র। তার পরণে কী আছে, তাকে কী করে খেতে হয়, কী রকম দেখতে—সে সব প্রশ্ন অবান্তর।"

শম্ভুচরণের মুখে একটি শ্লেষের হাসি ফুটে উঠল। বলল, কিছু মনে করবেন না, স্যর। ও-সব আপনার বই-এর কথা। আসলে মানুষ বাইরেটা দেখেই ভদ্র-অভদ্র বিচার করে। এ দেশে আসবার পর সেটা আমরা আরো বেশী করে বুঝতে পাচ্ছি।

"কী থেকে বুঝছেন?"

"এখানকার লোকের কাছে যে ব্যবহার পাচ্ছি, তার থেকে।"

"তারা কি আপনাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে?"

"দুর্ব্যবহার যাকে বলে, তা হয়তো ঠিক করে না। অন্ততঃ গায়ে পড়ে নয়। কিন্তু এই উড়ে আসা আপদগুলোকে যে চোখে দেখে তার মধ্যে তো কোনো ঢাকাঢাকি নেই। সেটা একেবারে স্পষ্ট।"

দুর্গামোহন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ নীচের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, আপনার কথা আমি পুরোপুরি অস্বীকার করছি না শম্ভুবাবু। বর্ডারের ওপার থেকে হঠাৎ এতগুলো লোক এসে পড়ায় এখানকার লোকেরা যে খুশী হয়নি সেটা খুব সত্যি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে আপনারা যারা এসেছেন অর্থাৎ আসতে বাধ্য হয়েছেন তাদের দুঃখ কষ্ট এরা বুঝছে না, বা তাদের ওপরে এদের কোন সহানুভূতি নেই। এরা বিরূপ হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু সেটা ঠিক আপনাদের ওপরে নয়, যে কারণে, যাদের ভুল, ত্রুটি বা দুর্বুদ্ধির জন্যে এতবড় একটা ওলট পালট ঘটে গেল, তাদের ওপর। কিন্তু তাদের তো হাতের কাছে পাওয়া যায় না। তাই সব ঝাঁজটা পড়ছে গিয়ে আপনাদের গায়। তাকে ঘৃণা বা বিদ্বেষ বলা যায় না।”

কথাগুলো শম্ভুচরণের মনে কোনো রেখাপাত করল বলে মনে হল না। সোজাসুজি বলল, “এটা আপনার বা আপনার মত দু'চারজনের মনের কথা হতে পারে। কিন্তু দশজনের মনোভাব একেবারে আলাদা। তারা চাইছে এ পাপগুলো আজই বিদায় হোক। ক্ষমতা থাকলে বিদায় করে দিত। পারছে না বলেই আক্রোশ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।”

“এটা আপনার রাগের কথা, শম্ভুবাবু,” শান্ত, নিরুত্তাপ সুরে বললেন দুর্গামোহন। “যাকে বাস্তব দৃষ্টি বলে তাই দিয়ে যদি সব ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখেন, হয় তো আপনার ভুল বুঝতে পারবেন। ধরুন, আপনি একজন মোটামুটি অবস্থার লোক। দশজন পুষ্যি নিয়ে সংসার। যা আয় করেন কোনো রকমে চলে যায়। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন ছ-সাত জন আত্মীয় কুটুম্ব এসে উপস্থিত। আপনার ঘরে যা আছে, চাল ডাল তেল নুন সব দুদিনে বাড়ন্ত হয়ে উঠল, বাড়িতে জায়গার টানাটানি দেখা দিল। সংসারে যে সচ্ছলতা ছিল, তা আর রইল না। আপনি জানলেন, যারা এল তারা বেড়াতে আসেনি, নিরুপায় হয়ে উঠেছে এসে আপনার বাড়িতে। হয়তো তাদের ঘরদোর ভেসে গেছে বন্যায়, কিংবা ধসে গেছে নদীর ভাঙনে। সব বুঝেও আপনি এবং বাড়ির লোকেরা বিরক্তি চাপতে পারছেন না। আপনাদের কথাবার্তায়, ব্যবহারে সেটা ফুটে বেরোচ্ছে। আত্মীয়েরা ভাবছে আপনার বাড়িতে তারা নিতান্ত অবাঞ্ছিত,

আপদ বালাই বলে মনে করছেন তাদের, এতটুকু সহানুভূতি নেই আপনাদের প্রাণে। আসলে তা নয়। তারা যে আপনার সংসারে ভালো ব্যবহার পাচ্ছে না, তার মূলে রয়েছে অর্থনীতির একটি পুরনো কথা—চাহিদা বেড়েছে, যোগান তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। যা আছে, তাতে কুলোচ্ছে না। এ সমস্যা তো আজকের নয়, চিরকালের। শুধু এ দেশের নয়, সমস্ত পৃথিবীর। সব দেশে এবং সব যুগে, মানুষে মানুষে যত বিরোধ, যত মনোমালিন্য, খুঁজলে দেখা যাবে তার শেকড় রয়েছে ঐখানটিতে।

দুর্গামোহন একটু থামতেই শম্ভু বলে উঠল, "কিন্তু আমরা তো এদের ঘাড়ের ওপর বসে এদের অন্নে ভাগ বসাতে আসিনি। আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই, চেষ্টাও কম করছিনা।"

"খুব সত্যি কথা" সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন মাস্টার মশাই, "কিন্তু সকলের আগে এদের তা বুঝতে দিতে হবে। এখানকার যারা বরাবরের বাসিন্দা তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে হবে, যে আপনারা বাইরের লোক নন। ঐ যে শুরুতে এসেই বলছিলেন না—'এদেশে আসবার পর সেটা আরো বেশী করে বুঝতে পাচ্ছি'—ঐ অভিমানটুকু ত্যাগ করতে হবে। এটা আলাদা দেশ নয়। মাঝখানে গোটাকয়েক পিলার বসালেই একটা দেশকে আলাদা করে দেওয়া যায় না। এ দেশ যেমন আমার, তেমনি আপনার। চিরকাল ছিল, আজও আছে, এবং চিরকাল থাকবে। শুধু মনটাকে সেইভাবে তৈরী করা। ব্যস, তারপর দেখবেন আর কোন সমস্যা নেই।

শম্ভু নীরবে বসে রইল। মাস্টার মশায়ের শেষের কথাগুলো বোধহয় তার মনকে স্পর্শ করেছিল। কিছুক্ষণ পরে যখন কথা বলল, আগেকার সেই তর্কের সুরটি আর নেই। ধীরে ধীরে বলল, সেই চেষ্টাই আমরা করছি মাস্টার মশাই। বুড়োরা এখনো ওপারে যা ফেলে এল তারই স্বপ্ন দেখছে। তাদের মন বসতে সময় লাগবে। ভিটে মাটির টান বড় কঠিন টান। কিন্তু আমার মত এবং আমার চেয়ে যারা ছোট তাদের বোঝাচ্ছি, সকলের আগে ঐ 'রিফিউজি' কথাটা তোরা ভুলে যা। লোক বলে বলুক, আমরা কখ্‌খনো মেনে নেবোনা। আমরা রিফিউজি, আমরা উদ্বাস্তু, আমরা পরগাছা—অমনি আরো কত নাম গজাচ্ছে আমাদের। সবগুলোর মধ্যেই অপমানের ছাপ। সব ঝেড়ে ফেলে দে। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন,

এটা এক তরফের ব্যাপার নয়। আমরা যেমন মনে করবো ভিটেছাড়া হলেও আমরা দেশছাড়া হইনি, এ মাটিও আমাদের, এখানে আমাদের জোর আছে, দাবি আছে, আপনারাও যদি সেটা স্বীকার করে না নেন, হাত বাড়িয়ে দিয়ে না বলেন, তোমরা এসো, তাহলে শুধু আমাদের মন তৈরি করে কী হবে ? এদিক থেকে সাড়া না পেলে তৈরি হবেই বা কেমন করে ? কিন্তু তেমন সাড়া কি আমরা পেয়েছি মাস্টার মশাই ? আপনিই বলুন।

দুর্গামোহন তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দিলেন না। মনে মনে যদিও জানেন, সাড়া যদি না মিলে থাকে, তার জন্যে শম্ভুচরণরাও কম দায়ী নয়, মুখে সেটা প্রকাশ করলেন না। এই গভীর আবেগের মুখে ঐ ধরণের অপ্রিয় সত্য শুধু একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবে। যুক্তি তর্ক অবতারণার অনুকূল ক্ষণ এটা নয়। এ সব কথা শুধু শুনে যেতে হয়, প্রতিবাদ করতে নেই।

তাছাড়া, শম্ভুচরণের উক্তিতে যে অভিযোগ আছে তাকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিদেশীর হাতে টেনে দেওয়া ঐ কৃত্রিম বর্ডার লাইনের ওপার থেকে উৎক্ষিপ্ত এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে এপারের লোকেরা যে আপনজনের স্বীকৃতি দেয়নি, এই অপ্রিয় সত্যটি কে অস্বীকার করবে ? মনে মনে যদি দিয়েও থাকে, তাদের আচরণে সেটা ফুটে বেরোয় নি। তার কারণ অবশ্য আছে। কিছুক্ষণ আগেই শম্ভুকে সেটা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন দুর্গামোহন। তার মধ্যে যুক্তি যতই থাক এই মুহূর্তে সেটা উপলব্ধি করবার মত মানসিক অবস্থা এর কাছে আশা করা অন্যায়। তাই দুর্গামোহন নিঃশব্দে বসে রইলেন।

শম্ভু ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলল, এই বাঁড়ুয্যে বাবুদের কাছ থেকে যে ব্যবহারটা আমরা পেয়ে আসছি, তার কথাই ধরুন। আমরা ওঁদের বাড়িঘরেও ঢুকিনি, জিনিসপত্তরও নষ্ট করিনি, কোথাও আশ্রয় না পেয়ে ঐ পোড়ো মাঠটায় এসে উঠেছিলাম। সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবার কোনো চেষ্টাই বাকী রাখেননি নায়েব মশাই। সবই তো আপনি জানেন, চোখের ওপর দেখেছেন।

"নায়েবকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না" মৃদু কণ্ঠে বললেন দুর্গামোহন, "মনিবের স্বার্থরক্ষা তার কাজ, সেজন্যে সেরেস্তা থেকে মাসে মাসে মাইনে

পেয়ে থাকে। সেই স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেখে যা তার কর্তব্য বলে মনে হয়েছে, তাই করেছে।"

"কিন্তু ঐ কি স্বার্থরক্ষার ধরণ? একবার ভেবে দেখলেন না, কি অবস্থায় পড়েছি আমরা। এই মুহূর্তে উঠে যাও! ক্ষেতে পঙ্গপাল পড়লেও লোক বোধহয় অমন করে তাড়াতে আসে না।"

তুর্গামোহন স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে যেতে চাইছিলেন না। বললেন, যাই হোক, আপনারা যাননি তো। ঘর দোর তুলে বসে গেছেন। এখন আর ওসব পুরনো কথায় কী কাজ?

শম্ভু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিল, তা ঠিক। আসলে এসব কথা বলবার জন্য আপনার কাছে আসিওনি। কথায় কথায় উঠে পড়ল তাই।

একটু থেমে বলল, যে-জন্যে এসেছি, সেটা আলাদা ব্যাপার। আলাদাই বা বলি কেন? ব্যাপার তো আমাদের একটাই। কোনো রকমে বেঁচে থাকা। মাথার ওপরে একটু চাল, পরনে একখানি কাপড়, পেটে তুটো ভাত। তারই একটা মোটামুটি ব্যবস্থা কি করে করা যায় সেইটাই একমাত্র সমস্যা। সে দিক দিয়ে আপনি যদি একটু সাহায্য করেন—

বাকীটুকু অনুক্ত রেখেই শম্ভুচরণ মাষ্টার মশায়ের দিকে তাকাল। তিনিও চোখ তুলে বিস্ময়ের সুরে বললেন, আমি!

"হ্যাঁ, মাস্টার মশাই। সেই জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি। শুধু আমার একার ইচ্ছায় নয়, আমাদের ওখানে যে পঞ্চায়েত আছে তারাই পাঠিয়েছে আমাকে।"

তুর্গামোহনের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সন্দেহের ছায়া ফুটে উঠল। কী বলতে চায় উদ্বাস্তু কলোনীর এই নেতাটি! এরা তো আজ আসেনি এ গ্রামে। এতদিন পরে হঠাৎ তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিল কেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। বললেন, আমি আর কী সাহায্য করতে পারি আপনাদের?

শম্ভু সঙ্গে সঙ্গে বলল, এতদিন হয় তো চেষ্টা করলেও পারতেন না, এখন পারেন। যাঁর হাতে আমাদের ভবিষ্যৎ তিনি আপনার কোনো কথাই ঠেলতে পারবেন না, এই কদিনেই সেটা আমরা টের পেয়েছি। আজ স্পষ্ট করে বুঝলাম।

"আপনি অভিজিতের কথা বলছেন ?

"আজ্ঞে হাঁ।"

দুর্গামোহন কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন।

ভিতর থেকে ডাক এল—বাবা! এই ডাকের অন্তর্নিহিত অর্থটি তাঁর কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। টেবিলের উপর একটি টাইমপিস ঘড়ি ছিল। সে দিকে একবার তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন, এই যে, যাই মা।

॥ ৭ ॥

সকালে উঠে খানিকটা বেড়িয়ে আসা হুর্গামোহনের আযৌবন অভ্যাস। যখন স্কুল ছিল, বেশ ভোরে ভোরে বেড়োতেন এবং আশপাশের লোকজন উঠবার আগেই ফিরে আসতেন। স্কুলের জন্যে তৈরি হবার আগে নানা-রকম কাজ থাকত। তার মধ্যে প্রধান—ছেলেদের দৈনিক 'টাস্‌ক্'-এর খাতা দেখা। তাঁর কালে মাস্টারমশাইরা ওটাকে তাঁদেরও অবশ্য করণীয় 'টাস্‌ক্' বলে মনে করতেন।

পরের যুগে অবশ্য ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই এই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেয়েছে। যুগই তাদের মুক্তি দিয়েছে। এখনো টাস্‌ক্ করে ছেলেরা, পলিটিক্যাল টাস্‌ক্। দেন রাজনীতির নায়করা। তাঁরাই এ যুগের শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে পাড়ার আড্ডায় ও স্কুলে সেটা তৈরি করে আর ঐ নেতাদের প্রয়োজন মত পরীক্ষা দিতে যায় স্লোগ্যান-পটকা-মুখরিত শোভাযাত্রায়, ময়দানের 'গণসভায়', কখনো কখনো ট্রাম-বাস্-এর দহনযজ্ঞে এবং পুলিশের সঙ্গে ইষ্টক-যুদ্ধে।

নিছক 'মাস্টার' যাঁরা অর্থাৎ পলিটিক্‌সের পাঠ নিতে শেখেননি, তাঁরা এই মহাদৃশ্যের অসহায় দর্শক মাত্র।

হোম-টাস্‌ক্ এবং পরীক্ষার খাতা দেখা ছাড়া আরো অনেক কাজ থাকত হুর্গামোহনের। নানাস্তরের লোক আসত তাঁর বৈঠকখানায়। শুধু স্কুল বা লেখাপড়া সম্পর্কীয় ব্যাপার নিয়ে নয়, তার বাইরেও নানা বিষয়ে তাঁর যুক্তি, পরামর্শ, বা উপদেশের প্রয়োজন বোধ করত। পল্লী অঞ্চলে হেডমাস্টার সবচেয়ে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি; অন্ততঃ সেইভাবেই তাঁকে দেখত লোকে। অশিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত মানুষেরও লেখাপড়ার উপর একটা সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা ছিল এবং যেহেতু হেডমাস্টার আশপাশের মধ্যে সব চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানা লোক, তাঁকেও তারা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

তখনো রাজনীতি ছিল, সামাজিক দলাদলি ছিল, কিন্তু হেডমাস্টার

সকলের উর্ধ্বে। সেইজন্যেই সকল দলের আস্থা ছিল তাঁর উপর, এবং সকল দলের উপর তাঁর প্রভাবও ছিল সমান। সাধারণতঃ একটু কড়া ধরনের লোক হতেন তাঁরা। স্কুলের ডিসিপ্লিন রক্ষার দিকে কঠোর নজর দিতেন। মাঝে মাঝে সে কঠোরতা হয়তো কিছুটা মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তবু তাঁর পিছনে সর্বসাধারণের সমর্থন ছিল।

দুর্গামোহন তাঁর হেডমাস্টার জীবনের প্রথম অধ্যায়ে সেই শ্রদ্ধা ও সমর্থনের অধিকারী ছিলেন। পরের অধ্যায়ে এসে দেখলেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর দিক থেকে কোনো পরিবর্তন না হলেও হেডমাস্টার নামক ব্যক্তিটিই তাঁর আগেকার আসন থেকে সরে গেছেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে একটা নতুন জিনিস আমদানি হয়েছে এর মধ্যে এবং তার পিছনে এসে জুটেছে অনেক রকম আনুষঙ্গিক। তাদের প্রভাবে 'শিক্ষার' যে প্রাধান্য ছিল সেটা চলে গেছে 'রাজনীতি'র অধিকারে! শিক্ষাব্রতীরাও তাই রাজনীতিজ্ঞের মঞ্চের দিকে ঝুঁকেছেন। দুর্গামোহনদের সেই আগের ভূমিকা আর নেই।

এই অবস্থান্তর তাঁকে বেশীদিন ভোগ করতে হয়নি। বিদায় নেবার সময় এসে গিয়েছিল। তা না হলে হয়তো নিজে থেকেই সরে আসতেন। অন্য কোনো কারণে নয়। শেষের দিকে তিনি বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন, 'ব্যক্তি স্বাধীনতার' কবলে পড়ে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশী ঘা খেয়েছে সেটি তাঁর ছেলেদের শৃঙ্খলাবোধ। শিক্ষার ভিৎ নড়ে যাচ্ছে এবং বিদেশী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রাম করে স্যার আশুতোষ প্রমুখ মণীষীরা বহু চেষ্টায় যে কাঠামোটি তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন, স্বদেশী স্বেচ্ছাতন্ত্রের কল্যাণে একদিন হয়তো তা ভেঙে পড়বে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে আসবার পর দেখতে পাচ্ছিলেন, সেই সম্ভাবনাই ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চারদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন, এমন কি কিছুদিন খবরের কাগজ পড়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু একজন শিক্ষিত মানুষ চোখ কান বন্ধ করলেও মনের দরজাটা তো বন্ধ করে দিতে পারেন না। ইচ্ছা করলেও না। সেই পথ দিয়ে যেটুকু আসতো তাতেই ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা অনুভব করতেন। বুকের মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা হত। তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছিলেন। এ যুগের সাহিত্য নয়,—তার মধ্যেও

তো পারিপার্শ্বিক জীবনের লক্ষ্যহীন অস্থিরতা—, উনবিংশ শতাব্দী ও তার আগের দিনের সাহিত্য, ক্লাসিক্স্, যার আবেদন সর্বকালের, সর্বযুগের—, শেক্সপিয়ার, ডিকেন্স, টলস্টয়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রোমাঁ রোলাঁ…।

কিন্তু বাঁচা কি যায়? যুগ তার দাবি ছেড়ে দেবে কেন? সে যে অহরহ হুঙ্কার দিয়ে বলছে—'এ কালে এসে যখন জন্মেছ, সেই জন্ম ঋণ তোমাকে শুধতেই হবে।' সমকালের কবল থেকে কারো মুক্তি নেই। দুর্গামোহনও নিজেকে পুরোপুরি বাঁচাতে পারেননি, যতই কেননা ক্লাসিক্স আর দর্শনের শরণ নিন।

হয়তো কিছুটা বাঁচতে পারতেন যদি গোড়াতেই একটা গুরুতর অপরাধ না করে বসতেন, অর্থাৎ এই বাংলাদেশে না জন্মাতেন। যে বাঙালী কবি একদিন মুগ্ধ কণ্ঠে গেয়েছিলেন "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে", তিনি কি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন, তাঁর এই উক্তি সেই 'দেশের' কাছে একদিন কত বড় নিষ্ঠুর পরিহাস হয়ে দাঁড়াবে? এই সঙ্গীত যার সূচনা, যে পরম বস্তুর দিকে চেয়ে এটি তিনি রচনা করেছিলেন, সেই স্বাধীনতা যখন এল, তাঁর দেশের লোকেরা সভয়ে তাকিয়ে দেখল সেটা আর কিছু নয়, ছুরি, র‍্যাডক্লিপ নামক এক বিদেশীর উদ্ধত হাত যেটা তার বুকের উপর বসিয়ে দিয়ে গেল। তখনো তারা জানেনা, কত রক্ত ঝরবে সেই দুষ্ট ক্ষত থেকে। দুদিন না যেতেই জানল। আর জানল সে রক্ত-মোক্ষণের আর শেষ নেই।

যেখান দিয়ে সেই ছুরিটা বসানো হল, তার কিছুটা এধারে দুর্গামোহনের জন্ম। তাঁর কর্মস্থান এবং শেষ জীবনের আশ্রয়স্থলও বেশী দূরে নয়। সুতরাং এই ক্ষত-লাঞ্ছিত স্বাধীনতার বীভৎস রূপ তাঁকে চোখের উপর দেখতে হয়েছে। ভ্রান্ত—ভ্রান্তই বা বলেন কেমন করে?—চক্রান্তমূলক রাজনীতির একটা আঁচড়ে বাঙালী বলে একটা গোটা জাত রাতারাতি ভিখারীর দলে গিয়ে দাঁড়াল, এতবড় নির্মম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাস বোধ হয় আর একটাও দেখাতে পারেনি। ভিখারী বলতে বোঝায় যাদের কিছু নেই, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন। কিন্তু এদের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল, এরা আরেক ধাপ নীচে নেমে যাচ্ছে। শুধু বাইরের সম্পদ হারিয়ে আসেনি হারাতে বসেছে তার চেয়েও যেটা বড়, অন্তরের সম্পদ।

দুর্গামোহনের কাছে এই দ্বিতীয়টার মূল্য প্রথমগুলোর চেয়ে বেশী। অন্নবস্ত্র আশ্রয়ের অভাব একদিন মেটানো যায়, কিন্তু হারানো মনুষ্যত্ব ফিরে পাওয়া বড় কঠিন, চরিত্রের দৈন্য কোনো গ্র্যাণ্ট্ বা সাহায্য দিয়ে ঘোচানো যায় না।

বরাবরের অভ্যাস মত রোজ ভোরবেলা যখন বেড়াতে বেরোতেন, উদ্বাস্তু কলোনীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাদের জীবনযাত্রার যে রূপটা চোখে পড়ত, তার চেয়ে তাঁকে বেশী পীড়া দিত, যেটা চোখে দেখা যায় না। এরা যে পথ ধরে চলেছে, এদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, কথাবার্তার মধ্যে যে নীতিবোধ প্রকাশ পাচ্ছে, সেইগুলোর কথা ভেবেই তিনি বিমর্ষ হয়ে উঠতেন। নানা সূত্র থেকে নানা কথা কানে আসত। সরকারী সাহায্য এদের মধ্যে যে গোপন ব্যবসায়ের পথ খুলে দিয়েছে, তা আর কারো অজানা ছিল না। এক এক জন লোক নাম ভাঁড়িয়ে কবার করে ঋণের টাকা আত্মসাৎ করেছে, তার কত অংশ বর্ডারের ওপারে পাচার করে দিয়েছে, এপারে ওপারে কি কি জিনিসের চোরা কারবার চালাচ্চে কারা, পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেবার কত রকম ফন্দির আবিষ্কার হচ্ছে প্রতিদিন—এমনি ধারা অনেক তথ্য এদের নিজেদের মুখ থেকেই ছড়িয়ে পড়ত। তার মধ্যে কিছু হয়তো মিথ্যা, কিংবা বাহাদুরি প্রকাশের জন্যে অতিরঞ্জন, বাকীটা সত্য। প্রথম প্রথম এসব কাজ যারা করত তাদের মনে একটা লজ্জাবোধ ছিল। ক্রমশঃ তারা সেটা কাটিয়ে উঠল। এর ভিতরে যে কৌশল ও দুঃসাহস আছে, তার কৃতিত্বটাই অন্যায়বোধকে ছাপিয়ে গেল।

"এটা আমি স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র দেখিয়াছি, যাহা লজ্জাকর ব্যাপার, বাঙালী সেখানে লজ্জিত হইয়াই থাকে"—প্রথম যৌবনে পড়া ভূয়োদর্শী শ্রীকান্তের এই উক্তিটি দুর্গামোহনের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। পরিণত বয়সেও তার সত্যতায় বিশ্বাস হারান নি। এবার সেখানে রূঢ় আঘাত লাগল। সেই সঙ্গে একথাও মনে হল, সেই জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও গৌরবের পরিচয় সে যে দিতে পারছে না, তার জন্য দায়ী তার জীবনের এই অস্বাভাবিক বিপর্যয়, যা তার অস্তিত্বের মূল ধরে শুধু নাড়া দেয়নি, তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে।

এই দৃশ্যের বিষণ্ণ দর্শক হওয়া ছাড়া আর কিছুই তাঁর করবার ছিলনা। একেবারে ঘরের পাশে ঐ উদ্বাস্তু কলোনীর সঙ্গে সব সংযোগ এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়নি। তবু যতটা পারেন ওদের সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। ওদিকটায় বেড়াতে যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এমন সময় এল অভিজিৎ। উপলক্ষ্যটা তার সদর নায়েবের ইস্তফাপত্র। কিন্তু আসলে সেই সূত্র ধরে ঐ উদ্বাস্তুদের সমস্যার মধ্যেই তাঁকে টানতে চাইল। তিনি 'না' বলতে পারলেন না। তার কারণ হয়তো তাঁর এই প্রাক্তন ছাত্রটির প্রতি একটি সূক্ষ্ম আকর্ষণ, দীর্ঘকালের অদর্শনেও যা শিথিল হয়নি বরং নতুন করে অনুভব করছিলেন, তাছাড়া অন্য একটা প্রচ্ছন্ন কারণও হয়তো ছিল। যে cause বা উদ্দেশ্য নিয়ে সে এল বাইরে তার সম্বন্ধে যতই নির্লিপ্ত থাকবার চেষ্টা করুন, মন থেকে তাকে হটিয়ে দিতে পারেন নি। শম্ভুচরণের আবির্ভাবও একটি অদ্ভুত যোগাযোগ বলে মনে হল তাঁর কাছে এবং সেইজন্যে লোকটিকে বিশেষ পছন্দ না করলেও তার আবেদনটি একেবারে এড়িয়ে যেতে পারলেন না। সে যখন উঠল একরকম নিশ্চিত হয়েই গেল যে, তাদের ব্যাপারে 'মাস্টার মশাই'-এর পক্ষে যতটা সাহায্য সম্ভব তার অভাব হবে না।

অভিজিৎ যখনই আসে, সকালের দিকে আসে এবং একটু বেলা করে। সে লক্ষ্য করেছে 'মাষ্টার মশাই' তাঁর মর্নিং ওয়াক্ পর্বটি যখন সরু করেন, তখন মর্নিং অনেকটা এগিয়ে গেছে। সুতরাং ওয়াকিং ষ্টিকের বদলে তাঁকে একটি ওয়াকিং আম্ব্রেলার শরণ নিতে হয়, এবং ফিরবার পথে সেটি হাত থেকে মাথায় গিয়ে ওঠে। অথচ ঘুম থেকে ওঠেন খুব সকালে, চাকরি-জীবনে যখন উঠতেন, তার চেয়েও আগে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্য অনেক কিছু হ্রাস পায়। তার মধ্যে সব চেয়ে বেশী বোধহয় ঘুম। বার্ধক্যের রাত বড় দীর্ঘ, বিশেষ করে তার শেষ কটি প্রহর।

অতি ভোরে উঠেও দেরি করে বেরোবার একটি কারণই অনুমান করেছিল অভিজিৎ—ঠাণ্ডার ভয়, বুড়ো বয়সে যা অনেককেই পেয়ে বসে। একদিন কি একটা কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারল সেটা ঠিক নয়, এবং আসল হেতুটা দুর্গামোহন নিজেই ব্যক্ত করলেন—"নাহে, ঠাণ্ডাফাণ্ডা আমি গ্রাহ্য করি না।

তাছাড়া চৈত-বোশেখ মাসে তো ঠাণ্ডা থাকে না। তখনো আমাকে বেলা করেই বেরোতে হয়। আমার প্রাতর্ভ্রমণের চেয়ে আমার পাড়া প্রতিবেশীদের প্রাতঃক্রিয়ার প্রয়োজনটা অবশ্যই বড়। সেই কর্মটি যতক্ষণ না শেষ হয়, অন্ততঃ ভিড়টা একটু না কমে, আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। তুমি বোধহয় ছাখনি, রাস্তার ঠিক নীচেটা থেকে শুরু করে জলের ধার পর্যন্ত রীতিমত মেলা বসে যায়।

ব্যাপারটা অভিজিতের অজানা নয়। সম্প্রতি একদিন সকালে বেরিয়ে তার নজরেও পড়েছে। এর পিছনে যে কারণটা আপাততঃ তার মনে এল তারই উল্লেখ করল, হঠাৎ এতগুলো লোক এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। মাথা গুঁজবারই জায়গা নেই। তার ওপরে—

মাস্টার মশাই বাধা দিলেন, তুমি ভুল করছ। লোক বাড়ার সঙ্গে ভিড় বেড়েছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু ব্যাপারটা তো বরাবরের। আমাদের জাতীয় অভ্যাস, ঐতিহ্যও বলতে পার। শুধু এই বাংলা দেশে নয়, গোটা ভারতবর্ষে এই জিনিস চলে আসছে।

"তা ঠিক। পশ্চিমে আরো বেশী", যোগ করল অভিজিৎ, "এখানে তবু যাদের আমরা উঁচু জাত বলি, তারা বড় একটা এমন প্রকাশ্যভাবে খোলা জায়গায় গিয়ে বসে না। ওখানে উঁচু নীচু সব সমান। সকলেরই 'ময়দান'-গতি। এমন কি মেয়েরাও বাদ যায় না।"

—"অথচ এই লোকগুলোর স্বাভাবিক লজ্জা সরম বোধ যে কম, তা নয়। ঐ বিশেষ সময়টা ছাড়া দেহের আব্রু সম্বন্ধে তারা উদাসীন নয়। আসলে আমাদের চরিত্রে যে একটা সেলফ্ কণ্ট্রাডিকশন আছে, এখানেও তারই প্রমাণ দিয়ে থাকি। আমরা গোরুকে ভগবতী বলে পুজো করি, গোদান একটা মস্ত বড় পুণ্য কর্ম ; 'ধর্মের ষাঁড়' যত অত্যাচার করুক তার গায় কেউ হাত দিতে গেলে দল বেঁধে রুখে উঠি। কিন্তু গোজাতির এত বড় অবহেলা পৃথিবীর আর কোনো দেশে দেখতে পাবে না। তেমনি যে গঙ্গা আমাদের মাতৃস্বরূপা, যার বুকে একটা ডুব দিয়ে মনে করি স্বর্গের দরজা খুলে গেল, প্রতিদিন সকালে উঠে তাকেই উপহার দিয়ে আসি আমার দেহের যেটা রিজেকশন, সব চেয়ে নোংরা দুর্গন্ধ ক্লেদ। ভেবে দেখলে এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার আর কী আছে ?

সেদিন অনেকটা আগে আগেই এসে পড়ল অভিজিৎ। হাতে একতাড়া কাগজ। চোখে মুখে একটু ব্যস্ত ভাব।

দুর্গামোহন সবে বেড়িয়ে ফিরে সামান্য প্রাতরাশ শেষ করে বাড়ির সামনে যে ছোট্ট বাগানটুকু আছে তার পরিচর্যা করছিলেন। মুখ তুলে মৃদু হেসে বললেন, 'এসো অভি।' কাগজগুলো তাঁর চেনা। কালই সারা দুপুর বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। প্রথম দিকটা অভিও ছিল! দুজনে মিলে ঐ নিয়েই আলোচনা করেছেন। তারপর সে উঠে গেল। কোলকাতায় যাবার দরকার ছিল। সন্ধ্যেবেলা ওগুলো তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

অভিজিৎ বাণ্ডিলটা খুলে টেবিলের উপর রেখে একখানা টাইপকরা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বের করতে করতে বলল, একটা জিনিস বোধহয় আপনি লক্ষ্য করেন নি স্যার।

"কী?" কাগজের দিকে ঝুঁকে পড়লেন দুর্গামোহন। অভি আঙুল দিয়ে তলার দিকে সইটা দেখিয়ে দিল। তারপর বলল, অবশ্যি নাম থেকে ফস করে ধরা শক্ত। বলে হেসে ফেলল। দুর্গামোহনও হাসতে হাসতে বললেন, শুধু নাম কেন, কোয়ালিফিকেশন এবং অন্যান্য পার্টিকুলারস্ যা রয়েছে তার থেকেও সহজে ধরা যায় না। টেষ্টিমোনিয়ালগুলো পড়তে গিয়ে বুঝলাম।

—"তার আগেই বুঝি সিলেক্ট করে ফেলেছেন?"

—"না, সব পড়ে টড়েই করেছি। নিজের সম্বন্ধে কে আর কবে কম করে বলে? সেটা দেখলে কি চলে? দেখতে হবে অন্যেরা কী বলছে।"

অভিজিৎ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। দুর্গামোহন সেটা লক্ষ্য করে বললেন, কেন, তোমার কি মনে হয় এর চেয়ে বেটার (better) কেউ আছে এর মধ্যে?

"না", সঙ্গে সঙ্গে বলল অভিজিৎ, "আমরা যা চাই, যে রকম লোক আমাদের দরকার, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এইটিই বেষ্ট্ ক্যাণ্ডিডেট্।" কিন্তু—বলে, থেমে গেল।

দুর্গামোহন বললেন, কিন্তু'টা যে আমি ভাবিনি তা নয়। অসুবিধে আছে। আমাদের দিক থেকে এবং হয়তো ওঁর দিক থেকেও। কিন্তু শুধু

সেই কারণেই দরখাস্তটা রিজেক্ট করা যায় না। গোড়াতে আমরাই একটা ভুল করে বসে আছি। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা উচিত ছিল, স্ত্রীলোক চলবে না, women are unsuitable. কোনো কোনো সরকারী বিজ্ঞাপনে যেমন থাকে। তা যখন লিখিনি, এখন আর ওঁকে বাদ দেওয়া চলে না, দিলে অন্যায় হবে।

অভিজিৎ আর কোনো কথা বলল না। মনে মনে বুঝল, ঐ 'অন্যায়' শব্দটা যেভাবে উচ্চারিত হল, তারপরে এ বিষয়ে আর কোনো আলোচনায় পথ রইল না। 'মাষ্টার মশাইকে' সে চেনে। ছোটখাটো ব্যাপারেও তাঁর যে অবিচল ন্যায় নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছে তার থেকে এটুকু অন্ততঃ পরিষ্কার হয়ে গেল, যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন সেটা যতই অবাস্তব হোক, কাজের বেলায় যত জটিলতার সৃষ্টি করুক কিছুতেই তার থেকে তিনি সরে আসবেন না। ঐ একটি মাত্র যুক্তি আঁকড়ে ধরে থাকবেন—সেটা অন্যায় হবে।

জমিদার উচ্ছেদের পর যে সব জটিল অবস্থা দেখা দিয়েছে তার মোকাবেলা করবার জন্যে এবং তার চেয়েও বেশী এই জবরদখলকারী উদ্বাস্তুরা যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে তার সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে একজন ম্যানেজারের প্রয়োজন যখন দেখা দিল, যিনি সেই সমস্যাগুলোকে একদিকে দৃঢ়তা ও অন্য দিকে সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে দেখতে পারেন, অভি প্রথমটা মাস্টার মশাইকেই অনুরোধ করেছিল, তাঁর জানাশুনোর ভিতর থেকে কাউকে নিয়ে এসে কাজে লাগিয়ে দিতে। এ রকম যে তাঁর জানার ভিতরে ছিল না তা নয়। কিন্তু এইভাবে কাউকে চাকরি দেওয়াটা তিনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেননি। তার চেয়েও যোগ্যতর আরো কত লোক থাকতে পারে। তারা তো সুযোগ পাচ্ছে না। সুতরাং স্থির হল প্রয়োজনীয় গুণাবলী উল্লেখ করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক। গুণাবলীর তালিকা যেটা দেওয়া হল, তার মধ্যে একটি জিনিস অত্যাবশ্যক বলে চিহ্নিত করা ছিল—আবেদনকারীকে উদ্বাস্তুদের চরিত্র, জীবনযাত্রার ধরণ, বিশেষ মানসিকতা, যে অঞ্চল থেকে তারা এসেছে তার পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

বয়স, শিক্ষা, পরিবারিক পরিচয়, জমিদারি সংক্রান্ত জ্ঞান (যদি কিছু থাকে) এবং আনুষঙ্গিক আরো কিছু কিছু তথ্য সরবরাহ করবার নির্দেশ ছিল। সেই সঙ্গে প্রশংসা পত্রের নকল।

বলাবাহুল্য, দরখাস্ত পড়ল অনেক। অভিজিতের হাতের বাণ্ডিলটি তার একটা ক্ষুদ্র অংশ। বাকীগুলো প্রথম পরীক্ষাতেই বাদ দেওয়া হয়েছিল। সে কাজটি অভি নিজেই সেরে রেখেছিল, মাস্টার মশাইকে বিরক্ত করেনি। শেষ বাছাই-এর ভার ছিল তাঁর উপর। তিনি সব দিক বিবেচনা করে গুণানুসারে যাকে যোগ্যতম বলে চিহ্নিত করলেন, তার নামটা প্রথমে দেখেননি, (দেখবার দরকারও ছিল না; নাম এক্ষেত্রে অবান্তর) পরে দেখলেন সই রয়েছে নীহার চ্যাটার্জি। সে যে মেয়ে এরকম কোনো সম্ভাবনা তাঁর মনে জাগেনি। প্রশংসাপত্রগুলো তখনো দেখা হয়নি। প্রথমখানা পড়তে গিয়ে "she" শব্দটা দেখে চমক লাগল। আরেকবার পড়লেন সব দরখাস্ত, নানা ভাবে তুলনামূলক বিচার করে দেখলেন। নীহার চ্যাটার্জিই সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হল তাঁর কাছে। তার দরখাস্তের উপর সেই অভিমত ব্যক্ত করলেন।

অভিজিৎ তাঁর যুক্তির উত্তরে নির্বাক থাকলেও তার মন যে এই সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারছে না, দুর্গামোহন সহজেই বুঝলেন। সায় কি তাঁর নিজের মনই দিয়েছে? কিন্তু কী করবেন তিনি? তাঁর কাজ ছিল সব চেয়ে বেশী নম্বর কার প্রাপ্য সেইটুকু স্থির করা। চিরজীবন এই করে এসেছেন এবং এখানেও তাই করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখতে গিয়ে ছাত্রীকে তো ছাত্রের চেয়ে আলাদা করে দেখেন নি।

অভিজিৎ তখনো মাথা নীচু করে বসে আছে। তার দিকে আরেকবার চেয়ে দেখলেন দুর্গামোহন। তার চিন্তা-সূত্রটি অনুসরণ করবার চেষ্টা করলেন। মনে হল, ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্নটা যে সে উপলব্ধি করে নি, তা নয়। তবু যে সে মনে মনে তাঁর এই নির্বাচন গ্রহণ করতে চাইছে না, তার কারণ এর অন্য একটা দিকও আছে। গুণটাই এখানে যোগ্যতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয়, দেখতে হবে এই বিশেষ কাজের পক্ষে এই মেয়েটি কতটা উপযোগী। সে শুধু মেয়ে নয়, বয়সে তরুণী। এর কোনোটাই এক্ষেত্রে বিবেচনা থেকে বাদ দেওয়া চলে না। আরেকটা প্রশ্ন আছে। কেবলমাত্র বিজ্ঞাপন থেকে সে হয়তো তার করণীয় কাজের ঠিক চেহারাটা, তার ধরণ-ধারণগুলো পুরোপুরি বুঝতে পারে নি। পারা সম্ভবও নয়। সেসম্বন্ধে আরো খবরাখবর নেবার পর তাকেও ভেবে দেখতে হবে, এখানে তাকে মানাবে কি?

"এক কাজ করলে হয়।"

হঠাৎ আবার মাস্টার মশাই-এর কথা কানে যেতেই অভিজিৎ মুখ তুলল। দুর্গামোহন বললেন, মেয়েটিকে ডেকে পাঠাও। একটা ইণ্টারভিউ গোছের নিয়ে দেখা যাক।

এ প্রস্তাবটাও অভিজিতের বিশেষ মনোমত বলে মনে হল না। তবু যে পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার কিছুটা অন্ততঃ খুলবার সম্ভাবনা দেখা যাওয়ায় তার মুখে একটু আশার আভাস ফুটে উঠল। বলল, আপনার এখানেই আসতে বলি?

—না, না; আমার এখানে কেন? চাকরি দেবে তুমি, তোমার ম্যানেজার। তোমার কাছারিতেই আসবে।"

"কিন্তু ইণ্টারভিউ নেবেন তো আপনি।"

"আমি তোমার সঙ্গে থাকবো, অ্যাড্‌ভাইসার হিসাবে। আর—"

কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, বৌরাণীকেও রাখতে হবে আমাদের বোর্ডে।

অভিজিৎ মনে করেছিল খবরটা দিয়ে বৌরাণীকে অবাক করে দেবে, কিন্তু বৌরানীর জবাব শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল। ম্যানেজার পদের জন্যে তারা যাঁকে মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছে তিনি একজন মহিলা, একথা শুনে বৌরানী বললেন, ভালই হল। আমার একজন সঙ্গী হবে। এতবড় বাড়িতে একা একা থাকতে মাঝে মাঝে হাঁফ ধরে যায়।

"কিন্তু তোমার সঙ্গী হবার জন্যে তো তাঁকে আনা হচ্ছে না" মৃদু হেসে বলল অভিজিৎ, "তিনি আসছেন চাকরি করতে। বাইরের মহলে তাঁর কাজ। তুমি তাঁকে পাচ্ছ কোথায়?"

"ভয় নেই, তাঁর কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটাতে যাবনা," দেওরের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে 'কাজ' কথাটার উপর একটু বিশেষ জোর দিলেন বৌরানী, "সেটা যে পুরোপুরি মালিকের এলাকা, তা জানি। সেখানে ভাগ বসাতে চাইনা। কাজের তো ফাঁক আছে। তার এক আধটু হলেই আমার চলবে। তাতে কোনো আপত্তি নেই তো?"

অভিজিৎ বুঝল অতর্কিতে একটু গোলমেলে জায়গায় পা দিয়ে ফেলেছে

এবং প্রসঙ্গটা চলতে দিলে পরিহাসরসিকা ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে এঁটে ওঠা আরো কঠিন হবে। তাই হাসি মুখে চুপ করে রইল। বৌরানী বললেন, "তিনি কাজে লাগছেন কবে?"

"লাগবেনই যে, সে কথা এখনো নিশ্চয় করে বলা যায় না। শুধু দরখাস্তের ওপর তো চাকরি হয় না। তার পরের পর্ব হল ইণ্টারভিউ।"

"সেটা আবার কি?"

"দেখাসাক্ষাৎ, জিজ্ঞাসাবাদ, মানে কাজ কর্ম কতটা কি পাওয়া যাবে, না যাবে, যাচাই করে নেওয়া। আপাতত সেই জন্যে ডেকে পাঠানো হয়েছে। পরশু দশটার সময়। তুমি তৈরী থেকো।"

"আমি!" যেন আকাশ থেকে পড়লেন মহামায়া।

"হ্যাঁ, তোমাকেও থাকতে হবে আমাদের সঙ্গে। রীতিমত ইণ্টারভিউ বোর্ড তিনজন মেম্বার—হেডমাষ্টার মশাই, তুমি আর আমি।"

"কী সর্বনাশ! আমি সেখানে কী করবো!"

"সবাই মিলে দেখে শুনে নিতে হবে না?"

"আমি কী দেখবো? ম্যানেজার ট্যানেজারের ব্যাপার আমি কী বুঝি?"

স্বর নামিয়ে চোখ টিপে মুচকে হেসে বললেন, এতো আর কনে দেখা নয়, তাহলে না হয় থাকা যেত।

ইদানিং হেডমাষ্টার মশাইএর সামনে বেরোতেন বৌরানী। তিনি এসে আরেকবার ওঁকে রাজী করাতে চেষ্টা করলেন, "তুমি থাকলে ভালো হয় মা, বিশেষ করে এই জন্যে যে কাজটা যাকে দেবার প্রস্তাব হয়েছে সে একটি মেয়ে, বয়সও অল্প। তাছাড়া তোমাকে বাদ দিয়ে কিছুই হতে পারে না। বাঁড়ুয্যে বাড়ির ভালো মন্দ সব কিছুর সঙ্গেই তো তুমি জড়িয়ে আছ। এই রকম একটা জরুরী ব্যাপারে তোমার মতামত বিশেষ দরকার।"

মহামায়া বললেন, এ মেয়ে তো আর আমাদের মত সেকেলে নয় মাষ্টার মশাই, যে পুরুষের সামনে জড়সড় হয়ে বসে থাকবে। আজকালকার লেখাপড়া-জানা মেয়ে, তার ওপরে চাকরি করতে আসছে। আমার থাকবার কোনো দরকার নেই। আর মতামতের কথা? আপনি আর ঠাকুরপো মিলে যা স্থির করবেন, তার ওপরে আমি আবার কি বলবো?

দুর্গামোহন এর পরে আর পীড়াপীড়া করলেন না। উঠে পড়ে বললেন, একটি মেয়েকে যে আমরা এ কাজের ভার দিতে চলেছি,—যদি অবিশ্যি উপযুক্ত মনে হয় এবং তার তরফ থেকে কোনো অসুবিধা না থাকে—এতে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?

"না, না; আপত্তি কেন হবে? মেয়েরা তো আজকাল সব রকম কাজই করছে। শুনতে পাই।"

দুর্গামোহন চলে যাচ্ছিলেন। বৌরানী একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটি কি কুমারী, না বিয়ে হয়ে গেছে?

মাষ্টার মশাই যেতে যেতে থামলেন। বৌরানীর দিকে ফিরে বললেন, মনে হচ্ছে কুমারী। দরখাস্তে অবিশ্যি ও সম্বন্ধে কিছু লেখেনি, তবে ঐসঙ্গে যে সব প্রশংসা পত্র আছে, তাতে নামের আগে 'কুমারী' কথাটার উল্লেখ রয়েছে, যদিও সেগুলো কিছুদিন আগেকার। ....সে কথা জিজ্ঞেস করছ কেন মা?

"না, ওর থাকবার কথা ভাবছিলাম। বিবাহিতা হলে বোধহয় বাইরে বাসা নেবে। আর যদি কুমারী হয় এবং সঙ্গে কেউ না আসে তাহলে এখানেই থাকতে পারে। মাঝের মহলের পূবদিকটায় তিন চারখানা ঘর খালি পড়ে আছে।"

"সে সব ব্যবস্থা তুমি যা স্থির করবে তাই হবে। আগে চাকরি হোক, তারপরে তো বাসা"—বলে মৃদু হেসে এগিয়ে গেলেন দুর্গামোহন।

ইন্টারভিউএর সময় দেওয়া ছিল দশটা। তার কয়েকমিনিট আগেই দেখা গেল বিশাল সদর দরজা পার হয়ে একটি মেয়ে ভিতরে ঢুকল। দুর্গামোহন কাছারি বাড়ির পিছনের একটি ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলেন মেয়েটিকে। ছিপছিপে চেহারা, বেশ লম্বা, হয়তো সেই জন্যে একটু বেশী রোগা বলে মনে হয়। তা না হলে দোহারা গড়নই বলা চলে। রং অগৌর, ঠিক কালো নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলতে যা বোঝায় অনেকটা তার কাছাকাছি, বাংলা দেশের বেশির ভাগ মেয়ে যেমন হয়ে থাকে। আরো কাছে এলে মুখের অবয়বটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুন্দর বলতে দ্বিধা হতে পারে; তবে মোটামুটি সুশ্রী বলতে বোধহয় কারো আপত্তি হবে না, ইংরেজিতে যাকে বলে হ্যাণ্ডসাম্। নাকে, চোখে, কপালে চিবুকে এমন একটা তীক্ষ্ণতা আছে, যা সকলের আগে চোখে পড়ে।

চেহারার মত পোষাকেও কোনো চাকচিক্য নেই। সাদা খোলের সাধারণ তাঁতের শাড়ি, আকাশী রংএর পাড়, ব্লাউজও সেই রংএর। হাতে একটি সাদাসিদে ধরনের ব্যাগ ও মেয়েদের বেঁটে ছাতা।

গেট পেরিয়ে কাছারি বাড়ির খোলা চত্বরে এসে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। আগেকার দিনে ওখানে দু-চার জন পাইক বরকন্দাজ মোতায়েন থাকত। পুরানো অভ্যাসবশতঃ দুর্গামোহনও বোধহয় তেমন কাউকে আশা করেছিলেন, এবং মেয়েটিকে পথ দেখিয়ে কাছারি ঘরে পৌঁছে দেবার জন্যে কেউ বেরিয়ে আসছে না দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এমন সময় হলধর এগিয়ে গেল। তাকে বোধ হয় আগেই বলে রেখেছিল অভিজিৎ। কী একটা জিজ্ঞাসা করে সঙ্গে করে নিয়ে এল। কর্তাদের আমলের সেই বিস্তীর্ণ ফরাস যার উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে দীর্ঘ কুণ্ডলী পাকানো গড়গড়ার নল হাতে নিয়ে তাঁরা অর্থী প্রার্থী, অতিথি অভ্যাগতের সঙ্গে দেখা করতেন, আজকের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা সেখানে হয়নি। পাশের একটি ছোট ঘরে অভিজিৎ বসে কাজকর্ম করে। আসবাব বলতে একটি অফিস টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার। সেইখানে নিয়ে সাক্ষাৎকারিনীকে বসাল হলধর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুর্গামোহন এসে ঢুকলেন, পিছনে অভিজিৎ। নীহার উঠে দাঁড়াল। এঁরাই যে তার পরীক্ষক এবং হয়তো নিয়োগকর্তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিনীত কিন্তু সপ্রতিভ ভঙ্গিতে দুজনকে দুটি নমস্কার করল।

অভিজিৎ ওকে বাড়ী ঢুকতে দেখেনি। সঙ্গে কেউ আছে মনে করে হলধরকে ডেকে তাকে কোথাও বসাবার নির্দেশ দিতে যাচ্ছিল, নীহার তার মাঝখানেই বলে উঠল, আমার সঙ্গে কেউ নেই, আমি একাই এসেছি।

অভিজিৎ আর কিছু বলল না। দুর্গামোহন বললেন, কোন অসুবিধে হয়নি তো?

"না", মাথা নেড়ে জানাল নীহার। সেই সূত্র ধরেই আরও দুচারটি মামুলী প্রশ্ন করলেন দুর্গামোহন। কোলকাতার কোথায় বাসা, নিজেদের বাড়ি না ভাড়া, কোথায় দেশ ছিল, পূর্ববঙ্গের কোন জিলায়, কতদিন হল এসেছে এ পারে, কে কে আছেন ইত্যাদি। নীহার একে একে উত্তর দিয়ে

গেল। শেষ প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল এখানে তার থাকবার মধ্যে আছেন শুধু দিদিমা আর দাদামশাই ;

"দেশের বাড়িতে ?" জানতে চাইলেন দুর্গামোহন।

"সেখানে কেউ নেই !',

"বাবা মা ?"

নীহার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলনা। তার শান্ত আনত মুখের উপর একটি ম্লান ছায়া পড়ল। কয়েকটি কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠল কপালে। চোখদুটি নীচে নেমে এল। ঠোঁট কামড়ে মনে হল যেন আত্মসংবরণের চেষ্টা করছে। কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর আবার স্বাভাবিক ভাব ফিরে এল মুখের উপর। সহজ সুরেই বলল, মারা গেছেন।

বাবা মার উল্লেখ করতেই মেয়েটির এই হঠাৎ ভাবান্তর এবং তার থেকে নিজেকে সহজ অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার প্রয়াস—দুটোই এমন স্পষ্ট যে দুর্গামোহন এবং অভিজিৎ কারোই দৃষ্টি এড়ালনা। দুজনেই বুঝলেন, "মারা গেছেন" এই চেষ্টাকৃত সংক্ষিপ্ত উক্তিটির পিছনে হয়তো কোনো বেদনাময় ইতিহাস আছে। সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবার ক্ষেত্র এটা নয়। সে বিষয়ে দুজনেরই মনে মনে বোঝাপড়া হয়ে গেল। হেডমাষ্টার মশাই অভিজিতের দিকে একবার তাকিয়ে তার নীরব সম্মতি নিয়ে কাজের কথা পাড়লেন।

চাকরির বিজ্ঞাপনে 'ম্যানেজার' শব্দটা উল্লেখ করা হলেও কাজটা যে আসলে ঠিক 'ম্যানেজারি' নয় সে সম্পর্কে একটি ছোট ভূমিকা দিয়ে শুরু করলেন দুর্গামোহন। জমিদারি যখন নেই, তার ম্যানেজারিও অর্থহীন। তবে 'ম্যানেজমেণ্টের' ব্যাপার কিছু আছে, এবং সেগুলো কিছুটা ঐ লুপ্ত জমিদারির সঙ্গে জড়িত। সরকার জমিদারদের স্বত্বাধিকার নিয়ে নিলেও তাদের দায়দায়িত্ব পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। মূল্য অবশ্য একটা নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু সেটা শুধু কাগজে কলমে। সেই অঙ্কটি কবে অর্থের রূপ নিয়ে এদের হাতে আসবে, সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। তার জন্যে আবেদন, নিবেদন তদ্বির তদারক চালিয়ে যেতে হবে। কতদিন, এবং তার ফলাফল কী দাঁড়াবে বলা মুশকিল।

"তাছাড়া" বলতে বলতে অভিজিতের দিকে ফিরলেন দুর্গামোহন, "ঐ

সংক্রান্ত আরো কি সব ব্যাপার আছে, তুমি বলতে পারবে। আমি মাষ্টার মানুষ, জমিদারির কী বুঝি ?"

"আমিও যে কতটা বুঝি আপনি নিশ্চয়ই জানেন।"

"তাহলেও এসে অবধি নাড়াচাড়া করছ তো ?"

"তার ফলে সব কিছু ঘুলিয়ে যাচ্ছে। অবিশ্যি একটা জিনিস বুঝেছি।"

"কী বল তো ?"

"এসব কোনদিনই আমার মাথায় ঢুকবে না।"

দুর্গামোহন হেসে উঠলেন। নীহারের মুখেও মৃদু হাসি দেখা দিল। দুর্গামোহন তার দিকে চেয়ে বললেন, অর্থাৎ ঐ ব্যাপারগুলো আপনাকে বুঝে নিতে হবে।

"এবং যা কিছু করণীয়", যোগ করল অভিজিৎ, "তাও করতে হবে। পুরনো এবং অভিজ্ঞ কর্মচারী আছে কয়েকজন। তাদের সাহায্য অবিশ্যি পাওয়া যাবে। এসব সম্পর্কে আপনার নিজেরও তো অভিজ্ঞতা রয়েছে' লিখেছেন।"

"অভিজ্ঞতা মানে," নীহার তার দিকটা পরিষ্কার করতে চাইল, "আমার দাদামশাই'র একটা ছোটখাটো জমিদারি ছিল। তার বেশির ভাগ পড়েছে পাকিস্তানে, এদিকেও কিছুটা আছে, মানে এখন সরকারের হাতে। তিনি কখনো এসব দেখেননি। সরকারী চাকরি নিয়ে বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন। এখন বুড়ো হয়ে গেছেন। বাধ্য হয়ে আমাকেই যা কিছু করবার করতে হয়। তার থেকে একটু আধটু শিখেছি।"

দুর্গামোহন বললেন, এদের অবস্থাও অনেকটা তাই। যা ছিল তার প্রায় সবটাই ওপারে, সুতরাং একেবারেই গেছে। এপারের অংশটা নিয়েই সমস্যা। তার ওপরে একটা নতুন সমস্যা জুটেছে, জবর দখল। আসবার পথে আপনার চোখে পড়ে থাকবে।

"ঐ কলোনীটা তো ?" জানতে চাইল নীহার।

"হ্যাঁ ; ওর সবটাই এদের জমি।"

অভিজিৎ বলল, এই সম্পর্কে একটা কিছু করাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। অ্যাডভারটাইজমেণ্টেও সে কথা ছিল। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন।

নীহার মাথা নেড়ে জানাল, সে করেছে।

ক্ষণকাল বিরতির পর অভিজিৎ বলল, এদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন, এবং সেটা করতে গিয়ে আমরা ঠিক জমিদারী মনোভাব নিয়ে এগোতে চাই না, ওদের দাবিগুলোকে যতটা সম্ভব সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাই। অবিশ্যি এ পক্ষের স্বার্থও একেবারে বিসর্জন দেওয়া চলে না। এ দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য কি করে নিয়ে আসা যায়, তারই উপায় বের করতে হবে। সেইখানেই বিশেষ করে আপনার সাহায্যের দরকার হবে।

নীহারের কিছু বলবার ছিল না। নতমুখে চুপ করে রইল। তার থেকে এটুকু বোঝা গেল অভিজিতের বক্তব্য এবং তার ভিতর দিয়ে তার মনোগত ইচ্ছা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

সকলেই নীরব। তার মধ্যে অভিজিতের কথাই আবার শোনা গেল, "আমাদের সৌভাগ্য যে আমার পূজনীয় শিক্ষক, হেডমাষ্টার মশাই"— দুর্গামোহনের দিকে চোখ ফেরাল এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, একটা 'ভূতপূর্ব' লাগাও।

"স্কুল কমিটির কাছে আপনি ভূতপূর্ব হতে পারেন, স্যার, আমার বা আর কারো কাছে নন," তৎক্ষণাৎ জবাব দিল অভিজিৎ। এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেল, "ওঁর মূল্যবান উপদেশ সব সময়ই পাওয়া যাবে। তাছাড়া আর একজন আছেন, আমাদের বৌরাণী—

নামটা উল্লেখ করতেই নীহার চোখ তুলে তাকাল। তার মধ্যে বোধহয় কিছুটা সকৌতূহল জিজ্ঞাসা। সেই দিকে চেয়ে দুর্গামোহন বললেন, বাঁড়ুয্যে বাড়ির লক্ষ্মী প্রতিমা। আপনার সঙ্গে আজই আলাপ হবে। এই বোধহয় দূত এসে গেছে।....কী রে?

হলধর এসে বিনীত ভঙ্গিতে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল দোরগোড়ায়। মাষ্টার মশাই-এর প্রশ্নের উত্তরে নীহারকে দেখিয়ে বলল, দিদিমণির কাজ হয়ে গেলে বৌরাণী ওঁকে ভেতরে যেতে বলেছেন, আর আপনিও যেন চলে যাবেন না।

দুর্গামোহন সহাস্যে বলে উঠলেন, এই দেখুন, এরই মধ্যে 'দিদিমণি' হয়ে গেছেন। এর পরে আমারও দেখছি আপনি টাপনি বলা চলে না।

নীহার সকুণ্ঠ মৃদুকণ্ঠে বলল, এতক্ষণ সাহস করে বলিনি, আমারো বড্ড লজ্জা করছিল আপনার মুখে 'আপনি' শুনতে।

বেশ, তাহলে ওটিকে এখানেই খতম করে দেওয়া যাক। এবার ভেতরে যাও। তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে নাকি অভি?

অভিজিৎ মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না।

ম্যানেজার পদে নীহার চ্যাটার্জির চূড়ান্ত নির্বাচন অর্থাৎ ফাইনাল সিলেকশনের আগে দুতরফের সুবিধার জন্যে তার সঙ্গে একটা ইণ্টারভিউ দরকার, এটা যখন সাব্যস্ত হল, দুর্গামোহন অভিজিতকে বলেছিলেন, বৌরাণীকেও রাখতে হবে আমাদের 'বোর্ডে'। কথার সুরটা হালকা হলেও প্রস্তাবটা তিনি ভেবে চিন্তেই করেছিলেন।

প্রথম কারণ, যা সহজেই নজরে পড়ে, এবং বৌরাণীকেও বলেছিলেন, প্রার্থীটি স্ত্রীলোক। পুরুষ হলে ইণ্টারভিউ-এর ব্যাপারে তাঁর থাকবার প্রশ্নই উঠতনা। কিন্তু একটি মেয়েকে সব দিক থেকে যাচাই করতে হলে শুধু পুরুষের দৃষ্টিই যথেষ্ট নয়; তার মধ্যে খানিকটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে সুযোগ যখন রয়েছে, তার সঙ্গে নারীর যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, সেটাও যুক্ত হোক না।

তাছাড়া, ম্যানেজার হলেও যেহেতু সে মেয়ে, অন্তঃপুরের সঙ্গে নানাভাবে তার যোগাযোগ ঘটবে। সেটা শুরুতেই হয়ে থাক।

দৃশ্যতঃ এটুকু হলেও দুর্গামোহনের প্রস্তাবের পিছনে আর একটা কারণ ছিল, বাঁড়ুয্যে বাড়ির গত কয়েক বছরের ইতিহাসের সঙ্গে যা গভীরভাবে জড়িত। হেডমাষ্টারের সঙ্গে এই পরিবারের প্রত্যক্ষ যোগ ছিলনা। অভিজিৎ ফিরে আসবার আগে পর্যন্ত এদের কোনো ব্যাপারে তাঁর ডাক পড়েনি, তিনি নিজে থেকেও আসেননি। তবু ঐ উঁচু পাঁচিল ঘেরা বিশাল বাড়িটার সঙ্গে তাঁর কেমন একটা সূক্ষ্ম অদৃশ্য সম্পর্ক রয়ে গেছে। ওখানকার উত্থান পতনের দৃশ্যগুলো দূরে বসেও তিনি লক্ষ না করে পারেননি। বৌরাণী নামিকা একটি সামান্য-শিক্ষিতা কিন্তু তীক্ষ্ণধী এবং উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না মহিলার জীবনধারা তিনি অলক্ষ্যে থেকেও অনুসরণ করেছেন।

তাঁর বধূজীবনের প্রথম অঙ্কে মহামায়া বাঁড়ুয্যে বাড়ির বড় আদরের

বৌরাণী। অন্তঃপুরের শোভাবর্ধন ছাড়া তাঁর আর কোনো ভূমিকা ছিল না। শাশুড়ী যেদিন গেলেন, তার পরমুহূর্ত থেকে এই আত্মীয়-পরিজন-আমলা-কর্মচারী-ঝি চাকর-বহুল সংসারের গৃহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর কাঁধে এসে চাপল। তখন তাঁর কতই বা বয়স! কিন্তু গৃহকর্ত্রীর সব দায়িত্ব তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করে এসেছেন। হয়তো বয়স অল্প বলেই সেদিন সকলের কাছে তাঁর 'বৌরাণী' নামটি অক্ষুন্ন রয়ে গেল, আজও যে সেটি 'গিন্নীমা'য় রূপান্তর লাভ করেনি তার কারণ বোধহয় এই যে তিনি আর শুধু গৃহিণী নন, তাঁর 'রাজ্যসীমা' গৃহের বাইরেও বিস্তৃত।

বাঁড়ুয্যে বাড়ির সনাতন রীতি তা নয়। গৃহিনীর কর্তৃত্ব বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কাছারি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছায় না। অন্দর মহলের বাইরের এলাকায় তাঁর পদক্ষেপ যেমন নিষিদ্ধ, সেখানকার কোনো ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপও তেমনি অবাঞ্ছিত। মহামায়ার বেলাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। জমিদারি-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর বলবার বা করবার কিছু ছিল না। এমন কি স্বামী যেদিন কর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাখরগঞ্জের বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করবার ভার নিজের হাতে নিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠলেন, মহামায়ার বুকের ভিতরটা এক আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বারবার কেঁদে উঠেছিল। তবু বলি বলি করেও বলতে পারেননি, 'তুমি যেও না'। বলাটা তাঁর গণ্ডির বাইরে। তাই শেষ পর্যন্ত নীরব ছিলেন।

ইন্দ্রজিৎ আর ফিরলনা। বৈধব্যের শূন্যতা নিয়ে মহামায়া সংসারের একান্তে সরে যেতে চাইলেন। পারলেন না। শ্বশুর তখনো বেঁচে। সংসারের হাল তাঁকে ধরে রাখতে হল। তার সঙ্গে আরো কিছুটা ভার এসে পড়ল তাঁর হাতে, কর্তার জীবদ্দশায় যা আসবার কথা নয়। বাঁড়ুয্যে বাড়ির চিরন্তন চিন্তা ও কর্মধারা বজায় রইলনা। বৌরাণীর জীবনে দেখা দিল নতুন অধ্যায়।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে শূরজিৎ তাঁর অভ্যস্ত জীবন যাত্রা থেকে নিজেকে অনেকখানি গুটিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। রোজ একবার কাছারিতে গিয়ে বসতেন, এই পর্যন্ত। কিন্তু প্রায় সর্বক্ষণ এক মনে গড়গড়া টেনে চলতেন, কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলতেন না, বিষয় আশয় সম্পর্কে কেউ কিছু উপদেশ, নির্দেশ নিতে এলে ইঙ্গিতে বাঁ পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিতেন। সেখানে বসত বড় ছেলে ইন্দ্রজিৎ।

তারপর সে-ও যেদিন অমন করে চলে গেল, কাছারিবাড়ির সঙ্গে কর্তার যে সংশ্রবটুকু ছিল, তাও আর রইলনা। স্ত্রীর ঘরের পাশে তাঁর যে বরাবরকার শোবার ঘর সেখান থেকে সরে এসে আগে থেকেই মাঝের মহলে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখান থেকে কদাচিৎ বেরোতেন। নিতান্ত জরুরী প্রয়োজন না হলে সদর নায়েবও দেখা করতে পারতেন না। কথাবার্তা যা হত অতি সামান্য। অল্পেতেই বিরক্তি প্রকাশ করতেন,—"যা ভাল বোঝ কর। আমাকে বিরক্ত করতে এসোনা।" কখনো কখনো দেখাই করতেন না।

এই রকম অচল অবস্থা যখন দেখা দিত, যজ্ঞেশ্বরকে বৌরাণীর শরণ নিতে হত—"তোমাকে একবার যেতে হবে মা।"

বৌরাণী এড়াতে পারতেন না। বাঁড়ুয্যে পরিবারের স্বার্থের দিকে চেয়ে তাঁর গণ্ডির বাইরে পা দিতে হত।

বছর কয়েকের মধ্যে শ্বশুরও গেলেন। একমাত্র জীবিত বংশধর অভিজিৎ এসে যদি তার পিতৃ-পিতামহের বিষয় সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ করত, মহামায়া কি করতেন বলা যায় না। হয় তো কাশীর বাড়িতে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতেন, এবাড়ির বিধবারা যা করে এসেছেন এতকাল। কিন্তু তাঁর জীবন বয়ে গেল অন্যখাতে। নিতান্ত অনিচ্ছায় এবং অনেকটা অজ্ঞাতসারে একটু একটু করে জমিদারির জটিল জালে জড়িয়ে পড়লেন। সে জটিলতা যখন এমন একটা রূপ নিল যার গ্রন্থিমোচন তাঁর অসাধ্য, তখন আর কোনো পথ না দেখে অভিজিৎকে ডেকে পাঠালেন। তা না হলে হয়তো নিজে থেকে ডাকতেন না। যেমন করে, যে অবস্থার মধ্যে এ বাড়ির কনিষ্ঠ সন্তানকে ঐ বয়সে তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, শাশুড়ীর মত তিনিও কোনো দিন তা ভোলেন নি। একে একে যখন সকলেই চলে গেল, এ বিশাল পুরীর শূন্যতা যখন তাঁর বুক চেপে ধরত, বৌরাণী অনেকবার ভেবেছেন, এবার সে ফিরে আসুক। কিন্তু লিখতে গিয়েও লেখেননি, যদিও তাগিদটা এই বাঁড়ুয্যে বাড়ির তরফ থেকে যতখানি, তাঁর নিজের দিক থেকে তার চেয়ে কম ছিল না। তবু এতগুলো বছর চুপ করে ছিলেন।

এবার আর না ডেকে পারলেন না। সে ডাকের মধ্যে এমন একটা সুর

ছিল যে অভিজিৎও সাড়া না দিয়ে পারলনা। তা না হলে কেবল মাত্র তার মৃত জমিদারির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার তাগিদে সে আসত না।

দুর্গামোহন তা বুঝেছিলেন। তাঁর এই ছাত্রটিকে কিশোর বয়সেই চিনতে পেরেছিলেন। লক্ষ করেছিলেন সে জমিদার বংশের শুধু রক্ত ধারার বাহক, ভাবধারার নয়। অনেক দিন পরে যখন দেখা হল প্রথম দর্শনেই বুঝলেন, মনটা তেমনি আছে—বিষয়-বিমুখ, নির্লিপ্ত। বরং এই দীর্ঘ দিন যে জীবন সে যাপন করেছে, তার প্রভাব ও পরিবেশ বাঁড়ুয্যে বাড়ির উত্তরাধিকারী হিসাবে তাকে 'অযোগ্য' করে তুলেছে, ইংরেজিতে যাকে বলে মিস্‌ফিট্। ওর চোখের দিকে তাকালে, ওর কথা শুনলে বোঝা যায় ওর মধ্যে একটি চির পলাতক বৈরাগী বাসা বেঁধে বসে আছে। এখানে এসে যদি সে কিছুটা বাঁধা পড়ে থাকে, সে বন্ধন বাঁড়ুয্যে বাড়ির নয়, তার পৈতৃক প্রাসাদের ঘরে বারান্দায় ছাতে আঙিনায় যে মধুর করুণ তিক্ত স্মৃতি জড়িয়ে আছে তারও নয়, সে বন্ধনের একদিকে রয়েছে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসা উদ্বাস্তু নামক ঐ আজব জীবগুলো, অপর দিকে রয়েছে বৌরাণী। কিন্তু এরাও তাকে চিরকাল বেঁধে রাখতে পারবে না। তার ভিতরকার ভবঘুরে মানুষটি হঠাৎ কোনদিন জেগে উঠবে সে নিজেই হয়তো জানেনা। কিন্তু ভিতরে তার প্রস্তুতি চলছে। তা নাহলে কী প্রয়োজন ছিল এই ম্যানেজারের? এ ব্যাপারটা নিয়ে সে যে উঠে পড়ে লেগেছে তার কারণ—সে ভেবেছে এইটাই তার ছুটির পথ।

কিন্তু অভিজিৎ না জানলেও দুর্গামোহন জানেন শুধু একটি ম্যানেজার এনে বসালেই সমস্যা মিটবেনা। এই পরিবারের একটি নিজস্ব চিন্তাধারা আছে; তার সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে বাইরে থেকে যেই আসুক বরাবর বাইরেই থেকে যাবে। শত চেষ্টাতেও সে অভিজিতের অভীপ্সিত পথে চলতে পারবেনা। বাঁড়ুয্যে বাড়িকেও এগিয়ে এসে দাঁড়াতে হবে তার পিছনে। হালটা এসে কেউ ধরবে, তবে তো দাঁড়ীর কাজ।

বৌরাণী ছাড়া তেমন আর কে আছে এই বৃহৎ পুরীতে?

তাই দুর্গামোহন চেয়েছিলেন একেবারে গোড়া থেকেই তাঁকে বেঁধে রাখা, যাতে করে, অভি যদি একদিন তার ঐ বেনারসী বাহনটিকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়, এখানে কোনো ভ্যাকিউয়াম বা শূন্যতার সৃষ্টি না হয়।

হেডমাষ্টারমশাই-এর প্রস্তাবে অভিজিতের সারামন যে সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছিল, সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেও তো এই চায়। বৌরাণী যেমন ছিলেন তেমনি থাকুন বাঁড়ুয্যে বাড়ির দায় দায়িত্ব নিয়ে। সে তো এসেছে শুধু দুদিনের তরে; তিনি অমন করে ডেকেছেন, তাই! তার এই মনোগত ইচ্ছাটা সে দুর্গামোহনের কাছে ব্যক্ত করেছিল একদিন। তিনিই বরং বলেছিলেন, কিন্তু ওঁর দিকটাও তো দেখবার আছে। বিধবা মানুষ, একটি সন্তান পর্যন্ত নেই, উনিই বা কার জন্যে চিরটা কাল এ ঝঞ্চাট পোহাতে যাবেন?

এর কোনো উত্তর নেই। তাই অভিজিৎকে সেদিন নীরব থাকতে হয়েছিল। আজ সেই মাস্টার মশায়ের কাছ থেকে যখন অন্য সুর শুনতে পেল, ভিতরে ভিতরে আশ্চর্য না হয়ে পারল না; কিন্তু সব বিস্ময়কে ছাপিয়ে গেল আনন্দ।

'নারী-ম্যানেজার' সম্পর্কে মহামায়ার মনোভাব অনুকূল হবে কিনা সেবিষয়ে অভিজিতের রীতিমত সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখানেও তার বিস্ময়ের অবধি রইল না। মহামায়া অবশ্য তাদের 'বোর্ডে' থাকতে রাজী হলেন না, হেডমাস্টার মশায়ের অনুরোধের পরেও পাশ কাটিয়ে গেলেন। অভিজিতের উৎসাহে কিছুটা ভাঁটা পড়ল। মনে করল, আসলে এ ব্যাপারে বৌরাণীর মনোগত সমর্থন নেই, শুধু দেওরের ইচ্ছায় সায় দিয়ে যাচ্ছেন। দুর্গামোহন তার বিরস মুখের দিকে চেয়ে মনের কথাটা ধরতে পারলেন। বললেন, কিছু ভেবোনা। বিধাতা-পুরুষ স্বয়ং আমাদের পক্ষে। এখন হেরে গেলেও শেষ পর্যন্ত আমরা ঠিক জিতে যাবো।

অভিজিতের সপ্রশ্ন চোখের দিকে চেয়ে যোগ করলেন, বুঝতে পারছ না? 'কৌতূহল' বলে একটা জিনিস আমাদের সৃষ্টিকর্তা অল্প-বিস্তর সব মানুষের মধ্যেই দিয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের বেলায় অল্প, ওঁদের বেলায় বিস্তর, বিশেষ করে নিজেদের সম্বন্ধে যাকে বলে, দুর্নিবার। একজন স্ত্রীলোক আরেকজন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নির্বিকার হয়ে থাকবেন, এটা কখনই সম্ভব নয়। বরং আমরা যেখানে ক্যাণ্ডিডেটের লেখাপড়া কাজকর্ম কিংবা বড় জোর ঘরের খবর নেবো, উনি সেখানে তার হাঁড়ির খবর পর্যন্ত এগিয়ে যাবেন। তার আভাস তো এখনই পাওয়া গেল। শুনলে না? সে কুমারী না

বিবাহিতা, কোথায় থাকবে—এসব নিয়ে এখনি মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন।

হলধর যখন নীহারকে নিয়ে ভিতর মহলের দিকে চলে গেল দুর্গামোহন অভির দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, দেখলে তো ?

"ওটা জলযোগের ব্যাপার।"

"আহা, ঐ জলযোগটাই তো আসল যোগ। এবিষয়ে পূব-পশ্চিমে বিশেষ তফাৎ নেই। ইউরোপ আমেরিকায় কূটনৈতিক কথাবার্তা চালাবার জায়গা হল লাঞ্চ বা ডিনারটেবিল, আফিস নয়। আমাদেরও তেমনি খাবারঘর। চর্ব্যচুষ্যের রস না পড়া পর্যন্ত রসনা পুরোপুরি খোলেনা; বিশেষ করে নতুন লোকের। বৌরাণী সেটা জানেন। আমরা পুরনো হলেও 'ইতরজন।' সুতরাং—এই যে, বলতে না বলতেই বৃহৎ থালা হস্তে হলধরের প্রবেশ।"

দুর্গামোহনের ইচ্ছা ছিল বৌরাণীর সঙ্গে আরেকবার দেখা করে যাবেন এবং সেই সূত্রে তার মনোভাবটা জানবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ওদিকে জলযোগ ইত্যাদির পর্বটি শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যাবে বুঝতে পেরে উঠে পড়লেন। অভিকে বলে গেলেন যদি সম্ভব হয় বৌরাণীর কাছে যেন কথাটা পেড়ে দেখে। একবার যাকে বলে, সাউণ্ড করা। অভির নিজেরও সে বিষয়ে কৌতূহল কম ছিলনা। কিন্তু প্রসঙ্গটা তার তরফ থেকে তুলবার দরকার হলনা। সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফিরলে বৌরাণী এলেন তার ঘরে এবং তাঁর প্রথম প্রশ্ন হল, কেমন দেখলে ?

—ওটা তো আমার প্রশ্ন।

বৌরাণী মুহূর্ত কাল চুপ করে থেকে অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, বেশ মেয়েটি।

"মেয়েটি তো বেশ বুঝলাম, কিন্তু ম্যানেজারটি কি রকম হবে বলে মনে কর ?"

"সে-সব আমার দেখবার কথা নয়। আমি শুধু মেয়েটিকে দেখেছি।"

"ব্যস ? এতক্ষণ ধরে তাহলে কী সব কথা হল তোমাদের ?"

"অনেক কথা। তোমরা তা বুঝবেনা।"

ডান হাতের আঙ্গুলগুলোয় একটা নৈরাশ্যের ভঙ্গি করে অভিজিৎ শুষ্ক কণ্ঠে বলল, তাহলে আর কী সুবিধে হল বল ? মনে করেছিলাম, এ ব্যাপারে তোমার অনেকখানি সাহায্য পাওয়া যাবে ।

বৌরাণী এগিয়ে এসে অভির পিঠে হাত রেখে হাসি মুখে বললেন, পাবে গো পাবে। আমার যেখানে দরকার আমি ঠিক এগিয়ে আসবো। এবার বলতো, তোমার কেমন লাগল ?

"আমাদের তো মোটামুটি ভালোই লাগল।"

"ব্যস, তবে আর কথা কী ?"

॥ ৮ ॥

কাছারি আর বসেনা। কিন্তু কাছারি ঘরটির কোনো রদবদল হয়নি। এক দিক জুড়ে সেই বিস্তীর্ণ ফরাস, তার উপরে বিশাল তাকিয়া, গাঢ়লাল মখমলের উপর সূক্ষ্ম মলমলের ওয়াড়। আগে রোজ পাল্টানো হত, এখন কদিন অন্তর। কিন্তু ঝাড় পোছ পড়ে প্রত্যহ। সকাল সন্ধ্যায় আলো জ্বলে, ধুনো পোড়ে। কর্তার সেই রূপোর গড়গড়াটি তেমনি আছে, নির্দিষ্ট স্থানে বসানো। নিয়মিত ঘষামাজায় উজ্জ্বল।

এ বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ আছে বৌরাণীর। নিজে এ দিকে আসেন না, কিন্তু হলধরকে প্রায়ই মনে করিয়ে দেন—সদর মহলে গিয়েছিলি ?

"এই তো এই মাত্তর সব সাফ-ঠাফ করিয়ে এলাম।"

'সদর মহল' বলতে এখন ঐ কাছারি ঘরটাই বোঝায়। আর সব তো বন্ধ। শুধু কোণের দিকের দপ্তর খানায় জন কয়েক আমলা বসে। ইদানিং অবশ্য আর একটা ঘর খোলা হয়েছে, 'ছোটবাবুর' জন্যে, আজকালকার ধরণে চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো, তার ঝাড়াঝুড়ি করে কিশন। হলধরের উপরে সবটারই দেখাশুনোর ভার, কিন্তু বৌরাণীর আদেশে তাকে বিশেষ নজর দিতে হয় কাছারি ঘরে। ঐটিই যেন বাঁড়ুয্যেবাড়ির প্রতীক। ঐখানেই তার পুরাতন রূপটি বেঁচে আছে! শুধু আছে নয়, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—বৌরাণীর আদেশের সেইটাই বোধহয় অন্তর্নিহিত অর্থ।

তার ঠিক পাশের কামরাটি, যেখানে ইন্দ্রজিৎ বসত, বরাবর তালাবন্ধ রয়ে গেছে। বাঁড়ুয্যে বাড়ির ইতিহাসে তার স্থানও কম নয়। কর্তার জীবদ্দশাতেই জমিদারি প্রশাসনে অনেক খানি ক্ষমতা তাঁর ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় ওখানে চলে গিয়েছিল। সে ক্ষমতার প্রয়োগও চলত ওখানকার অপেক্ষাকৃত ছোট ফরাস থেকে, কর্তার হুকুমের অপেক্ষা করত না। পুরনো আমলের সকলেই তা জানে। হলধরেরও আজানা নয়। ইন্দ্রজিৎ বেঁচে থাকতেই সে এ বাড়িতে এসেছে, দেখেছেও অনেক কিছু। ওটাও তো

কাছারি ঘর। বড়বাবু বসতেন ওখানে। অথচ কোনো দিনই খোলা হয় না, ঝাঁট পাট পড়েনা। বৌরাণীও এ সম্বন্ধে নীরব। ব্যাপারটা মাঝে মাঝে কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়েছে হলধরের।

একদিন কী খেয়াল হল। বৌরাণীর হাত থেকে 'কাছারি ঘরের' চাবিটা নিতে গিয়ে বলল, বড়বাবুর ঘরের চাবিটাও দিন। অনেকদিন ঝাঁট-পাট পড়েনি।

বৌরাণী চলে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়ালেন। সারা মুখময় কিসের একটা গাঢ় ম্লান ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই যেতে যেতে সহজ সুরে বললেন, আচ্ছা সে পরে হবে। চাবি-টাবিগুলো কোথায় কোনটা আছে, খুঁজে দেখতে হবে তো।

হলধর বুঝল যে কোনো কারণেই হোক, ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন বৌরাণী। চাবি খুঁজে দেখাটা কোনো সমস্যাই নয়। হলেও তার সমাধান এখখনি হতে পারে। শুধু হুকুমের অপেক্ষা, বাকীটুকু তো তার কাজ। তার জন্যে বৌরাণীকে মাথা ঘামাতে হবে না।

কী সেই কারণ যার জন্যে 'বড়বাবুর' কাছারি ঘরটা খুলতে চান না বৌরাণী, হলধরের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে তা জানবার কথা নয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর বুদ্ধির অধিকারী যারা তাদের কাছেও এটা চিরদিন অজ্ঞাত থেকে যাবে। অন্যের কথা থাক, বৌরাণী নিজেও কি জানেন তাঁর মনের খবর? একি তাঁর অভিমান না অভিযোগ? স্বামীর কাছ থেকে যে তাচ্ছিল্য-মিশ্রিত স্নেহটুকু সম্বল করে তিনি আকৈশোর এই বৃহৎ প্রাসাদের একান্তে শুধু অন্তঃপুরের শোভা বর্ধন করে এসেছেন তার সঙ্গে কি এর কোনো যোগ আছে? না, এটা সেই জোর করে ডেকে আনা অকাল মৃত্যুর নির্মম স্মৃতিকে আড়াল করে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস? যে ক্ষত সে রেখে গেছে তাকে লুকিয়ে রাখবার নিস্ফল চেষ্টা? কিংবা এ হয় তো এক ধরণের প্রতিবাদ। স্বামীর ঐ কাছারি ঘরটাকে স্বীকৃতি দিতে চান না বৌরাণী। ওর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ঔদ্ধত্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, দম্ভ, পিতার প্রতি উপেক্ষা, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সেই সব পুঞ্জীভূত অন্যায় পড়ে থাক ঐ রুদ্ধ ঘরের অন্ধকারে। লুপ্ত হয়ে যাক অবহেলা, অস্বীকার ও বিস্মৃতির অন্তরালে।

হলধর আর কোনোদিন ঐ ঘরের চাবি চাইতে আসে নি, বৌরাণীরও সেটা খুঁজে দেখবার ফুরসত হয় নি।

অনেকদিন পরে তার প্রয়োজন দেখা দিল অন্য সূত্র থেকে এবং সেটা জানাবার জন্যে হলধরকেই আবার আসতে হল বৌরাণীর কাছে। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, বড়বাবুর কাছারি ঘরের চাবিটা কোথায় আছে মা ?

"কেন ?"

"ছোটবাবু চাইছেন।"

ঐ 'কেন'রই পুনরুক্তি করতে যাচ্ছিলেন বৌরানী। কী মনে করে থেমে গেলেন। হলধরের মুখেই শোনা গেল—"নতুন ম্যানেজারের অফিস হবে ওখানটায়। চেয়ার টেবিল, আরো অনেক আসবাব পত্তর এসে গ্যাছে। ফরাস সরিয়ে ফেলতে বলেছেন ছোটবাবু।"

বৌরাণীর মুখে আজ আর কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। আর কোনো প্রশ্নও করলেন না। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ঘর থেকে চাবিটা এনে হলধরের হাতে দিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরো কিছু নতুন খবর দিল হলধর। ঐ ঘরের উত্তর দেয়ালে দরজা ফুটিয়ে ওর সঙ্গে লাগোয়া একটা চানের ঘর তৈরি হচ্ছে, 'অ্যাটাস বাথরুম' না কি যেন বলছিল কিষণ, কাশীর বাড়িতে যেমন করে নিয়েছেন ছোটবাবু। তার সব সরঞ্জামও শীগগিরই এসে পড়বে।

বৌরাণীর কানে এসব কথা গেল কি না বোঝা গেল না। বারান্দার রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সদর মহলের খানিকটা অংশ ওখান থেকে চোখে পড়ে। সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন। হলধর চলে গেল। বৌরাণীরও তখন অনেক কাজ, ঝি চাকরেরা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সে সব জেনেও তৎক্ষণাৎ নড়তে পারলেন না। চোখ দুটিতে কেমন একটা উদাস দৃষ্টি ফুটে উঠল। একটা নিঃশ্বাস পড়ল, হয়তো অজ্ঞাতসারে। পরক্ষণেই যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন। যে বহু দূরাগত স্মৃতির টুকরোগুলো মনের মধ্যে ভিড় করে আসছিল, সব দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে নীচে নেমে গেলেন।

দৃশ্যতঃ ব্যাপারটা কিছুই নয়। একটা ঘরের কিছু অদলবদল, পুরনো আসবাবের জায়গায় নতুন সরঞ্জাম। তবু তার মধ্যে কোথায় যেন কী একটা

বিপ্লব ঘটে গেল। এই সামান্য বিবর্তনের ভিতর দিয়ে চিরদিনের তরে হারিয়ে গেল একটা মানুষ, মুছে গেল অনেক দিনের অনেক স্মৃতি।

ম্যানেজার কোথায় বসবে তা নিয়ে আগের দিনই কথা হয়েছে অভিজিতের সঙ্গে। বৌরাণীর প্রস্তাব ছিল, মাঝের মহলে কোনো একটা ঘর। বলেছিলেন, "তাহলে কখনো-সখনো আমিও গিয়ে একটু আড্ডা জমাতে পারবো ওর দপ্তরখানায়, কিংবা ফাঁক বুঝে ওকেও মাঝে মাঝে টেনে আনা যাবে আমার এই রান্না-ভাঁড়ারের দপ্তরে।"

অভিজিৎ ভাবছিল। তার মুখের দিকে চেয়ে যোগ করলেন, "অসুবিধে আছে কিছু?"

"আমার তরফ থেকে একটুও না। ম্যানেজারকে তোমার চার্জে এনে ফেলতে পারলে আমি বরং বেঁচে যাই। কিন্তু—"

মৃদু হেসে বৌরাণীর মুখের পানে তাকিয়ে বলল, তোমার ঐ শম্ভুচরণ অ্যাণ্ড কোম্পানী যখন ডেপুটেশন শুরু করবে, কিংবা বিক্ষোভ মিছিল—

"রক্ষে কর বাপু। দরকার নেই আমার আড্ডায়। তুমি ওকে তোমার ঐ সদরের কোথাও নিয়ে বসাও।"

'কোথাও' বলতে এ বিশেষ ঘরটির কথা বৌরাণীও ভাবেন নি, ওর যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, অভিজিতেরও মনে হয় নি।

ওদিকে নতুন ম্যানেজার-নিয়োগের খবরটা শাখায় পল্লবে বিস্তৃত ও নানা রংএ রঙীন হয়ে যথা সময়ে কলোনীতে গিয়ে পৌঁছেছে এবং বলাবাহুল্য প্রচুর কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে কৌতুকের মাত্রাটা স্বভাবতই বেশী। লোন, রিলিফ ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারী অফিসে যাতায়াত কলোনীর বাসিন্দাদের লেগেই থাকে। সেখানে সারি সারি চেয়ার টেবিলের কোনো একটিতে হঠাৎ একটি নারী মূর্তি প্রথম প্রথম ওদের চমক দিত। ইদানিং আর দেয় না। আগে আগে থমকে দাঁড়াত, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, এ-পাশে ও-পাশে পুরুষের ভিড়, মাঝখানে বসে একটি তরুণী মাথা নীচু করে বেঁটে ফাউণ্টেন দিয়ে একমনে কি সব লিখে চলেছে মোটা মোটা খাতার পাতায়, কোনো দিকে ফিরে চাইছে না। তার সহকর্মীরা

নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব ঠাট্টা তামাসা করছে, চা খাচ্ছে, সিগারেট টানছে। ঐ একা মেয়েটির মুখে কোনো কথা নেই। ও শুধু কাজ করে চলেছে।

এ দৃশ্য আর এখন ওদের টানে না। এক পলক দেখেই এগিয়ে যায়। আগে এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে নানা রসালাপ হত, তরুণেরা ঐ চাকরে মেয়েকে নায়িকা করে মনে মনে রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করত। এখন আর ওগুলো কোনো 'ঘটনা' নয়। কেউ যদি এসে খবর দেয়, আরো তুটো মেয়ে দেখে এলাম ফুড্ অফিসে, বন্ধুরা বিশেষ উৎসাহ দেখায় না। ওটা আর 'খবর' নয়, ওর মধ্যে নতুন কিছু নেই।

কিন্তু এখানকার কথা আলাদা। সেকেলে জমিদার; যাদের বাড়ির মেয়েরা এখনো লোকের সামনে বেরোয় না, তাদেরই সেরেস্তায় ম্যানেজার হয়ে এল একটি নারী, তাও বৃদ্ধা নয়, প্রৌঢ়া নয়, যুবতী, (নীহার যেদিন ইণ্টারভিউ দিতে আসে, সেই দিনই কারো কারো নজরে পড়ে গিয়েছিল) এটা একটা রীতিমত তাজ্জব খবর বৈকি! একেবারে কানের গোড়ায় বসে এ সম্বন্ধে কেউ উদাসীন থাকতে পারে না! "কে এই মেয়েটা"—তাই নিয়ে স্বভাবতই জোর গবেষণা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং স্ত্রী-পুরুষ যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রায় সকলেই একটা সিদ্ধান্তে এসেছিল—এর মধ্যে 'ব্যাপার' আছে! ব্যাপারটা কী জাতীয়, সে বিষয়ে মতভেদ ছিল। তরুণ মহল স্বাভাবিক নিয়মেই ধরে নিয়েছিল, নতুন মালিক ও নতুন ম্যানেজারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অন্য সম্পর্ক আছে যা নতুন নয় এবং নিছক চাকরি-ঘটিত নয়। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মহল বলাবলি করছিল, এর ভিতরে নিশ্চয়ই কোনো 'মতলব' আছে। ঐ 'ছোটবাবু' নামক ব্যক্তিটিকে বাইরে থেকে যতখানি ভালমানুষ বলে মনে হয়, আসলে সে তা নয়। হাজার হলেও জমিদারের ছেলে!—এই মেয়ে ম্যানেজার বসিয়ে হয়তো কৌশলে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়. কট্টর নায়েবটাকে দিয়ে যা হচ্ছিল না। সুতরাং শুরু থেকেই সাবধান হওয়া দরকার।

শম্ভুচরণের মনেও যে এমনি একটা সংশয় জাগেনি তা নয়। কিন্তু তুজন প্রবীণ বাসিন্দা যখন তার কাছে এসে ঐ দিকে ইঙ্গিত করল, সে সেটাকে উড়িয়ে দিতে চাইল—

"আপনাদের দেখছি সব তাতেই সন্দেহ। ওরা যাকে খুশি ম্যানেজার করুক না। তাতে আমাদের কী?"

"না, বাবা," মাথা দুলিয়ে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল বৃদ্ধদের একজন, "মাইয়া মানুষ জাতটারে বিশ্বাস নাই। ওরা সব পারে। জমিদার নিজে যেডা পারবে না—এট্টু লজ্জা আছে তো—ঐ মাইডারে দিয়া করাইয়া নেবে। ওগো তো চোখের পরদা নাই।"

শম্ভু সে জাতীয় কোনো সম্ভাবনাকেও আমল দিল না। অন্য কথা দিয়ে প্রসঙ্গটাকে হালকা করে দিল—"দেখবেন, এসব কথা যেন আবার জ্যেঠিমার কানে না যায়। এমনিতেই তো—"

"ক্যান? কানে গেলে হইবোডা কী? 'জ্যেঠিমা' আমার কী করবে? ভিটা-মাটি জমি-জিরাত থুইয়া আইছি বইল্যা কি নিজের পরিবাররে শাসনে রাখবার ক্ষ্যামতা নাই?"

সেটা যে বিলক্ষণ আছে স্বীকার করল তার সঙ্গীটি। বলল, সে কথা তোমার পরম শত্তুরেও কইতে পারবে না। তবে ক্ষ্যামতাডা ও পক্ষেও কম নাই। সারা কলোনীর লোকেই তা জানে। কী কও শম্ভু?

ওসব কথা থুইয়া দাও। ঘর-সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সকলেরই আছে। তা দিয়া কাম কী? এই ম্যানেজার ঠাইরেনটি আসাতে আমাগো অবস্থাডা কী রকম দাঁড়াবে তাই ভাবো। তুমি একবার যাবা নাকি শম্ভু?

"কোথায়?"

"ঐ ঠাইরেনের কাছে।"

"তার কাছে কেন যাবো? আমাদের যা কিছু কারবার খোদ মালিকের সঙ্গে। সেখানেই বরং একবার যাওয়া যেতে পারে।"

বৃদ্ধরাও সে সম্বন্ধে একমত, দেখা গেল।

এতদিন ধরে বাঁড়ুয্যেদের এই খালিজমিতে তারা ঘরদোর তুলে বসবাস করছে। কিন্তু এখানে আইনতঃ তাদের কোনো স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই। তারা জবর দখলকারী, স্কোয়াটার। সে কথা এরাও জানে এবং মালিক পক্ষও তাদের নানাভাবে জানিয়ে দিয়ে এসেছেন। এদের বিরুদ্ধে অবৈধ প্রবেশের মামলা দায়ের হয়েছে। এরা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেনি। সম্ভবতঃ কোর্টের আদেশ বলেই পুলিশ এসেছে এদের উচ্ছেদ করতে। ছেলে মেয়েদের

মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলেও কোনো সংঘর্ষ ঘটেনি। ঘটতে দেয়নি এদের যারা নেতৃস্থানীয়, তারা। বিশেষ করে শম্ভুচরণ। পুলিশকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তারা উঠবেনা, ঘর দোর ভেঙে তাদের সামান্য জিনিস পত্র যা আছে সব নষ্ট করে, মারধোর করে তাড়িয়ে দিলেও তারা এই জায়গা ছেড়ে দেবেনা। পুলিশ আর অগ্রসর হয়নি। ফিরে গেছে। সম্ভবতঃ সেটাই ছিল সরকারের সাধারণ নীতি, যদিও বলপ্রয়োগের ঘটনাও সেদিন কম ঘটেনি।

এখানে যারা মালিক পক্ষ তারাও দাঙ্গা হাঙ্গামা চাননি। নায়েব চেয়েছিলেন আইনের সাহায্যে অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করতে, জমিটা উদ্ধার করতে। বৌরাণীও তাঁকে ততটুকুই সমর্থন করেছিলেন।

তারপর থেকে জমিদার বা সরকার কারো তরফ থেকেই সক্রিয়ভাবে এদের তুলে দেবার কোন চেষ্টা হয়নি। এরা নির্বিবাদেই বাস করছে। তাই বলে এই অবস্থাটা যে মালিক পক্ষ মেনে নিয়েছে তারও কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু প্রীতির সম্পর্কও নেই। উভয় তরফে জমে আছে ক্ষোভ, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস। ভিতরে ভিতরে চলছে নিঃশব্দ ঠাণ্ডা লড়াই।

কলোনীর বাসিন্দারা এবিষয়ে নিশ্চিত যে তাদের উৎখাত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। জবর দখল হলেও এটা স্থায়ী দখল। কিন্তু তাতেই তারা আশ্বস্ত নয়। তারা চায় অধিকার। যে জমি তাদের আয়ত্তে এসেছে তার উপরে স্বামিত্বের বিস্তার। এখানটায় আমি আছি, কেউ আমাকে হটাচ্ছে না, এইটুকুই যথেষ্ট নয়, সেই থাকায় আমার হকদাবি সাব্যস্ত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে যতক্ষণ না নিশ্চিত হতে পেরেছি, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত নই। বিপন্মুক্ত জীবন যাত্রার মধ্যেও কলোনীর মন তাই আজ চিন্তামুক্ত নয়। ছোট বড় সকলেই চাইছে একটা বোঝা পড়ায় আসতে। এই অনিশ্চিত অবস্থা আর কতদিন চলবে? যতদিন প্রকাশ্য বিরোধ চলছিল, ততদিন সেই উত্তেজনাই সকলের মনকে অধিকার করে রেখেছিল। তখন একমাত্র চিন্তা ছিল প্রতিরোধের চিন্তা। আজ আর তার প্রয়োজন নেই। এখন অন্য ভাবনা। এই অনিশ্চয়ের অবসান।

অভিজিৎ আসবার পর ওপক্ষের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা অনুকূল পরিবর্তন লক্ষ করছিল কলোনীর লোকেরা। উপরের হলঘরে গানের

আসরেই তার প্রথম আভাস। তারপর নায়েবের পদত্যাগ। সেটা যে স্বাভাবিক কারণে অর্থাৎ কেবল মাত্র বয়োধর্মে ঘটেনি (নায়েব-জাতীয় চাকরিতে অবসর গ্রহণের কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই) তা ওরা টের পেয়েছিল। বিশেষ করে এই দুটো ঘটনা থেকেই ওরা বুঝতে পারছিল ওদিকের হাওয়া বদলাচ্ছে। সুতরাং তাদের তরফেও পলিসির মোড় ফেরাতে হবে। বিবাদ বিসংবাদের পথে না গিয়ে বৈঠক-আলোচনার রাস্তা ধরেই বোধহয় বেশী ফললাভের সম্ভাবনা। কিন্তু সেটা কোথা থেকে কেমন করে শুরু করা যায়?

কলোনীর অদূরে 'মাষ্টার মশাই' নামক বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে সেখানকার অধিবাসীরা যে লক্ষ করেনি তা নয়। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এদের বিশেষ ঔৎসুক্য বা কৌতূহল ছিলনা। শম্ভুর সঙ্গে হয়তো সামান্য পরিচয় ছিল এই পর্যন্ত। জমিদার বাড়ির সঙ্গে ওঁর যে কোনো যোগ আছে তেমন কোনো লক্ষণ ওদের নজরে আসেনি। আসলে সেটা ছিলনা বললেই হয়। সে যোগসূত্র স্থাপিত হল অভিজিৎ আসবার পর এবং সেই সে বিষয়ে অগ্রণী।

মাষ্টার মশাইয়ের বাড়িতে অভিজিতের আসা-যাওয়া ওদের চোখ এড়ায়নি। গঙ্গার ধার দিয়েই তো পথ এবং সেখানটাই নিষ্কর্মা কলোনী-বাসীদের প্রধান আড্ডা স্থল। শম্ভুচরণও দেখেছে কিন্তু শুধু এই ব্যাপারটার উপরে কোনো গুরুত্ব আরোপ করেনি। একসময়ে এই স্কুলেই পড়ত। অনেকদিন পরে বাড়ি এসে পুরনো মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ স্বাভাবিক সৌজন্যের অঙ্গ। তার বেশী এর মধ্যে আর কী থাকতে পারে?

পরের সম্বন্ধে আগ্রহ গ্রামবাসীদের মধ্যে চিরকালই অতিমাত্র। কলোনীবাসীরা সেদিক দিয়ে আরো একধাপ এগিয়ে আছে। করণীয় বলতে যা বোঝায় তা এখানে অতি সামান্য, এবং অবসর প্রচুর। আশপাশের হাঁড়ির খবর সংগ্রহ ছাড়া তার প্রয়োগের ক্ষেত্র কোথায়? সুতরাং দুর্গামোহন এবং অভিজিতের সম্পর্কটা যে কেবলমাত্র শিক্ষক ছাত্রের সাধারণ মেলামেশা নয়, এ তথ্যটি ধরা পড়তে দেরি হোল না। তার উপরে শম্ভুচরণের অনুসন্ধিৎসা ক্রমশঃ আবিষ্কার করে ফেলল যে, বর্তমানে জমিদার পক্ষের পলিসি-নির্ণয়ের আসল স্থানটি ঐ প্রাক্তন হেডমাষ্টারের বৈঠকখানা।

এ বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিত হয়েই সে একদিন হেডমাষ্টারের শরণ

নিয়েছিল। তিনি ব্যাপারটা এড়িয়ে যান নি, তাঁর যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে শম্ভুচরণকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, "অভির সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলুন না ?"

ওদের ভিতরে সেই আয়োজন যখন চলছে, কে কে যাবে, কী কী দাবি নিয়ে যাবে, কী ভাবে সেগুলো উত্থাপন করা হবে—এ সব যখন ঠিকঠাক করা হচ্ছে, তখন এল ঐ ম্যানেজার-ঘটিত খবর। কলোনীর মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। আসল মিশনটা ছাপিয়ে ওদের মনোযোগ চলে গেল ঐ বিশেষ ঘটনাটির দিকে।

শম্ভুচরণ কিছুটা সময় নিল এবং ঘটনার প্রথম চমক কেটে যাবার পর স্থির করল প্রথম দফায় সে একাই যাবে অভিজিতের কাছে। ওখানকার হালচালটাও বোঝা যাবে।

অভিজিৎ তার অফিসেই ছিল। বাইরে থেকে চেনা গলার সাড়া পেতেই বলে উঠল, আসুন, আসুন।

শম্ভু ভিতরে ঢুকে দেখল টেবিলের পাশে একটি তরুণী বসে আছে। অভিজিৎ হাসি মুখে বলল, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই, মিস্ নীহার চ্যাটার্জী, আমাদের এস্টেটের ম্যানেজার, শ্রীশম্ভুচরণ—

হঠাৎ থেমে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতেই শম্ভু যোগ করল "সরকার" !

অভিজিৎ একটু লজ্জিত হল—"মাপ করবেন। পদবীটা সেদিন শুনেও হঠাৎ মনে পড়ছিল না।....এই মাত্র এঁর কথাই বলছিলাম আপনাকে।"

শেষের কথাগুলো নীহারের উদ্দেশে।

পরিচয় করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নীহার মৃদু হেসে নমস্কার করল। শম্ভুচরণ হঠাৎ থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি হাতদুটো জড়ো করে একটুখানি তুলল, কপাল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলনা। ভিতরে ভিতরে কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠল। এ ঘটনাটির জন্যে সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

সে এসেছিল অভিজিতের কাছে। ম্যানেজারের সম্বন্ধে তার কৌতূহল কম ছিল না, সারা কলোনীতে এই কদিন ধরে তাকে নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণাও কম হয়নি। কিন্তু এমন আচমকা দেখা হয়ে যাবে এবং ভদ্রমহিলা

তাকে একটা নমস্কার করে বসবেন, এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত। দেখা একদিন হবে, ম্যানেজার হয়ে যখন এসেছেন, এবং তাদের তরফ থেকেই সে প্রয়োজন দেখা দেবে, এটা অবশ্য জানা ছিল। তার জন্যে মনে মনে একটা প্রস্তুতিও ছিল। কিন্তু মনে মনে তৈরী হওয়া এক, একেবারে মুখোমুখি এসে পড়া আর।

তাছাড়া, শম্ভুর চোখের উপর ছিল একখানি গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখ, নিজের প্রভুত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং দূরত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট,—রিলিফ অফিসে এবং উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জায়গায় যা সে দেখে এসেছে এতদিন। একটা কৃত্রিম কাঠকাঠ ভাব। পুরুষ কর্মীরা তবু দু-একটা বাড়তি কথা বলেন, মুখে কখনো কখনো একটু হাসির রেখাও দেখা যায়। কাজে না হোক, হাবভাব আচরণে সরকারী গণ্ডির বেড়াটা ক্ষণকালের জন্যে একটু যেন উঠে যায়। কিছুটা কাছে সরে আসেন। কিন্তু নারী অংশটির চারদিক ঘিরে অচল গাম্ভীর্য, আর বরফশীতল উদাসীনতা। কথা তাঁরাও বলেন, তবে তার প্রত্যেকটি প্রয়োজনের কাঠি দিয়ে মাপা এবং সরকারী পজিশনের বাটখারা দিয়ে ওজন করা।

এখানে যা দেখল শম্ভু, একেবারে আলাদা। কথাবার্তা অবশ্য কিছু হয়নি, দেখাও কয়েক নিমেষের। তবু তারই মধ্যে এই তরুণী মহিলাটির সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবটি চোখে না পড়ে পারে না এবং তার চেয়েও যেটা স্পষ্ট সেটি তার চোখে মুখে, হাসিটিতে, নমস্কারের ভঙ্গিতে সব মিলিয়ে একটি মোলায়েম স্পর্শ। খানিকটা অন্তরঙ্গতার আভাসও যেন রয়েছে তার মধ্যে। সে যেন অতিথি, বন্ধু। অথচ আসলে তো সে এবং গোটা কলোনীটা এদের প্রতিপক্ষ, শত্রু, একান্ত অবাঞ্ছিত। সদর নায়েবের কাছে এসে যখন দাঁড়াত, সেই চোখেই তিনি তাকাতেন ওর দিকে। মুখের পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠত। 'বেরিয়ে যাও' কথাটা মুখে উচ্চারিত না হলেও চোখ দুটো থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসত। সেও সোজা হয়ে দাঁড়াত দৃপ্ত প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। সম্পর্কটা উভয় তরফেই ছিল সোজা ও সরল। সেইজন্যে তার দিক থেকেও দ্বিধা সঙ্কোচের কোনো বালাই ছিল না।

আজ হঠাৎ একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গেল শম্ভুচরণ। আরো ঘাবড়ে গেল এই শুনে যে এইমাত্র তার কথাই হচ্ছিল এদের মধ্যে। কে জানে কী

বলছিলেন অভিজিৎবাবু এই অপরিচিতা তরুণীর কাছে, তার কী পরিচয় পেলেন তিনি, মনে মনে কী ধারণা গড়ে তুললেন ?

এদের নিজেদের কথাবার্তার মধ্যে এখানে তার থাকাটা উচিত হবে কিনা যখন ভাবছে, অভিজিৎ বলল, দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন না।

তার টেবিলের ডান ধারে বসে ছিল নীহার। বাঁ ধারের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। ম্যানেজারের মুখোমুখি। শম্ভুর ইচ্ছা হল, বলে—'আমি বরং অন্য এক সময়ে আসবো', কিন্তু কথাকটি তাড়াতাড়িতে ঠিক গুছিয়ে তুলতে পারল না। সসঙ্কোচে এগিয়ে গিয়ে সেই চেয়ারটায় বসে পড়ল।

এ ব্যাপারেও শম্ভুচরণ পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারছিল না। এ ঘরে সে কখনো আসেনি। অভিজিতের কাছেও এই প্রথম আসা। নায়েব বা অন্যান্য আমলাদের কাছে যখনই এসেছে, ওদিকের ঐ কাছারি ঘরে। তারা কেউ কোনদিন তাকে বা তার সঙ্গীদের বসতে বলেনি। সেখানে আসন বলতে ফরাস, ওরা নিজেরা যেখানে বসে, আর তার উল্টো দিকে দেয়ালের গা ঘেঁষে কয়েকখানা বেঞ্চি।

শম্ভু নিজে থেকেই সেখানে গিয়ে বসেছে, এবং লক্ষ করেছে সেটাও কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নয়, যদিও মুখে তারা কিছু বলেনি।

আজ নায়েব বা আমলা গোমস্তা নয়, তাদের মনিব এবং এই বাড়ি ও এস্টেটের মালিক তার নিজের পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে অনুরোধের সুরে বলছেন, 'বসুন', এই পরিবর্তনটা তাকে যেন ঠিক সহজ হতে দিচ্ছিলনা। বসবার পরেই অবশ্য সে ভাবটা অনেকখানি কাটিয়ে উঠল। অভিজিৎই প্রথম কথা তুলল, তারপর কী খবর, বলুন।

"আমাদের আর কী খবর ! আপনার কাছে এলাম—"

"ভালোই করেছেন। আপনাদের ঐ কলোনীর ব্যাপার নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম। আপনি এসে পড়াতে সুবিধে হল। তার আগে বলে রাখি, এর পরে আপনাদের যা কিছু কথাবার্তা কাজকর্ম, তার জন্যে আর আমার কাছে আসতে হবেনা। সব ওঁর সঙ্গে।"

চোখের ইঙ্গিতে নীহারকে দেখিয়ে দিল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে শম্ভুও তার মুখের দিকে তাকাল। নীহার চোখ তুললনা, শুধু একটু হাসল। স্বভাবতই তার মনে হল, এ কথার কোনো বিশেষ অর্থ নেই, এ একটা

মনিবসুলভ মামুলী সৌজন্য মাত্র। সব মনিবই তার কর্মচারীদের দেখিয়ে বলে থাকেন, আমি কিছু নই, এরাই সব। তার মানে এ নয় যে তিনি তার সমস্ত ক্ষমতা তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

অভিজিৎ বলল, উনি কিন্তু আপনাদের অঞ্চলের লোক। কথা শুনে অবিশ্যি বোঝা যায়না। তবে আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই 'ছ্যাশের ভাষা' চালাতে পারবেন। কী বলেন, মিস চ্যাটার্জি? কোথায় যেন বাড়ি ছিল আপনার?

হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল নীহারকে। উত্তরে তার মুখে প্রত্যাশিত হাসিটি দেখা গেলনা। মৃদুস্বরে বলল, নোয়াখালি।

"আপনার বাড়িও কি ঐ দিকে?" এবার শম্ভুর দিকে ফিরল অভিজিৎ।
—"আজ্ঞে না, আমার দেশ ছিল ফরিদপুর। তবে নোয়াখালির কিছু লোক আছে আমাদের মধ্যে।"

খবরটা শুনে নীহার চকিতে একবার চোখ দুটো তুলে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিল। দুজনের কেউ সেটা লক্ষ করল না। অভিজিৎ বলল, যাই হোক, আমি যেমন ওখানকার কিছুই জানিনা, শুধু ওখানটা নয়, এদিকটা সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান অতি সামান্য, ছেলেবেলা থেকে তো বাইরেই পড়ে আছি—মিস্ চ্যাটার্জি পদ্মার এপার ওপার গোটা বাংলা দেশের খবর রাখেন। সেটা দুতরফেই সুবিধে।

নীহার ও শম্ভু দুজনেই নীরবে বসে রইল। অভিজিৎ মিনিট খানেক অপেক্ষা করে শম্ভুর দিকে ফিরে বলল, তাহলে আপনারা কথাবার্তা শুরু করুন। এখানেও করতে পারেন। আমি এবার উঠবো। কিংবা মিস্ চ্যাটার্জি, আপনি বরং ওঁকে আপনার ঘরে—

কথাটা শেষ করবার আগেই শম্ভু বলে উঠল, "আজ থাক। আরেকদিন আসবো।" বলেই উঠে দাঁড়াল এবং নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুটো একবার তুলেই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে মনে হল একটা কঠিন পরীক্ষার হাত থেকে বেঁচে গেছে! ঐ মহিলাটির সঙ্গে একান্তে কথাবার্তা বলার মত জোর তখন অন্ততঃ তার ভিতরে ছিলনা। নিজেকে অবশ্য বোঝাতে চাইল, এটা কোনো দুর্বলতা-ঘটিত ব্যাপার নয়, আসলে সে প্রস্তুত হয়ে আসেনি। আজকের উদ্দেশ্য ছিল অভিজিতের কাছ থেকে এদিকের নতুন পরিস্থিতি

সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া, তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে কথাবার্তা নয়। কিন্তু অভিজিৎ যদি একা থাকত তাহলেও কি সে কোনোকথা না তুলে 'আজ থাক' বলে এমন করে বেরিয়ে চলে আসত? এ প্রশ্নটা মনের কোণে মাথা তুলে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে চাপা দেবার চেষ্টা করল। তবু সে রয়ে গেল। একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না। তার পক্ষে এটা যেন এক ধরনের হার। সে যে পালিয়ে এল সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে মহিলাটি, হয়তো মনে মনে হাসছে।

পথে যেতে যেতে নিজেকে দৃঢ় করে দাঁড় করাল ম্যানেজারের সামনে। কোনো রকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। ভুললে চলবে না, সে ওদের প্রতিপক্ষ এবং তার একমাত্র ভূমিকা লড়াই-এর ভূমিকা। তাদের বাঁচতে হবে এবং সে পথে প্রথম পদক্ষেপ মাথা গুঁজবার স্থান হিসেবে এই কলোনীতে নিজেদের কায়েম করা। একথা যদি সত্য হয় যে একটি মেয়েছেলেকে ম্যানেজার করে আনা মালিক পক্ষের একটা অপকৌশল —কলোনীর কেউ কেউ যা সন্দেহ করছে—সেটা ব্যর্থ করে দিতে হবে।

এই মুহূর্তে ঐ সন্দেহটা শম্ভুর মনেও ছায়া ফেলল। অভিজিৎ তাদের সম্পর্কে সব ভার ঐ ম্যানেজারের উপর ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াতে চাইছে কেন? হয়তো মনে করছে, মেয়ে মানুষের উপর এরা কোনো জোর খাটাতে পারবেনা, নরম হয়ে পড়বে, ঐ মোলায়েম হাসি এবং মিষ্টি কথা দিয়ে ওরা ওদের স্বার্থ সিদ্ধির সুবিধা করে নেবে। সে ধারণা যে কত বড় ভুল কদিনের মধ্যেই বুঝতে পারবেন ভদ্রলোক!

'অভিজিৎ বাবুর' আরেকটা কথাও শম্ভুর বিশেষ আশাপ্রদ বলে মনে হয় নি। তিনি এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন যেহেতু তার এই ম্যানেজারটি পূর্ব-বাংলা থেকে এসেছে, অতএব তাদের আপন জন, এবং তাদের উপর তার সহানুভূতির অভাব হবেনা। এ 'দেশে' উদ্বাস্তু হয়ে আসবার পর শম্ভুদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। কত ঘাটের জল খেতে হয়েছে! কত রকম মানুষের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে নিরাশ করেছেন তাঁরা, যাঁরা ওদের 'দেশের লোক', যাঁরা একদা ছিলেন ওপারের শাঁসালো মানুষ, এপারে এসেও শাঁস বজায় আছে। অর্থাৎ ঝড় উঠবার আগেই বর্ডার পার হতে পেরেছিলেন। ওখানে যা ছিল, হয় বিক্রী নয়তো এপারের সঙ্গে বিনিময়

করে জমি জমা ঘর বাড়ি করে গুছিয়ে নিয়ে বসেছেন। লাভ না হোক লোকসানও হয়নি। কেউ কেউ বরং লাভবানই হয়েছেন।

এই শেষের কোঠায় রয়েছেন একদল সরকারী চাকরে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—কোথায় অপ্‌ট্‌ করবে, 'পি' না 'আই'? পাকিস্তান না ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন? বেশিরভাগ হিন্দু লিখেছিল 'আই', মুসলমান লিখেছিল 'পি'। তুদলেরই ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। 'আই-ওয়ালারা এখানে এসে দেখল মাথার উপর থেকে একটা বড় দল 'পি' লিখে ও-পারে চলে গেছে। আর গেছে সাহেবরা। মোটা পেনসনের থলে হাতে নিয়ে সরে পড়েছে। সারি সারি অনেক আসন খালি। এদের দিয়েই তো সেগুলো ভর্তি করতে হবে। অতএব টপাটপ প্রমোশন। যারা নিচের তলায় হোচট খেতে খেতে এগুচ্ছিল এবং গোটা কয়েক ধাপ উঠতে না উঠতেই বিদায়ী পরোয়ানা নিয়ে সরে পড়তে হত, তারা এক লাফে উপর তলায় গিয়ে বসল।

ঠিক একই ইতিহাস ওপারের সরকারী মহলে।

পার্টিশান লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু তৈরি করেছে, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা শীল্ডের কালো দিকটা দেখেন। আর একটা রৌপ্যময় উজ্জ্বল দিকও আছে। তার উপর-সারি আলো করে রেখেছেন এই বন্টন-যজ্ঞের যাঁরা হোতা, অর্থাৎ উভয় তরফের রাজনীতির বড় বড় চাঁই, আর নিচের দিকে রয়েছে যাদের নাম ব্যুরোক্র্যাট। এই দলটিকে কোনদিন প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেননি নেতারা। তবু ফাঁকতালে এরাও কিছু কিছু সুবিধা পেয়ে গেল।

শম্ভুচরণদের মত যারা মিথ্যা মায়ার মোহেই হোক, কিংবা সুযোগের অভাবেই হোক সময়মত ভিটেমাটি ছাড়তে পারে নি, এবং সেই অপরাধে হঠাৎ ডানাভাঙ্গা ঝড়ো পাখীর মত দলে দলে ছিটকে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তারা স্বাভাবিক ভাবেই আশা করেছিল, তাদের যে সব ভাগ্যবান 'দেশের লোক' আগে এসে গুছিয়ে বসে গেছে তারা অন্ততঃ মুখ তুলে চাইবে। কিন্তু কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে দেখল তাদের আচরণ অনেকটা ভিড়-ঠেলা রেলযাত্রীর মত। কোনরকমে আগে উঠে কামরা দখল করতে পারলেই দরজা আগলে বলে, আর জায়গা নেই।

গঙ্গার দিক থেকে কলোনীতে ঢুকবার মুখে একখানা টালি ছাওয়া ছোট

ঘর, চাটাই-এর বেড়া, মেঝেটা মাটির। তার উপরে একদিকে একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল, একখানা চেয়ার, অন্য তিন দিকে দেয়ালের ধার ঘেঁষে কয়েকখানা বেঞ্চি। সবই এখানকার মিস্ত্রীদের হাতের তৈরী। এটা ওদের কলোনী পঞ্চায়েতের অফিস। সাধারণতঃ শম্ভুচরণই নিয়মিত বসে এখানে, টেবিলের টানায় তার কাগজপত্র থাকে, মাঝে মাঝে মিটিং হয়। সেটাও, সে যখন ডাকে। তা ছাড়া পাড়ার ছেলেদের প্রধান আড্ডার জায়গাও এই ঘরখানা, বিশেষ করে শম্ভু যখন থাকে না।

শম্ভু জমিদারদের কাছারি থেকে ফিরে এসে দেখল, বেঞ্চিগুলো ভর্তি। বেশির ভাগ বয়স্করাই সেখানে বসে। কিছু তরুণও রয়েছে। তাদের বাকী অংশটা ছড়িয়ে পড়েছে বাইরে। সচরাচর এ সব ক্ষেত্রে যখন কথাবার্তা চলে নতুন লোকের কাছে হঠাৎ মনে হবে তুমুল ঝগড়া বেধে গেছে। আসলে সেটা আলাপ-আলোচনা। এদের কণ্ঠস্বর স্বভাবতই বেশ উঁচু পরদায় বাঁধা, তার উপরে স্ব-স্ব বক্তব্য জোরালো ভাবে প্রকাশ করবার প্রবৃত্তি একটু প্রবল। সুতরাং বিষয় যাই হোক আলোচনাটা এমন একটা রূপ নেয়, যাকে বলা যেতে পারে গলার জোরের কম্পিটিশন।

এ দিনও কথাবার্তা চলছিল, কিন্তু সেটা ঠিক কোলাহলের কোঠায় গিয়ে ওঠে নি। শম্ভু এসে দাঁড়াতেই থেমে গেল। সকলের সাগ্রহ এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার মুখের উপর। নীরবতা ভঙ্গ করলেন সেই 'জ্যাঠামশাই'। বললেন, ছ্যাখা পাইলা ?

শম্ভু মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।'

"কেমন বোঝলা ? কোনো কথা-টথা – "

"সে সব ম্যানেজারের সঙ্গে বলতে বললেন। তাকেও দেখলাম ওঁর ঘরে।"

"তাই নাকি !" 'জ্যাঠামশায়ের' দন্তহীন মুখে কৌতুক হাসির ঝিলিক খেলে গেল। বাকী মুখগুলোও কৌতূহল ও ঔৎসুক্যে উজ্জ্বল। কে একজন বলে উঠল, কেমন দেখতে ? শুধু প্রশ্নকর্তা নয়, আরো অনেকের চোখে-মুখেও এরই প্রতিধ্বনি লক্ষ করল শম্ভুচরণ। যেন তাদের হাজার রকম সমস্যার সুরাহা কতটা হল বা হবে, তার চেয়ে ঐ প্রশ্নটির গুরুত্বই বেশী ! শম্ভু কোনো উত্তর দিল না। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, মালিক পক্ষ যখন চায় ম্যানেজারের সঙ্গেই আমাদের কথা বলতে হবে, তখন একটা দিন

ঠিক করে ফেলা যাক। আমাদের কি কি চাই, সেটা তো আগেই আমরা সবাই মিলে বসে মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি। আমার কাছে লেখাও আছে। সেইগুলোই ওঁর কাছে নিয়ে ফেলা।

পঞ্চায়েতের সকল সদস্যই উপস্থিত। এ পর্যন্ত কারো কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। শম্ভুচরণ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, এখন বলুন, আপনারা কে কে যেতে চান ?

এর আগে সদর নায়েবের কাছে কোনো ব্যাপার নিয়ে যখনই কোনো 'দরবার' করবার প্রয়োজন হয়েছে, সকলে এক বাক্যে শম্ভুকেই প্রতিনিধিত্বের ভার দিয়েছে। সকলের মুখে ঐ একই কথা শোনা গেছে, 'আমরা আর কী করতে যাবো ? তুমি যাও।' এবারে দেখা গেল সদস্যরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। একজন হাসি মুখে বলে উঠলেন, যাবা নাকি বনমালী ?

বনমালী অনেকটা যেন অনিচ্ছা ভরে উত্তর দিলেন, তা গেলে হয়। শম্ভুর যখন ইচ্ছা—

অন্য একজনকেও মাথা নাড়তে দেখা গেল।

ঘরের বাইরে যুবকদের মধ্যে একটা দ্রুত আলোচনা চলছিল। তাদের একজন হঠাৎ এগিয়ে এসে বলল, আমাদের একটা কথা বলবার ছিল শম্ভুদা।

"কী, বল।'

"আমাদের ক্লাব থেকে ক'জন ডেপুটেশনে থাকতে চায়।"

"ক্লাব থেকে ! কিন্তু ক্লাবটা তো আমাদের নিজেদের ব্যাপার। তার সঙ্গে মালিকদের কী সম্পর্ক ?"

"আমাদের কতগুলো নিজস্ব সমস্যা আছে—খেলাধূলো, লাইব্রেরী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—"

শম্ভুচরণের মুখে সকলের অলক্ষ্যে একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, বেশ, কে কে যাবে বল।

॥ ৯ ॥

নীহার এসে কাজে লেগেছে মাসখানেকের উপর। এর মধ্যে এক বার মাত্র বৌরাণীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তিনিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন হলধরকে দিয়ে। নীহার জানতে চেয়েছিল কখন যেতে বলেছেন? সে সম্বন্ধে হলধরের উপর কোনো নির্দেশ ছিল না। কিন্তু সে এতদিনের লোক স্বয়ং গৃহকর্ত্রীর অনুগ্রহভাজন, অন্যান্য ঝি-চাকরদের তুলনায় তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এ বাড়িতে—সে অন্ততঃ তাই মনে করে—এই সামান্য ব্যাপারটা জেনে আসবার জন্যে অন্দরে ছোটা চলে না। একটু ভেবে গম্ভীরভাবে বলেছিল, এদিকের কাজ-টাজ মিটিয়ে যাবেন। কথাটা বলবার আগে তাকে বেশ খানিকটা বুদ্ধি খাটাতে হয়েছিল। একজন ম্যানেজার তো আর যে-সে লোক নয় যে হুট করে ডাকলেই তাকে অন্তঃপুরে ছুটতে হবে।

নীহারের হাতে তেমন কিছু কাজ ছিল না। তখনই যেতে পারত। কিন্তু ঘন্টাখানেক পরে, সাধারণতঃ যখন বাড়ি ফিরবার জন্যে উঠে পড়ে, প্রায় সেই সময়ে গিয়ে ঢুকছিল মাঝের মহলে। একজন ঝি আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিল। ওকে সঙ্গে করে অন্দরমহলে বৌরাণীর বসবার ঘরে নিয়ে গেল। একটু পরেই তিনি এসে ঢুকলেন—"কই, আর তো এক দিনও এলে না আমার কাছে। খুব কাজ বুঝি?"

নীহার হাসল, "না, এমন আর কী কাজ?"

"তবে?"

এর উত্তরও রইল ঐ মৃদু হাসির মধ্যে।

'তুমি সম্পর্কটা আগের দিনই পাতিয়ে রেখেছিলেন বৌরাণী। বলেছিলেন, আমি কিন্তু ভাই তোমাকে 'আপনি আজ্ঞা' করতে পারবো না।

"বেশ তো।" খুশির সুরে হাসি মুখে বলেছিল নীহার। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। যতটা সাড়া পাবেন, আশা করেছিলেন বৌরাণী, ততটা ঠিক

পাওয়া যায়নি। তখন অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল। কেমন যেন একটা ব্যবধান রক্ষা করে চলতে চায় মেয়েটি। ব্যবধান অবশ্য থাকবেই। সবে এসেছে। তাছাড়া ওঁরা তাকে যে-চোখেই দেখুন, সে তো জানে, সে ওঁদের মাইনে-করা কর্মচারী। সম্পর্কের মধ্যেই একটা দূরত্ব রয়ে গেছে। এখনই সেটা ঘুচে গিয়ে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠবে, ততটা আশা করা যায় না। বৌরাণীও তা করেন নি। তবু আরেকটু এগিয়ে আসবে, এই রকম একটা প্রত্যাশা মনে মনে করে রেখেছিলেন। হাজার হলেও মেয়ে মানুষ তো। সেই ভাবেই তিনি তাকে নিজের ঘরে ডেকে এনেছেন, ম্যানেজার হিসেবে ডাকেননি।

আসলে, সাদা চোখে যা-ই দেখুন, একটি কম বয়সী সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে 'চাকরে' হিসেবে দেখবার মত দৃষ্টি বৌরাণী বোধহয় তখনো আয়ত্ত করতে পারেন নি। যা কিছু প্রত্যক্ষ, তা-ই সত্য নয়। চোখের সাক্ষ্য মন সব সময়ে মেনে নেয় না।

বৌরাণীর দোষ নেই। অতিশয় সেকেলে রক্ষণশীল জমিদার পরিবারের বিধবা বধূ। দৃষ্টিভঙ্গিও সেইরকম। অতি-আধুনিক কালের সমাজ-মনেও চাকরি করা মেয়েকে নির্জলা 'চাকরে' বলে মেনে নিতে বাধে। একটা পারিবারিক সম্পর্কের মিশাল না দিলে চলে না। স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা চাকরি ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন। কিন্তু শিক্ষিকারা ছাত্রীদের কাছে অলকা দি, বরুণা-দি ; শিক্ষকরা অলক-দা, বরুণ দা নন। স্কুলে তাঁরা অলকবাবু স্যর, বরুণবাবু স্যর, আর কলেজে এ. সি., বি. এম.—অলক চন্দ এবং বরুণ মিত্রের সংক্ষেপিত রূপ, যার মধ্যে নিকট সম্পর্কের পরিচয় নেই। হেডমিস্ট্রেসকে 'বড়দি' বলাই রীতি। তিনিও সম্ভবতঃ খুশী হন। কিন্তু হেডমাস্টরকে 'বড়দা' বললে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে সহজেই অনুমেয়। কোনো মেয়ে-হোস্টেলের খাণ্ডারণী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আড়ালে তাঁর বোর্ডারদের কাছে যে আখ্যাই লাভ করুন, প্রকাশ্যে সকলের মুখেই 'মাসিমা'। পদটিতে যদি পুরুষ থাকেন, তিনি যতই ছাত্রী-বৎসল, সদাশয়, স্নেহপ্রবণ হোন না কেন, 'মেসোমশাই' হতে পারবেন না।

* * * *

নীহারের সঙ্গে দুচারটি মামুলী কথাবার্তা হল। দিদিমা, দাদামশাই কেমন আছেন? জানতে চাইলেন বৌরাণী। সংক্ষিপ্ত উত্তর পেলেন, 'ভালো'। বাবা মার কথা প্রথম দিনই জেনে নিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল ও সম্বন্ধে আরেকটু অগ্রসর হবেন। এই বয়সেই বাবা-মা দুজনকে হারিয়ে বসেছে মেয়েটা!—মহামায়ার স্নেহপ্রবণ মন স্বভাবতই তার প্রতি একটা অলক্ষ্য আকর্ষণ অনুভব করছিল। কিন্তু লক্ষ করেছিলেন, প্রসঙ্গটা যেন সে এড়িয়ে যেতে চায়, তাঁরা নেই এর বেশী যেন আর কিছু জানবার নেই। বৌরানীও আর কিছু জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেননি। অনুমান করেছিলেন ঐ দুটি অথবা কোনো একটি মৃত্যুর সঙ্গে হয়তো এমন কোন স্মৃতি জড়িত আছে যা স্বাভাবিক বিয়োগ-বেদনার চেয়ে গভীরতর, কিংবা ভিন্নতর, যার জন্যে ওখানটা সে স্পর্শ করতে চায়না। তাই আজ আর ও নিয়ে কোনো কথা পাড়লেন না।

অন্য একটা কথা পাড়বার ইচ্ছা ছিল এবং বিশেষ করে সেই কারণেই নীহারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

নীহারকে চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব যখন সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পৌছায়নি তখন থেকেই বৌরানী ভেবে রেখেছিলেন, ঐসঙ্গে তার থাকবার ব্যবস্থাও করতে হবে। মেয়েছেলে বলেই কথাটা তার মনে হয়েছিল। কোলকাতা থেকে রোজ এতটা পথ একা যাতায়াত তার পক্ষে কষ্টকর হবে। ছোট জায়গা; ধারে কাছে বাসা করে থাকবার মত উপযুক্ত বাড়িঘর পাওয়া দুষ্কর। এদিকে তাদের এত বড় বাড়ি পড়ে আছে, জায়গার অভাব নেই। সদর মহলে ওর পক্ষে অসুবিধা আছে, মাঝের মহলে পূবদিকের খান তিনেক ঘর নিয়ে অনায়াসে থাকতে পারবে। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও করে দেওয়া যাবে। ঝি-চাকর সঙ্গে আনে ভাল। তা নাহলে তিনিই যোগাড় করে দিতে পারবেন। ইচ্ছা ও সম্ভব হলে ওর নিজের লোকেরাও কেউ কেউ এসে থাকতে পারবেন ওর কাছে; মাঝে মাঝে কিংবা বরাবরের মত।

নীহারের দিকটাই শুধু ভাবেননি বৌরানী, নিজের কথাও ছিল সেই সঙ্গে। এই বিশাল নির্বান্ধব পুরী আর তার ভিতরকার এই নিঃসঙ্গ জীবন! একদিন নয়, দুদিন নয়, বছরের পর বছর। মাঝে মাঝে মনে হত দুর্বিসহ, সারা মন ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইত। এরই মধ্যে যদি জন্মাতেন, কিংবা

শিশুকাল থেকে বেড়ে উঠতেন, হয়তো এই শূন্যতা এতখানি গুরুভার হয়ে চেপে বসতনা। তার সঙ্গে মনের একটা বোঝাপড়া হয়ে যেত। কিন্তু শুরু থেকে তো এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি। তিনি যেদিন এসেছিলেন এই বাঁড়ুয্যে বাড়ি সেদিন জমজম করছে। লক্ষ্মী অচলা। চারদিকে ব্যস্ততার প্রবাহ, লোকজনের স্রোত। কত রকমের লোক—অর্থী, প্রার্থী, আত্মীয়, আশ্রিত, দাস-দাসী, পাইক বরকন্দাজ, আমলা-কর্মচারী। কত রকমের কোলাহল—কাজকর্মের, আনন্দ-উৎসবের, মত্ততার, অহমিকার। কত ত্যাগ, দুঃখ, পাপ, অনাচার—

কটা বছরের মধ্যে সব থেমে গেল। একটি বিশেষ দিন থেকে তার শুরু —অভিজিৎ যেদিন চলে গেল কাশীতে। তার পরেই যেন ঝিমিয়ে পড়ল মহলগুলো। হল-ঘর, যেখানে জলসা মাইফেল লেগেই থাকত, আর তার আশপাশের কামরাগুলোয় তালা পড়ল। নীচের কাছারি বাড়িতেও আগেকার সেই হাঁক-ডাক, ছুটোছুটি রইলনা। মাঝের মহলে, অন্দরে—সর্বত্র একটা গাম্ভীর্যের ছায়া। ঝি চাকরদের দ্বন্দ্ব কলহ, এতবড় জমিদার বাড়ির যেটা নিত্য সহচর, তাতেও যেন ভাঁটা পড়ল।

তারপর এল মৃত্যু। একে একে সবাই চলে গেলেন, সামান্য কটি বছরের ব্যবধানে—কর্তা, গৃহিণী, বাড়ির বড় ছেলে। অত লোক জন কী হবে তখন? দুজন-চারজন করে বেশীর ভাগই বিদায় করে দেওয়া হল। এত বড় পুরীটা স্তব্ধ হয়ে গেল। খাঁ খাঁ করছে ঘরগুলো। তারই মধ্যে নি শব্দে বিচরণ করতেন বৌরাণী আর ভাবতেন, এ কী হল! প্রথম প্রথম সারা বাড়িটা যেন বুকের উপর চেপে বসত। হাঁপ ধরত। ভাবতেন,—'কোথাও ছুটে চলে যাই' বেরিয়ে পড়ি যেদিকে দুচোখ যায়।' কিন্তু তার উপায় ছিলনা। সব গেলেও দায়িত্ব যায়নি। তার বন্ধন বড় কঠোর। বিশেষ করে যখন আর কেউ নেই, তিনি একা, নানা দিক থেকে সেই বাঁধনগুলো তাঁকে আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে ধরল।

অভিজিৎ আসবার পর যেন বহুকাল পরে প্রাণভরেএকটা নিঃশ্বাস নিলেন বৌরানী। ভাবলেন এতদিনে তাঁর একাকিত্ব ঘুচল। অভি শুধু দেবর নয়, মহামায়ার কৈশোর-সহচর। যেদিন প্রথম বৌ হয়ে এলেন, সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সংকীর্ণ পরিধি থেকে এই বিশাল জমিদার বাড়ির বিস্তীর্ণ জীবন ধারার

মধ্যে এসে পড়লেন, নিজেকে মনে হল দিশেহারা, যেন হারিয়ে গেছেন। তখন যাকে পেয়ে মনে হয়েছিল বেঁচে গেলেন, কূল খুঁজে পেলেন, সে এই অভিজিৎ, এ বাড়ির ছোট ছেলে, ভীরু লাজুক, শান্ত। সে-ও এ বাড়ির সঙ্গে নিজেকে খাপখাওয়াতে পারছিলনা। একমাত্র মা ছাড়া তার আর কোনো আশ্রয় ছিলনা।

তাঁকেই বা কতটুকু পেত—কেমন ভয়ে ভয়ে দিন কাটাত। বৌরানীর মধ্যে এমন এক জনকে পেল যে তাকে বোঝে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, অনেক জল গড়িয়ে গেছে গঙ্গায়। আজকের অভিজিৎ অন্য মানুষ। বৌরাণীর ডাকেই সে এসে দাঁড়িয়েছে, একথা ঠিক। তাঁর সঙ্গে তার সৌহার্দ্যের, সহানুভূতির যে পূর্ব সম্পর্ক তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু ছুদিন না যেতেই তিনি বুঝতে পেরেছেন, একে যেন ধরা ছোঁয়া যাচ্ছে না। এসেছে বটে, কিন্তু এসেই যেন যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে। এখানকার কোনো কিছুর সঙ্গে তার অন্তরের যোগ নেই। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু সেটা আর কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়ার দিকেই তার দৃষ্টি। সেই জন্যেই এই ম্যানেজারের আমদানী। যেদিন থেকে সে কাজে লেগেছে তাকে নিয়েই লেগে পড়ে আছে। খাবার সময়টুকু ছাড়া বৌরাণীর সঙ্গে দেখাশুনো কথাবার্তাও নেই বললেই চলে।

বৌরানী কোনো অনুযোগ করেননি। মনে মনে হেসেছেন। দেওরকে যদি না চিনতেন হয়তো এর অন্য অর্থ করতেন—ঝি-চাকর আমলারা করছে কিনা কে জানে?—কিন্তু তিনি জানেন, এটা অন্য কিছু নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যানেজারটিকে তালিম দিয়ে তৈরী করার চেষ্টা। সেটা হয়ে গেলেই কাশী যাত্রার ডাক আসবে।

এসব জেনেও বৌরানীর মনের এক কোণে একটা মধুর সংশয় মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল। তার সামনে যে মেয়েটি বসে আছে, তাকে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। আগেই ভাল লেগেছিল। আজ আরো ভাল লাগল। কেন, তিনি ঠিক জানেন না। কাউকে যদি আমার ভালো লাগে কিংবা ভালো না লাগে, তার জন্যে সে ব্যক্তিটি সব সময়ে দায়ী নয়, দায়ী আমার মন, পাত্রটি তো যা তা-ই আছে। আমি তাকে সৃষ্টি করছি,

নানান রূপ দিচ্ছি মনে মনে। আমার মনের রং ছড়িয়ে দিচ্ছি তার উপর।

বৌরানীও সেই মুহূর্তে মেয়েটিকে ঠিক ম্যানেজার রূপে দেখছিলেন না, আরেক রূপে দেখতে চাইছিলেন। তাঁর সেই 'চাওয়া'র আলো পড়ছিল ওর মুখের উপর, ও যে নীরবে নত মুখে বসেছিল, সেই বিশেষ ভঙ্গিটির উপর। ওর মধ্যে একটা মাধুর্যের আভা ফুটিয়ে তুলেছিল। যে কথাটা ওকে বলবার জন্যে ডেকেছিলেন, তারপর ভেবেছিলেন, 'আজ থাক, ঠাকুরপোকে আগে জিজ্ঞেস করে দেখি,' সেইটাই বলে ফেললেন, আচ্ছা, তুমি এক কাজ করনা কেন নীহার ?

নীহার মাথা তুলল, মুখে কিছু বলল না, চোখ দুটি দিয়ে জানতে চাইল কী কাজ। বৌরানী বললেন, আমি শুনেছি, তোমাকে অনেক কাণ্ড করে আসতে হয়। বাড়ি থেকে ট্রামে করে শেয়ালদ, তারপর রেল, এখানকার ষ্টেশনে নেমে আবার রিকশ। একই ভাবে ফেরা। কম সময় লাগে ! তার ওপর কষ্ট কত ! রোদে, বৃষ্টিতে, ঠাণ্ডায়—

একটু থামলেন। বোধহয় অপেক্ষা করলেন, নীহার কিছু বলে কিনা। সে চুপ করে রইল। তখন ভূমিকা ছেড়ে সোজা প্রস্তাবে চলে গেলেন—তার চেয়ে এখানেই থাকবার ব্যবস্থা করনা কেন ?

নীহার বলল, খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি, এখানে বাসা পাওয়া বড় মুশকিল।

"বাসা নিতে কে বলছে তোমাকে ?"

নীহার বোধহয় কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে চোখ তুলে তাকাল। বৌরাণী বললেন, এই বাড়িতে থাকবে, আমার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলেন, আমাদের সঙ্গে থাকতে বলছি না। আলাদা বন্দোবস্ত করে দেবো। এতবড় বাড়ি পড়ে আছে। যেদিকটায় যতগুলো ঘর দরকার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। সামান্য অদল বদল যদি কিছু করতে হয়, তার জন্যেও আটকাবেনা।

নীহার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। তার বোধহয় মনে পড়ল, চাকরির বিজ্ঞাপনে 'ফ্রি কোয়ার্টার্স' অর্থাৎ বিনা ভাড়ায় বাসা দেওয়া হবে, এরকম কোনো সর্ত ছিল না। নিয়োগপত্রেও তার কোনো উল্লেখ নেই। এটা

নিশ্চয়ই বৌরানীর নিজস্ব প্রস্তাব। এর সঙ্গে চাকরিগত কোনো প্রশ্ন জড়িত থাকতে পারে এবং সেই কারণে (অন্যান্য দিক বাদ দিলেও) এটাতে রাজী হওয়া নীহারের পক্ষে অসুবিধাজনক—এত সব ব্যাপার হয়তো তিনি ভেবে দেখেননি। একবার ভাবল কথাটা পাড়বে, তার তরফের অসুবিধাটা বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু বৌরাণীর চোখ দুটির দিকে চেয়ে বলতে গিয়েও থেমে গেল। মনে হল সেখানে যেন একটি সাগ্রহ প্রত্যাশা অপেক্ষা করে আছে। 'না' বলা মানে তাঁকে আঘাত দেওয়া। অথচ 'হাঁ'ই বা বলা যায় কেমন করে ?

'হাঁ' আর 'না' এর মাঝখানে একটা স্তর আছে, বলা যেতে পারে দুটোকেই এড়িয়ে যাবার পথ, যার নাম চুপ করে থাকা। নীহার আপাততঃ তারই আশ্রয় নিল। মৌন যে সব ক্ষেত্রেই সম্মতির লক্ষণ তা নয়, কখনো কখনো অনিচ্ছার নীরব প্রকাশ। যেটা হোক বুঝে নিন বৌরাণী। ইচ্ছা আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে রাজী হতে পারছে না, ভেবে দেখা দরকার—এও ভাবতে পারেন, কিংবা ইচ্ছা নেই, সেটা মুখের উপর বলতে অসুবিধা বোধ করছে—এও মনে করতে পারেন। কিন্তু কতক্ষণ আর তিনি এই অনিশ্চয়ের দোলায় দুলতে থাকবেন ! উত্তর তো একটা দিতেই হবে।

এই কঠিন অবস্থা থেকে নীহারকে বাঁচিয়ে দিল হলধর। তাকে কেউ ডাকেনি, তার নিজেরও এ সময়ে এঘরে কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু খাবারের ডিশ গেলাসগুলো সরিয়ে নেবার ছল করে (সেটা যে ঝি খাবার নিয়ে এসেছিল তারই কাজ) এসে ঢুকল এবং কাজ করতে করতে যেন প্রসঙ্গত উঠল কথাটা, এমনিভাবে বলল, "ছোটবাবু আপনাকে খুঁজছিলেন।"

"দেখা করতে বলেছেন ?" জানতে চাইল নীহার।

"না, বাইরে কোথায় গিয়েছিলেন। ফিরে সোজা আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, তখনই বেরিয়ে এলেন।"

এর থেকেই বাকীটুকু অনুমান করে নিয়েছে হলধর। এ জাতীয় বুদ্ধিচালনা সে মাঝে মাঝে করে থাকে। হলধর দাস বাঁড়ুয্যে বাড়ির সাধারণ ভৃত্য নয়, নিছক হুকুম তামিল করার বাইরেও যে তার কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ভূমিকা আছে, সুযোগ পেলেই সে সেটা দেখিয়ে থাকে।

বৌরানী বললেন, "কোথায় গেল, দেখলি ?"

"নিজের অফিস ঘরের দিকে যেতে দেখলাম।"

"এখন আবার অফিস ঘরে কী কাজ? চা খাবে কখন? যা, ডেকে নিয়ে আয়।"

হলধর বেরিয়ে দরজার মুখ থেকেই বলল, ঐ তো এদিকেই আসছেন।

অভিজিৎ দোরগোড়া থেকে নীহারকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বৌরানী বললেন, "কী হল? এসো।"

"থাক, পরে আসবো।"

"আবার পরে কেন? এসো, এখানেই তোমার চা দিতে বলি।"

"শুধু চা কিন্তু।"—বলতে বলতে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসল অভিজিৎ।

"কেন? সেই কখন দুটো ভাত মুখে দিয়ে উঠেছ!"

"এখনো সেটি তেমনি রয়ে গেছে। কী একখানা জল হাওয়া তোমাদের এই বাংলা মুলুকে!"

"তা বললে চলবে কেন? একটু একটু করে সইয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, তোমরা বসে গল্প কর, আমি এখ্খনি আসছি।"

বৌরাণী উঠে যেতেই অভিজিৎ নীহারের দিকে ফিরে বলল, "কলোনীর ওরা কোন খবর দিয়েছে কবে আসছে আপনার কাছে?"

"না তো।"

"আর দু-এক দিন দেখা যাক। তারপর ভাবছি ওদের অপেক্ষায় না থেকে আমরাই আমাদের প্ল্যান নিয়ে এগিয়ে যাবো। জমিটা আগে সার্ভে করা দরকার। পুরনো সার্ভেয়ার যে ছিল, তাকে দিয়েই হবে। কাল একবার দেখবেন তো খোঁজ নিয়ে তার ঠিকানাটা আছে কিনা সেরেস্তায়। না থাকার কোনো কারণ নেই। তবে অনেকদিন বোধ হয় তার ডাক পড়েনি। লোকটাই আছে কিনা—

"কোন্ লোকটা?" ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন মহামায়া।

"তোমাদের সেই সার্ভেয়ার।"

"এখানেও তোমাদের আফিসের কথা! না বাপু, ওসব চলবে না। তোমার কাছারির এলাকা ঐ সদর মহলের ফটকেই শেষ। কী বল নীহার?"

নীহার নীরবে হাসল। অভিজিৎ একটা কী বলতে যাচ্ছিল, বৌরানীর খাস-ঝি মঙ্গলাকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল। তার হাতে একখানা থালা।

টিপয়ের উপর রেখে সেটি যখন অভিজিতের সামনে এনে বসাল, সে চমকে উঠল, "একি! এসব আমার নাকি?"

"ভয় পাবার মত কিছু দিইনি। ওটুকু খেয়ে নাও।" নীহারের দিকে একপলক তাকিয়ে মৃদু হেসে যোগ করলেন বৌরানী, "এদিক দিয়ে তোমার ম্যানেজারটিও দেখছি তোমারই দোসর। দুজনেই 'শুধু চা'।"

"আমি কিন্তু শুধু চা বলিনি। জানতাম, বলে কোনো লাভ হবে না।" মৃদু কণ্ঠে বলল নীহার। বৌরানী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, মুখে বলনি, তবে কাজে ওর বেশী এগোওনি।"

"আমি ঠিক তার উলটো। মুখে বললেও কাজে দেখিয়ে দিচ্ছি ও বলাটা কিছু নয়"—বলে, জামার হাতটা একটু গুটিয়ে নিতেই মঙ্গলা হাত ধোবার গামলা নিয়ে এগিয়ে এল।

অভিজিৎ খেতে শুরু করবার পর নীহার তার কবজিতে বাঁধা ছোট্ট ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বৌরানীর উদ্দেশে বলল, আমি এবার উঠি।

"হ্যাঁ; তোমাকে তো আবার গাড়ি ধরতে হবে। ফাঁক পেলেই এসো, ডাকবার অপেক্ষায় থেকোনা।"

নীহার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

তার জুতোর খুট খুট আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই অভিজিৎ বলল, "ম্যানেজারকে নিয়ে এক মহাকাণ্ড শুরু হয়েছে কলোনীতে।"

বৌরানী ওখানকার ব্যাপারে উৎসাহিত নন। বললেন, "ওদের কাণ্ড তো "একটা না একটা লেগেই আছে।"

"না; এটা বেশ মজার ব্যাপার।"

"কি রকম?"

"ওদের লীডার, মানে, শম্ভুচরণ সেদিন কী সব দাবি-দাওয়া নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। ম্যানেজারকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, এবার থেকে যা কিছু বক্তব্য, ওঁর কাছে, সে সবের ফয়সালাও উনি করবেন। চলে গেল। তারপর থেকেই চলছে গণ্ডগোল। ঠিক হয়েছে, শম্ভু একা আসবে না, আসবে একটা ডেলিগেশন।"

"সে আবার কী?"

"মানে সকলের ভেতর থেকে বাছাই করা একটা দল।"

"সে কী! দলবল নিয়ে হল্লা করলে ঐ মেয়েটা সেগুলোকে সামলাবে কেমন করে?"

"ছোটোখাটো দল। পাঁচ সাত জনের মত। তাই নিয়ে ভোট চলছে। আর ভোট মানেই জোট, দলাদলি। শম্ভু বেচারা ফ্যাসাদে পড়ে গেছে।··· সে যাকগে। ওরা আসুক না আসুক, আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এই অবস্থাটা আর চলতে দেওয়া যায় না। কিছু একটা করা দরকার। একটা পথ আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। তোমাকে বলবো বলেই আসছিলাম।

"বলতে চাও, আমি শুনবো। তবে তুমি তো জান, তুমি যা ঠিক করবে সেইটাই ঠিক। যদ্দিন ছিলে না, নায়েব মশাই আমাকে এটা ওটার মধ্যে টেনেছেন। এড়াতে পারিনি। উনিই বা কী করবেন, কার কাছে যাবেন? তুমি যেদিন থেকে এসে দাঁড়িয়েছ, সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটি নিয়েছি।"

"ছুটি তোমাকে দিচ্ছে কে? চাইলেই তো হল না, মঞ্জুর হবে, তবে তো? সে যাক গে, এবার আমার প্ল্যানটা শোনো।"

অভিজিৎ একটু থামল। বাড়ি ফিরবার কদিন পরেই প্রথম যেদিন বৌরানীর সঙ্গে দোতলার হলঘরের সামনে ঐ শেওলা ধরা খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে প্রায় শিউরে উঠেছিল, সে দিনের উপর বোধহয় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সারা মাঠ জুড়ে টালি টিন হোগলাপাতা ছেঁড়া চটে জড়ানো 'কলোনী' নামক ঐ কুৎসিত জিনিসটা তাকে যে গভীর পীড়া দিয়েছিল এতদিন তার সম্বন্ধে নিত্য অভ্যস্ত হয়েও সেটা মন থেকে সরাতে পারে নি। প্রথম দর্শনে ওটা ছিল বাইরে থেকে দেখা একটা দৃশ্য। তারপর তার ভিতরকার রূপটা জানতে পেরেছে, কিছুটা নজরেও এসেছে। একটা কথাই কেবল মনে হয়েছে, এ আর চলতে পারে না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ছেলে মানুষের মত ভেবেছে, এমনটা হয় না, যে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল, ঐ কুশ্রী জবর জংটা রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?

একদা সদর নায়েব যজ্ঞেশ্বর সরকারও হয় তো এমনি একটা সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। নিজেদের অত পাইক বরকন্দাজ না থাক সরকারী পুলিশ তো আছে। তাদের দিয়ে ঐ বেদখলকারী আপদগুলোকে উৎখাত করে দেওয়া যাবে। বাকীটুকু অর্থাৎ জঞ্জাল সাফ করবার কাজটা না হয় তাঁরা

নিজেরাই করিয়ে নিতে পারবেন। অভিজিতের চিন্তা ছিল আলাদা। 'আপদগুলো' থাকবে, কিন্তু 'মাথা গুঁজবার জায়গা' বলে যে-জঞ্জাল এনে তারা জড়ো করেছে সেটা থাকবে না। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সে মনে মনে এগিয়ে চলেছিল।

অভিজিতের মনোভাব বৌরাণীর অজানা ছিল না। তাছাড়া এমনিতেও তিনি বুঝেছিলেন, জবর দখলের 'জবর'-অংশটাকে তাঁদের স্বীকার করে নিতে হবে। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর কানে আসত, বাংলা দেশের বাইরে কোথায় কোথায় এদের জায়গা জমি দেবার ব্যবস্থা করছেন সরকার। তার সঙ্গে টাকা কড়ি রেলভাড়া এসবও দেওয়া হবে। সরকারী লোকেরাই এসে লাটবহর সমেত এদের সরিয়ে নিয়ে যাবে, একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে পৌঁছে দেবে। শুনে কিছুটা আশান্বিত হয়ে উঠতেন। আবার শুনতেন, এরা নাকি 'দেশ' ছেড়ে যেতে চায় না, অন্য কোথায় এই ধরণের 'কলোনী' থেকে কয়েকটা দলকে পাঠানো হয়েছিল, কিছু দিনের মধ্যেই তারা আবার দল বেঁধে ফিরে এসেছে। গোড়ায় যেখানে ছিল, সেখানে আর জায়গা পায়নি, রেল ষ্টেশনে গুদামে পার্কে মাঠে ঘাটে যেখানে খালি জমি পেয়েছে, আস্তানা গেড়ে বসেছে। সেই সব খবর শুনে নতুন কোনো দল আর বাইরে যেতে চাইছে না। 'শম্ভুচরণের গোষ্ঠীও' যে এখান থেকে নড়বে না—যত কষ্টেই থাক —বৌরানী ধরে নিয়েছিলেন। অভিজিৎ সে দিক দিয়ে, অর্থাৎ সরকারের সাহায্যে এদের বিকল্প বাসস্থানের বন্দোবস্ত করাবার কোনো চেষ্টা করছে না, এটা তিনি জানতেন। এও জানতেন এদের জন্যে সে উদ্বিগ্ন, এরা আর একটু ভালভাবে থাক, এটা সে চায়। তা নিয়ে শুধু ভাবছে না, একটা কিছু করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কী তার পরিকল্পনা, কী তার কর্মপন্থা, এসব সম্পর্কে তিনি কোনো আভাস পান নি।

অভিজিৎ বলল, "এই যে জমিটা ওরা দখল করে বসেছে, ন্যায় বা আইন কোনো দিক দিয়েই তা ওরা পাবে না। একথা যেমন সত্যি, তেমনি ওটা আমরা ফিরে পাবো, এমন ধারা একটা সম্ভাবনা মনে মনে পুষে রাখাও অর্থহীন।"

"জানি। কিছুদিন আগেও সে রকম একটা আশা আমারও ছিল। আজ আর নেই।"

"ওটা আমাদের খরচের খাতায় লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু ওদের জমার খাতায় ওঠেনি। সেটাও না হয় করে দেওয়া গেল। ওদের পঞ্চায়েতের নামে, কিংবা কোনো একটা ট্রাস্ট ফ্রাস্ট করে, পাট্টা না কি বলে, করে দিলেই সে ব্যাপারটা চুকে যায়। ওরাও বোধ হয় তার বেশী কিছু চাইছে না। কিন্তু—"

বৌরানী অপেক্ষা করে রইলেন। অভিজিৎ মিনিট খানেক চুপ করে থেকে তাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে একটু কুণ্ঠিত হাসির সঙ্গে বলল, "তোমাকে বলতে আর বাধা কী? আমি ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছিনা। ভাবতে পারছিনা, ঝঞ্ঝাট মিটে গেল, ঐ লোকগুলোকে নিয়ে আমাদের ভাববার বা করবার আর কিছু নেই। দেখতে গেলে সত্যিই কিছু নেই। এও কি কম? এর বেশী আর কী করতে পারি আমরা?"

বৌরানীরও সেই একই প্রশ্ন। কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। অভিজিৎ বলল, এতগুলো মানুষকে এই অবস্থার মধ্যে রেখে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। একথা ঠিক, এই অবস্থায় আমরা ওদের ফেলিনি, রাখিও নি। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। দায়িত্ব যদি কারো থাকে সেটা স্টেটের। কিন্তু তার মেশিনারী যাকে আমরা বলি গভর্নমেন্ট, পঙ্গু বা অকর্মণ্য হয়ে গেছে বলে আর সবাই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এ যুক্তিতে মন সায় দিতে চায় না। তাছাড়া একেবারে বাড়ির সামনে, চোখের ঐ কুশ্রী নোংরা জিনিসটাকে ঠিক যেন বরদাস্ত করাও যাচ্ছে না।

বৌরানী মনে মনে হাসলেন। যেন সেইটাই আসল কারণ! কিছুটা হয়তো ঠিক। একটা কদর্য সরিসৃপের মত গা এলিয়ে পড়ে থাকা ঐ ছাঁদ-ছন্দহীন বস্তিটা ওর চোখকে, ওর মার্জিত রুচিকে পীড়া দিচ্ছে। কিন্তু ওর মনকে যে অহরহ ক্লিষ্ট চঞ্চল করে তুলছে সে ঐ কুঁড়েগুলো নয়, তাদের শ্রীহীন অবয়ব নয়, তাদের ভিতরে যে জীবন যাত্রার প্রবাহ চলেছে তার দীর্ণ পঙ্কিল রূপ। আরেক দিন কি কথায় যেন বলে ফেলেছিল 'মানুষ এমন করে থাকে, এ আমার ধারণায়ও কোনোদিন আসেনি। আজ চোখের ওপর দেখছি।'

বৌরানী বললেন, কী করবে ঠিক করেছ?

ভাবছি, যাকে সত্যি বসত বাড়ি বলে, বস্তি নয়, তেমন একটা কিছু গড়ে তুলবার চেষ্টা করবো। গড়বে ওরাই, আমরা সাহায্য করবো। বড় কোনো ব্যাপার নয়। মাথার ওপরে হয়তো ঐ টালিই থাকবে, দেয়ালগুলো ইটের, মেঝেটা পাকা, নাই বা পাঁচিল ঘেরা—সামনে পেছনে একটু করে জমি ; একটা পরিবার সাধারণভাবে থাকতে পারে এমনি কতগুলো ছোট ছোট কটেজ। ভদ্র, পরিচ্ছন্ন।

বৌরানী লক্ষ করলেন সেই টালি ছাওয়া, গাছ পালা ঘেরা সুন্দর কুটীর-গুলোর একটি স্বপ্নময় রূপ যেন অভিজিতের ছুচোখে ফুটে উঠেছে। এমন কিছু বলতে বাধল, যাতে সেটা ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু এটা যে শুধু স্বপ্ন নয়, এর বাস্তব দিকটাও সে ভেবে রেখেছে, অভিজিতের পরের কথাতেই তার পরিচয় পাওয়া গেল।

"বড় কোনো ব্যাপার নয় বলছিলাম। সেটা হচ্ছে প্রত্যেকের প্রয়োজনের দিক থেকে। কিন্তু গোটা স্কিমটা অনেকখানি। তুমি যাকে বল শম্ভুচরণের গুষ্ঠী, সেটি মোটেই ছোট নয়। তবে জায়গার অকুলান হবেনা। ওদিকে বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি পড়ে আছে। প্রশ্নটা টাকার।"

এই পর্যন্ত এসে আবার কিছুক্ষণ নতমুখে কি যেন ভাবল অভিজিৎ। তারপর মুখ তুলে বলল, 'আমাকে যে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হল, তাই নিয়ে তুমি একদিন বলেছিলে, 'এ শাস্তি যিনি দিয়েছিলেন, তার সব চেয়ে বড় ভাগটা তিনি নিজেই ভোগ করে গেছেন। সে খবর হয়তো তোমার কাছে পৌঁছয়নি।' স্পষ্ট ভাবে না হলেও তার কিছুটা আভাস আমার কাছে পৌঁছেছিল। একটা ঘটনা থেকে মনে হয়েছিল ওঁর ভিতরে একটা অস্থিরতা চলছিল। হয় তো কোনো একটা কাজের ভিতর দিয়ে তাকে শান্ত করবার কথা ভাবছিলেন। শেষ পর্যন্ত যেটা ভেবে স্থির করেছিলেন, সেটা তোমরা কেউ জানতে পারনি। দাদা না, তুমি না। সম্ভবতঃ মার কাছেও গোপন ছিল, যদিও তাঁর একটা সই দরকার হয়েছিল। সেটা হয়তো তিনি কিছু না জেনেই দিয়েছিলেন। বাবা বলছেন, এইটুকুই তাঁর কাছে যথেষ্ট।

"ব্যাপারটা তোমাকে বলবো বলবো করেও এতদিন বলা হয়নি। আর কোনো কারণে নয়, তেমন কোনো উপলক্ষ হয়নি।

'কাশী যাবার বোধহয় বছর তুয়েক পরে। রেজিস্টার্ড পোস্টে একটা

প্যাকেট এল আমার নামে। খুলে দেখলাম একখানা ব্যাঙ্কের পাসবুক। মলাট উলটে যে নামটা চোখে পড়ল, সেটাও আমার। পরের পৃষ্ঠায় একটা মোটা টাকার অঙ্ক। বাকী সব ফাঁকা। সঙ্গে একখানা চিঠি; বাবার লেখা। বাবার কাছ থেকে সেই আমার প্রথম চিঠি, সেই শেষ। ওপরে একটা পাঠ ছিল—কল্যাণবরেষু। বাকী সব কাজের কথা, ঐ পাস্ বুক সংক্রান্ত। জানিয়েছেন তাঁর 'পিতৃদেব' তাঁর 'পুত্রবধু' অর্থাৎ আমার মাকে একটা মহল দিয়ে গিয়েছিলেন। মার 'সম্মতি' নিয়ে সেটি বিক্রী করে টাকাটা আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দেওয়া হল। ওটা সম্পূর্ণ আমার, ওতে আর কারো অংশ নেই। আঠার বছর পূর্ণ হলেই আমি ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারবো।

প্রথমে মনে হয়েছিল, ফেরৎ দিয়ে দিই, চাইনা এ টাকা। তারপর আবার পড়লাম চিঠিখানা। পাশ বুকখানা খুললাম। হাত বুলোলাম তার উপর। মনে হল, না, শুধু টাকা নয়, আরো কি যেন জড়িয়ে আছে ছোট্ট বইখানায়। যেন কিসের একটা স্পর্শ, যাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। তাছাড়া, টাকাটা তো মার, তাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর শ্বশুর। বড় ভাল বাসতেন মাকে, তাঁর কাছেই শুনেছি।

যত্ন করে তুলে রাখলাম আলমারীতে। তেমনি রয়ে গেছে। ভাবছি ওটা এবার কাজে লাগবে।

॥ ১০ ॥

পুরনো সার্ভেয়ার শীতল দত্তকেই পাওয়া গেল। এক সময়ে মাইনে করা আমিন ছিলেন বাঁড়ুয্যেবাড়ির! জায়গা-জমির মাপ-জোখ অনেক করেছেন। ছোটখাট বাড়িঘরের প্ল্যানও করেছেন, যদিও ওভারসিয়ার নন, এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে কখনো যাননি। শূরজিৎ বলতেন, "শীতল আমাদের ছ'পকেটে ছটো ইঞ্জিনিয়ার পুরে রাখতে পারে।" তাঁর মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ছিলেন এই এস্টেটে। তারপর ছাড়িয়ে দেওয়া হল। সেই থেকে আর কোথাও স্থায়ী চাকরি নেননি, ঠিকা কাজ করেছেন মাঝে মাঝে। তাও সম্প্রতি ছেড়ে দিয়েছিলেন। বয়স হয়েছে। যাদবপুর অঞ্চলে সস্তায় কিছুটা জমি কিনে রেখেছিলেন। বছর কয়েক আগে একটি ছোটখাট বাড়িও করে ফেলেছেন।

লোকে বলে বাঁড়ুয্যেদের যখন জমজমাট অবস্থা সেই সময়ে শীতল দত্তও বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তা না হলে মাইনে আর কত পেতেন। তা দিয়ে কোলকাতায় বাড়ি করা চলেনা। কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়। পুরনোকালে জমিদারি সেরেস্তায় যারা চাকরি করত, ছোট বড় সকলেরই মাইনেটা ছিল নামমাত্র। তার উপর কেউ নির্ভর করত না। একজন নায়েব, গোটা কাছারির যিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, 'মাসিক বেতন' বলে পেতেন কুড়ি পঁচিশ টাকা, কিংবা তার চেয়েও কম। তাঁর বাড়িতে ঘটা করে দোল-ছুর্গোৎসব হত। একেকটা বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশনে যে ব্যয় হত, নায়েব-মশায়ের সারাজীবনের মাইনেতেও বোধ হয় কুলোতনা। মাইনেটা ছিল আসলে একটা দস্তুর, চাকরির সঙ্গে যুক্ত এবং তার অঙ্গ-স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তি। অন্যান্য প্রাপ্তির পথে সে কোনো বাধাসৃষ্টি করতনা। সেগুলো সহজ, স্বাভাবিক ভাবেই আসত; অনেক সময় প্রকাশ্যে, হয়তো কিঞ্চিৎ আড়াল দিয়ে। জমিদাররা জানতেন এবং 'এইটাই নিয়ম' বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের নিজেদের ভাগে তো কখনো হাত পড়তনা। সব

প্রাপ্তির প্রবাহ নেমে আসত প্রজানামক একই উৎস থেকে। নিজে থেকে আসত কি? অনেক সময় নিংড়ে বের করা হত। মোটা ধারাটা যেত জমিদারের দিকে আর সরুগুলো তাঁর অনুচরদের।

শীতল দত্ত অভিজিৎকে দেখেছেন সেই ছেলেবেলায়। ফটক দিয়ে ঢুকতে কিংবা বেরিয়ে যেতে চোখে পড়েছে শান্ত-লাজুক নম্র ছেলেটিকে (সাধারণতঃ জমিদারের ছেলেরা যা হয় না), কাছে ডেকে দু-একটা কথাবার্তা বলেছেন, খুশী হয়েছেন তার বিনীত উত্তর শুনে। তারপর এতকাল পরে এই দেখা। 'আপনি' বলবেন না 'তুমি বলবেন ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। কি মনে করে 'তুমিই' বললেন। খোঁজ খবর নিলেন হাল আমলের এবং সেই প্রসঙ্গে পুরনো আমলের কথা তুলে হা হুতাশ করলেন।

অভিজিৎ তার মাঝখানেই কাজের কথা পাড়ল। তার ইচ্ছা ছিল একে দিয়ে শুধু জরিপটা করিয়ে নেওয়া। জমির পরিমাণ জানা যাবে, তার থেকে সে নিজেই বুঝতে পারবে তার পরিকল্পনামত কতগুলো 'কটেজ' তৈরি হতে পারে সেখানে। এক একটির পিছনে ব্যয় কি রকম পড়তে পারে তার মোটামুটি হিসাব নীহারকে দিয়ে আগেই তৈরি করে রাখা হয়েছে। সার্ভে রিপোর্ট পেলেই মোট খরচটা জানা যাবে। তার তহবিলে সবটা কুলোবে কিনা, যদি না কুলোয় কিভাবে কোথায় কাটছাঁট করতে হবে সেটা তখন বিবেচ্য। আপাতত দরকার কতটা জমি আছে।

শীতলবাবু প্রশ্ন করে বসলেন, কী করতে চাও ওখানে?

অভিজিৎ মনে মনে বিরক্ত হল। সার্ভেয়ারের পক্ষে এটা অনাবশ্যক। কিন্তু আমিন বলে তার কৌতূহল থাকতে নেই সেটা আশা করা যায় না; বিশেষ করে এখানকার ব্যাপারে। এদের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর বহুদিনের। সুতরাং 'তা দিয়ে আপনার কী দরকার'—গোছের একটা পাল্টা প্রশ্ন করতে বাধল। বিরক্তিটা চেপে রেখে অভিজিৎ তার উদ্দেশ্যের মোটামুটি আভাস দিল। শীতলবাবু মুখে একটা আপসোসসূচক শব্দ করে বললেন, একেবারে, যাকে বলে, ভস্মে ঘি ঢালতে যাচ্ছ বাবাজী। ঐ লোকগুলো তোমার এই এতবড় দানের এক কানাকাড়ি দামও দেবেনা, তোমার নামটাও একবার মুখে আনবে না।

অভিজিতের মুখে এসে গিয়েছিল 'আজ্ঞে, দান আমি করছিনা, নামও

চাইনা।' বললনা। কথাটা যে খানিকটা দম্ভোক্তির মত শোনাবে তাই নয়, এর কাছে নিরর্থক, একে বোঝানো যাবেনা।

শীতলবাবু শ্রোতাকে নীরব পেয়ে আরেকটু জোরের সঙ্গে বললেন, তাছাড়া, তোমার ঐ বাড়িগুলো হবে, স্রেফ, বাঁদরের গলায় মুক্তার হার। ওরা কখনো ঐরকম ভাবে থেকেছে, না থাকতে পারবে? বাড়িতে ঢুকেই তাল তাল গোবর এনে দেয়ালগুলো ঘুঁটেয় ভরে দেবে। সামনে ফুলের বাগান করবে, ভেবেছ? হুঁ! ওখানটা হবে আঁস্তাকুড়, ওরা যাকে বলে আদাড়। রোয়াকে বসে ছেলে মেয়েগুলো পেচ্ছাব করবে পাইখানা করবে। পাঁচ সাতটা করে ছাগল পুষবে এক-এক জনে। তাদের জন্যে ঘর করে নেবে ভেবেছ? তুমিও যেমন। সব এক সঙ্গে থাকবে একই ঘরে। মাসখানেকও লাগবে না। তার আগেই দেখবে এখন যেমন তেমনি তোমার ঐ কটেজেও নাকে কাপড় না দিয়ে ঢোকা যায় না।

অভিজিৎ মুখে কিছু না বললেও ভিতরে ভিতরে যে অস্বস্তি বোধ করছিল, সেটা বোধহয় লুকোতে পারল না। শীতলবাবু স্বর নামিয়ে বললেন, তোমার অন্তঃকরণ আছে। থাকবেই বা না কেন? কত বড় বংশের ছেলে। তোমার বাপ-ঠাকুর্দারাও অনেক দানধ্যান করে গেছেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, দীঘি পুষ্করণী কাটিয়েছেন। তুমিও তেমন কিছু কর। ইস্কুল হাসপাতাল করে দাও। সকলের উপকার হবে। শুধু ওদের পেছনে মিছিমিছি এতগুলো টাকা ঢালতে যাচ্ছ কেন? জমিদারি নিয়ে নিয়েছে গবর্মেণ্ট। টাকা তো আর এখন অঢেল নয়। বুঝে শুনে খরচ করতে হবে বৈকি?

অভিজিৎ তখনো চুপ করে আছে দেখে অন্তরঙ্গ সুরে যোগ করলেন, এসব কথা বলা হয়তো আমার উচিত নয়। তবু না বলে পারলাম না। অনেক-দিন তোমাদের নুন খেয়েছি। শেষ বয়সে মাথা গুঁজবার একটু জায়গা যে করতে পেরেছি, আর দুবেলা দুটো ডালভাত জুটছে, সেও তোমাদেরই প্রসাদে।

"এবার প্রতিবাদ করল অভিজিৎ—"না; না; তা কেন হবে? আপনি যা পেয়েছেন, আপনার পরিশ্রমের মূল্য হিসেবেই পেয়েছেন। সে যাক; একাজটা তাহলে কবে করছেন?"

শীতলবাবু বেশ খানিকটা অবাক হয়ে তাঁর পুরাতন মনিবের বর্তমান উত্তরাধিকারীর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, কালই আসতে পারি। "এর জন্যে আপনার যে ফীজ্ পাওনা হচ্ছে, তার এগেইনস্টে কিছু টাকা আজই দিতে বলে দিচ্ছি, বাকীটা বিল দেবার পরেই পেয়ে যাবেন।"—বলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল অভিজিৎ।

অনেক দিন পরে ভোরে উঠে অভিজিৎ আজ তানপুরা নিয়ে বসেছিল। এতদিন কেন যেন ইচ্ছা করেনি। এর জন্যে মনের যে স্থৈর্য, যে প্রশান্তি দরকার সেটা হয়তো নিজের মধ্যে খুঁজে পায়নি। একটা কোনো কাজের মধ্যে মাথা দিলে সেইটাই মন জুড়ে বসে। রোজকার নিয়মিত বাঁধাধরা যে কাজ তার কথা আলাদা। সে তার নিদিষ্ট খোপটির মধ্যেই থাকে, অন্য চিন্তা বা অভ্যাসগুলোর পথ আগলে দাঁড়ায়না। কিন্তু এ অন্য ধরণের কাজ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা, কি জানি কি হবে—এমনি ধারা একটা চিন্তা। রাত্রে শুয়েও তার থেকে মুক্তি নেই। অনেক রাত ধরে তাকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা। ভোরে ওঠার যে দীর্ঘদিনের অভ্যাস, অভিজিৎ লক্ষ্য করেছে, সেটাও ইদানিং সে বজায় রাখতে পারেনি।

কাল থেকে টের পাচ্ছিল মনের মধ্যে একটা প্রসন্ন হাওয়া বইছে। এতদিনে একটা কিছু হতে চলেছে। যা সে মনে মনে চাইছিল তাকে বাইরে এনে দাঁড় করাবার সম্ভাবনা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর কিছু না হোক একটা সূচনা, একটা আয়োজন। তার ভিতরেই অনেকখানি তৃপ্তি পেয়েছিল।

তানপুরা রেখে দিয়ে তার ঘরের সামনেকার প্রশস্ত খোলা ছাদে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। সেখান থেকে গঙ্গা দেখা যায়। শুকনো বালুচরে ঢাকা একটা বিস্তীর্ণ গভীর খাদ। তার তলায় যে শীর্ণ জলরেখা কোনোরকমে বেঁচে থেকে 'নদী'-নামটুকু বহন করে চলেছে, সেটা চোখে পড়ে না। মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে 'কলোনী' নামক এই বীভৎস কুৎসিত জন্তুটা। 'জন্তু', কেননা সে সজীব। প্রতিমুহূর্তে সে কর্কশ কণ্ঠে জানান দিচ্ছে, 'আমি আছি'। আঘাত হানছে মানুষের রুচি, রূপচেতনা ও মানবতা বোধের উপর।

কদিন আগেও সে ওদিকে তাকাতে পারত না, সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিত। বিতৃষ্ণা বেদনা এবং অপরাধ বোধের কেমন একটা মিশ্র অনুভূতি

তাকে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল করে তুলত, আজ সে ভাবটা টের পেলনা। তাকিয়ে রইল এবং দেখল, ঐ বিবর্ণ কেরোসিন টিন ছেঁড়া চট ও ভাঙা টালির জঞ্জালগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং তার জায়গায় ভেসে উঠেছে একটি সুশ্রী, সুবিন্যস্ত পরিচ্ছন্ন বসতি। 'কলোনী' নয়। ঐ কথাটা যে কেন ওরা বেছে নিয়েছে অভিজিৎ বুঝতে পারে না। আসলে ওরা তো বিদেশী নয়, বিদেশ থেকে এসে এখানে 'উপনিবেশ' গড়ে তোলেনি। এই দেশেরই মানুষ, জোর করে বিদেশী করে দেওয়া হয়েছে। 'কলোনী' বলা মানে সেই জোরটাকে মেনে নেওয়া। 'কলোনী' নয় এটা হবে ওদের নিজস্ব বাসস্থান। পূর্ব পাকিস্তানের লোক নয়, ওদের সত্যিকারের পরিচয়—ওরা বাঙালী। এ অঞ্চলে যারা রয়েছে তাদেরই মত এবং তাদের থেকে অভিন্ন। লাইন টেনে এবং গোটাকয়েক পিলার পুঁতে জমি ভাগ করা যায়, কিন্তু একটা দেশ, একটা জাতকে দু'টুকরো করা যায় না।

সকাল বেলার চা-খাবার অভিজিৎ সাধারণতঃ নিজের ঘরে বসেই খায়। সে পর্ব চুকে গেছে। মঙ্গলা এসে কাপ ডিশগুলো সরিয়ে নিয়ে গেছে। কাছারীতে গিয়ে বসবার আগে একখানা মাসিক পত্রের পাতা উলটে দেখছিল। কলোনীর দিক থেকে একটা গোলমাল কানে এল। নতুন কিছু নয়। ঝগড়া মারামারি ওখানকার জীবন যাত্রার নিত্য সহচর। কথায় কথায় স্বামীরা স্ত্রীদের কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়, স্ত্রীরাও কম যায় না। পাল্টা আক্রমণটা শুধু মৌখিক সীমায় আবদ্ধ থাকে না, দা-বটি লাঠি-সোটাতে গিয়েও পৌঁছায়। মাতা কন্যা, পিতাপুত্র, ভাই-ভাইয়ের মধ্যে যে সব বাক্য বিনিময় হয়, সভ্য মানুষের শব্দকোষে খুঁজে পাওয়া শক্ত। প্রতিবেশীরা সেগুলো অম্লান বদনে, কানে আঙ্গুল না দিয়ে স্বচ্ছন্দে শুনে যায়! আজ যারা শ্রোতা, কাল যে আবার তাদেরই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে দেখা যাবেনা, কেউ বলতে পারে না। পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে আশে পাশে লেগে যাবে এ বাড়ির সঙ্গে ও বাড়ির অর্থাৎ এ ঘরের সঙ্গে ও ঘরের।

অভিজিৎ প্রথম প্রথম ব্যস্ত হয়ে উঠত। হলধর কিংবা কিষণকে ডেকে, দেখে আসতে বলত অত গোলমাল কিসের। এখন সয়ে গেছে।

আজকের ব্যাপারটা যেন অন্য রকম। খোঁজ নেবে কিনা ভাবছে, এমন

সময় হলধর এল ছুটতে ছুটতে। এসে বলল ছোটবাবু, শীতল বাবুকে ওরা মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

"বল কি! কোথায় তিনি?"

"কাছারি বাড়িতে।"

অভিজিৎ সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। কাছারিতে ঢুকতেই ফেটে পড়লেন শীতল দত্ত—আমি তোমাকে বলিনি বাবাজী, ঐ পঙ্গপালগুলো মোটেই সহজ পাত্তর নয়? তুমি যাচ্ছ ওদের উপকার করতে!

আরো কি সব বলতে যাচ্ছিলেন। অভিজিৎ জানতে চাইল, কী হয়েছে। উত্তরে যা বললেন তার থেকে জানা গেল, না যাকে 'মার ধোর' বলে তা ঠিক করেনি, তবে কলোনীত ঢুকতে দেয়নি, মাপ জোক করতে বাধা দিয়েছে এবং শীতলবাবু যখন মনিবের দোহাই দিয়ে তার লোকজন নিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করেছেন, গোটা কয়েক ছোকরা এগিয়ে এসে তাঁর যন্ত্রপাতি কেড়ে নিয়েছে, একজন বিদ্রূপ করে বলেছে, আপনার মনিবের যদি মুরদ থাকে, তিনিই আসুন না। আপনি কে?

অভিজিৎ অবাক হয়ে গেল। প্রথমতঃ জরিপের কাজে বাধা দেওয়ার অর্থটা তার বোধগম্য হল না। শম্ভুচরণের সঙ্গে এ সম্পর্কে তার আগেই কথা হয়েছিল। সে কোনো আপত্তি তোলেনি। দ্বিতীয়তঃ ওদের তরফ থেকে এধরণের আচরণ এই প্রথম। ব্যক্তিগত ভাবে ভাল ব্যবহারই বরং পেয়ে এসেছে এতদিন।

কয়েক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর শীতলবাবুর দিকে চেয়ে বলল, চলুন তো, দেখে আসি ব্যাপারটা।

শীতলবাবু বললেন, তুমি নিজে না-ই বা গেলে। ছোঁড়াগুলোর গতিক-সতিক বিশেষ সুবিধের মনে হলনা। তার চেয়ে বরং অন্য কাউকে পাঠিয়ে আমার শেকল-টেকলগুলো আনিয়ে দাও। আমি আর ও-মুখো হচ্ছিনা।

অভি থামলনা। গায় গেঞ্জি, পায় চটি। সেই অবস্থাতেই এগিয়ে গেল। কাছারিতে যারা যারা ছিল, হলধর, কিষণ, দুজন আমলা, তারাও চলল তার সঙ্গে।

কলোনীতে ঢুকবার মুখে বিশেষ কেউ ছিল না। একটু এগিয়েই ওদের পঞ্চায়েতের অফিস। তার ভিতরে ও বাইরে অনেক লোক। কে একজন

বক্তৃতার ঢংএ চড়া গলায় কি সব বলছিল। অভিজিৎকে দেখে বাইরের লোকগুলো সরে গিয়ে পথ করে দিল। সে এদিক ওদিক চেয়ে জানতে চাইল, শম্ভুবাবু আছেন না?

দুচার জনে বলে উঠল, ভেতরে আছে।

ভিতরে যারা ছিল, এতক্ষণে তাদেরও অনেকের নজর পড়েছে এদিকটায়। একটা চাপা চাঞ্চল্য দেখা দিল। বক্তৃতা করছিলেন একটি প্রায়-প্রৌঢ় ভদ্রলোক, এধারে ওধারে তিন-চারটি যুবক। সকলেরই পরণে পরিচ্ছন্ন জামাকাপড়, এবং চেহারায়, হাবভাবে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল যে এক নজরেই বোঝা যাবে তারা এ কলোনীর লোক নয়। কলোনীর একটি ছেলে বক্তার কানের কাছে চাপা গলায় কি বলতেই তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। অভিজিতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, আপনিই বুঝি এখানকার মালিক?

"মালিক কথাটার ভিতরে একটা সুস্পষ্ট বিদ্রূপের টান। অভিজিৎ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। তার আগেই ভিতর থেকে একটা স্বর শোনা গেল—'উনি আমাগো জমিদার।' অভি লক্ষ্য করল সেই মিস্ত্রী, হলঘরের তালা ভাঙতে যাকে ডেকে এনেছিল হলধর, গান-বাজনার আসর বসছে শুনে যে বলেছিল আমরা "এট্টু শোনবোনা?" "শুনবে বৈকি?" বলেছিল অভিজিৎ।

বক্তা এবং তার আশপাশের যুবকেরা রূঢ় দৃষ্টিতে তাকালেন লোকটার দিকে। কলোনীর দু-তিনটি ছেলে ধমকে উঠল, তুমি চুপ রও। সে আর কথা বললনা। অভিজিৎ বক্তা-ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলল, "আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না। আপনি কি এখানে থাকেন, মানে এই কলোনীতে?"

"আমি কোথায় থাকি সেটা আপনার না জানলেও চলবে। তার আগে আমি জানতে চাই, আপনি এই জমি জরিপ করাচ্ছেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে? এদের এখান থেকে উৎখাত করার মতলব যদি থাকে—"

শেষ করবার আগেই ঘরের একটা কোণ থেকে শোনা গেল শম্ভুচরণের গলা, "না, সেরকম কোনো মতলব ওঁর নেই। উনি যা কিছু করতে যাচ্ছেন, সবটাই আমাদের স্বার্থে।"

"আপনাদের স্বার্থে!" ব্যঙ্গের স্বরে বললেন বক্তা ভদ্রলোক। "আপনাকে বুঝি তাই বোঝানো হয়েছে? আমি যদি বলি স্বার্থটা আপনার। আপনি ওঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে কলোনীর সর্বনাশ করতে চলেছেন। আপনি মালিক পক্ষের দালাল।

অনেকগুলো প্রতিবাদ উঠল। কেউ কেউ আবার জোর দিয়ে বলল, ঠিকই বলেছেন উনি।

একটা হট্টগোল উঠল। ভদ্রলোক চেঁচিয়ে কি সব বলতে লাগলেন। গোলমালও চলতে লাগল। অভিজিৎ হাত দিয়ে সবাইকে চুপ করতে ইঙ্গিত করল। আস্তে আস্তে গণ্ডগোলটা থিতিয়ে আসতে ভদ্রলোককে বলল, দেখুন, আপনাকে আমি চিনি না। এদের হয়ে কথা বলবার আপনার কী অধিকার আছে, তাও জানি না।

দু-তিনটি কলোনীর ছেলে একটু উদ্ধত ভাবে বলে উঠল, "উনি আমাদের লীডার।"

"হতে পারেন" উত্তর দিল অভিজিৎ, "কিন্তু এখানকার বাসিন্দা নন।"

"নাই বা হলাম বাসিন্দা," রূঢ় স্বরে বললেন ভদ্রলোক, "আমার এই রিফিউজী ভাইবোনদের, তাদের রাইটস অ্যাণ্ড প্রিভিলেজেস্ রক্ষা করার দায়িত্ব আমরা হাতে তুলে নিয়েছি। এই সব কলোনীর ওপর জমিদারদের যথেচ্ছাচার বন্ধ করাই আমাদের কাজ। এদের অনেক অভাব অভিযোগ আছে। যা নিয়ে কথা বলা দরকার।"

একটু স্বর নামিয়ে বললেন, আপনাদের সঙ্গে বিরোধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আপোষে আলাপ আলোচনার মারফতে সব কিছুর মীমাংসা হয়, এইটাই চাই।"

অভিজিৎ মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, আমি মনে করি, এরা যখন আমাদের জায়গায় এসে উঠেছে, এবং এতদিন বাস করছে, তখন এদের যা কিছু সমস্যা, আমরা আর এরা মিলেই মিটিয়ে ফেলতে পারবো। বাইরের কারো দরকার হবে না।

বলে অপর পক্ষকে আর কোনো বাদানুবাদের অবসর না দিয়েই অভিজিৎ বাড়ির দিকে রওনা হল।

॥ ১১ ॥

কলোনী থেকে বেশ খানিকটা দূর। গঙ্গা হঠাৎ বাঁক নিয়ে ডাইনে সরে গেছে! বাঁ দিকে উঁচু চওড়া পাড়। অনেক গরু চরে দিনের বেলায়। রাখাল ছেলেগুলো চেঁচামিচি করে ড্যাংগুলি, দাঁড়িয়াবাঁধা খেলে। সন্ধ্যার পর স্তব্ধ নির্জন। কাছাকাছি কোনো লোকালয় নেই। কারো কোনো প্রয়োজন নেই এখানে আসবার। একটা ছোট ঢিবির উপর শম্ভুচরণ চুপ করে বসেছিল।

আকাশে চাঁদ ছিল না, কিন্তু অনেক অনেক তারা। তাদের ক্ষীণ আলোয় নীচের শীর্ণ জলধারা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল। দু' হাঁটুর উপর হাত দুখানা জড়ো করে তার উপরে চিবুক রেখে বসে বসে ভাবছিল।

শম্ভুচরণ দর্শন চর্চা করেনা, কবিতা লেখেনা বা পড়েনা। প্রাকৃতিক দৃশ্য বা অধ্যাত্ম চিন্তায় তার উৎসাহ নেই। সে ভাবছিল কলোনীর কথা,—'দেশ' ছেড়ে আসবার পর এই ক'বছর ধরে যা তার ধ্যান জ্ঞান,—এবং সেই সঙ্গে তার নিজের কথা! বিশেষ করে সেদিনকার ঘটনা, পঞ্চায়েত অফিসে যেটা ঘটে গেল। 'দালাল' কথাটা এফোঁড় ওফোঁড় করে বিঁধে গিয়েছিল তার বুকের মধ্যে। প্রতিবাদ অবশ্য করেছিল কেউ কেউ। কিন্তু তার মধ্যে যেন তেমন জোর ছিলনা। তার চেয়ে সমর্থনের সুর এবং ভাষা ছিল অনেক স্পষ্ট। অনেক জোরালো, তারই সামনে দাড়িয়ে কয়েকটা ছেলে, সোজা বলে দিয়েছিল, 'ওকে আমরা বিশ্বাস করি না'। অথচ এরাই একদিন ছায়ার মত ঘুরেছে তার পিছনে, শম্ভুদা বলতে অজ্ঞান।

সে দালাল! মর্মান্তিক বেদনায় হাসি পেল শম্ভুর। নিজের বলতে তার কে আছে, কী আছে? তিন ভাই তারা, মা আর একটি বোন। সুখের সংসার। যথেষ্ট জমিজমা, পুকুর বাগান। বড় দুভাই চাষআবাদ দেখাশুনো করত। শম্ভুকে তারা ইস্কুলে দিয়েছিল। কিছুটা লেখা পড়া শিখে রেজেষ্ট্রী আফিসে দলিল লেখার কাজ নিয়েছিল শম্ভু। ওটা উপলক্ষ্য মাত্র। আসল কাজ ছিল গ্রামে এবং তার আশে পাশে কার কোথায় কী দরকার তাই নিয়ে

ছুটোছুটি। কার নামে বাকী খাজনার মামলা করেছে জমিদার, কিংবা বকেয়া দেনার দায়ে মাল ক্রোকের হুকুম এনেছে মহাজন। খবরটা একবার কানে এলেই হল। কোনো রকমে ছুটো ভাতে ভাত মুখে গুঁজে কুড়িমাইল পথ হেঁটে সদরে ছুটল শম্ভুচরণ। তারপর একটানা উকিল, মোক্তার মুহুরি পেশকার সাক্ষী সাবুদ, দলিল দস্তাবেজ, তদ্বির তদারক। দিন চারেক পরে আধমরা হয়ে ফিরল বাড়িতে। বাড়ির লোক, আত্মীয় প্রতিবেশী সকলের মুখেই এক অভিযোগ—কী দরকার তোমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার? ওরা তোমার কে যে না খেয়েদেয়ে কোন বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে পড়ে আছ, এতে করে লাভটা কি হচ্ছে শুনি? ঘরে ছুপয়সা আসছে?

শম্ভু মুচকে মুচকে হাসত। লাভ কিছু নেই। ঘরে ছুপয়সা আসা দূরে থাক বরং তার সামান্য রোজগারের সবটাই বেরিয়ে যেত 'বনের মোষের' পিছনে। তবু ওটা ছিল ওর নেশা। ঐ জাতীয় আবার একটা কিছু উপলক্ষ পেলেই আর তাকে পায় কে? দাদারা প্রশ্রয়ের সুরে বলত, করুক গে যা খুশি। স্নেহের চোখে দেখত বাউণ্ডুলে ছোট ভাইটাকে। মায়ের চেষ্টা ছিল ছেলেকে কোনো রকমে বেঁধে ফেলা। ছুখানি কাঁকনপরা কোমল হাতের খোঁজও চলছিল ভিতরে ভিতরে।

এমন সময় এল প্রলয়। সব তছনছ হয়ে গেল—ধন প্রাণ আশা আকাঙ্ক্ষা একটা জাতির গোটা ভবিষ্যৎ।

তাড়া খেয়ে খেয়ে এপারে এসে পৌঁছল শম্ভুচরণ। সঙ্গে নিজের বলতে শুধু মা। ছুই দাদা গেছে লুঠেরাদের লাঠির ঘায়ে, তাদের ছেলে মেয়েরা কোথায় ছিটকে পড়েছে কেউ জানেনা। বৌদের পাত্তা নেই, বয়স্কা ছোট বোনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ও পাড়ার ছোকরারা। শম্ভু বাড়ি থাকলে তাকেও দাদাদের অনুসরণ করতে হত। দূরে কোথায় গিয়েছিল। পরদিন ফিরে দেখল পোড়া বাড়ির ছাই গাদার মধ্যে বসে কপাল চাপড়াচ্ছে মা।

কাছাকাছি এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে যারা প্রাণে বেঁচে ছিল তারা এসে দাঁড়াল ওকে ঘিরে। এক পাল নানাবয়সী মেয়েপুরুষ, কাচ্চা বাচ্চা। তারই মত নিঃস্ব, অসহায়, বিভ্রান্ত। এতদিন ছোটো খাটো আপদে বিপদে যাদের টেনে এসেছে, এই চরম সর্বনাশের মধ্যে তাদের ফেলবে কোথায়? সবাইকে নিয়েই বেরিয়ে পড়ল শম্ভু। পথে আসতে আসতে আরো কত জুটল।

যাদের সে চেনেনা, কোনোদিন চোখেও দেখেনি একান্ত আপনজনের দাবি নিয়ে কাছে সরে এল।

বিপদ মানুষকে এক করে। রক্তের টানের চেয়েও তার জোর বেশী।

এপারে এসেও সেই এক পাল মানুষ নিয়ে জড়িয়ে পড়ল শম্ভু। কী দরকার ছিল? মায়ের হাত ধরে কোথাও একটা আশ্রয় জুটিয়ে নিয়ে দুজনের মত মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা সহজেই করে ফেলতে পারত। কিসের দায় তার এতগুলো লোকের বোঝা বইবার? কিন্তু স্বভাব যায়না মলে।

পরের ক'বছরের ইতিহাস অতি কঠোর। একদিকে এতগুলো লোকের খাওয়া পরা, মাথার উপর একটু যেমন তেমন ছাউনির জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম, আরেক দিকে ঐ জমিটুকুতে টিকে থাকবার কঠিন সংগ্রাম। প্রবল প্রতিপক্ষ। সদর নায়েব, তার পিছনে পুলিস। বহু বাধা সত্ত্বেও যে এতবড় কলোনীটা গড়ে উঠতে পেরেছিল, তার মূলে রয়েছে শম্ভুচরণ সরকারের নিঃস্বার্থ ক্লান্তিহীন চেষ্টা, ধীরবুদ্ধি, এবং নিপুণ সংগঠন।

কলোনীর লোকেরা অবশ্য একবাক্যে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিল তাকে। তা না হলে একা আর সে কী করতে পারত? ছোটখাটো মতবিরোধ যে দেখা দেয়নি, তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। 'শম্ভু যখন চাইছে, তাই হোক।' 'শম্ভুদার যখন ইচ্ছা, তার ওপরে আর কথা নেই।'—এই ছিল কলোনীর সাধারণ মনোভাব।

অভিজিৎ আসার আগে পর্যন্ত কলোনীর প্রধান সমস্যা ছিল টিকে থাকার সমস্যা। সংখ্যা ছাড়া আর সব দিক দিয়েই তারা দুর্বল। শম্ভু সেটা জানত। তার পথ ছিল আপসের পথ। সংখ্যার জোরে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেওয়া চলত। সে প্ররোচনা যে না এসেছে তা নয়। কিন্তু শম্ভু সেটা কঠোর হাতে দমন করেছে। তাতে সাময়িক কিছু লাভ হলেও আখেরে লোকসান। বিপক্ষের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া। কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা এবং সেই সঙ্গে কিছুটা চাপ সৃষ্টি করে একটা দুটো করে কিছু কিছু সুবিধা আদায় করা, যে নড়বড়ে খুঁটির উপর তারা দাঁড়িয়ে আছে, সেটাকে পোক্ত করে বসানো—এই ছিল তার 'পলিসি'।

অভিজিৎ আসবার পর এই পথটা সুগম হল। শম্ভুচরণ কয়েকদিনের

মধ্যেই টের পেল, এই মানুষটার মধ্যে জমিদারের রক্ত যেমন আছে, তেমনি একটা হৃদয়ও আছে, সেখানে তার বংশের ছাপ পড়েনি। সেইটিই হবে কলোনীর প্রধান অবলম্বন। শম্ভু দুর্গামোহনের সঙ্গে দেখা করল। এই প্রাক্তন ছাত্রটির উপর তাঁর যে প্রবল প্রভাব সেটা সহজেই বোঝা গিয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে ভরসা পেয়ে সরাসরি যোগাযোগ করল 'মালিকের' সঙ্গে। দেখল, এক জায়গায় তারা এক। তার মত উনিও উদ্বাস্তুদের কল্যাণ চান, কলোনীটাকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে চান। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে তফাৎ আছে। এঁর কাছে যেটা মুখ্য, ওর কাছে সেটা গৌণ। কিন্তু সে প্রশ্ন তুলতে গেলে তার মীমাংসাতেই অনেক সময় চলে যাবে, কাজ এগুবে না। তার চেয়ে চলুন উনি ওঁর নিজের পথে, আমি সেইটাই মেনে নেবো— এই সিদ্ধান্ত নিল শম্ভু। এতদিন জমিদার পক্ষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল বিরোধের, এবার হল সহযোগিতার।

ঠিক এই সময়েই ম্যানেজারের আবির্ভাব। এমনিতে এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। জমিদারি না থাক, তার সেরেস্তা আছে, নানা রকম সমস্যা আছে। সুতরাং ম্যানেজার একটি চাই বৈ কি? কিন্তু এখানে যিনি এলেন তিনি শুধু একজন ম্যানেজার নন, 'মেয়ে ম্যানেজার' অর্থাৎ একটি জীবন্ত ও চাঞ্চল্যকর 'ঘটনা'।

একদিন জমিদার ও তার সেরেস্তার সঙ্গে যা কিছু কথাবার্তা বোঝাপড়া, সে সবের ভার ছিল শম্ভুর উপর। সে একাই আসতো যেত। ও নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না। এবার গোটা কলোনী কৌতূহলী হয়ে উঠল। শুধু তরুণ দল নয়, প্রবীনেরাও সরস ঔৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। একা একটি তরুণী মহিলার সামনে বসে সহজভাবে কথাবার্তা চালাতে শম্ভুও ঠিক স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল না। প্রস্তাব করল, নতুন ম্যানেজারের কাছে কলোনীর দাবি দাওয়া নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালে কেমন হয়? সবাই যেন লুফে নিল কথাটা। কদিন ধরে চলল প্রতিনিধি নির্বাচনের পালা। প্রথম যে তালিকাটি তৈরী হল তার দৈর্ঘ্য এত বড় যে ম্যানেজারের কামরা দূরে থাক, উপরের হলঘরেও বোধহয় তাকে সামাল দেওয়া যায় না। কাট ছাঁট করতে গিয়ে বাধল বিভ্রাট। কে থাকবে আর কে কাটা পড়বে তাই নিয়ে ঘোর বাদ

বিতণ্ডা। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মত কোনো তালিকা তো দাঁড় করানো গেলই না, বরং তলায় তলায় অন্যান্য অবান্তর ব্যাপার নিয়ে যে সব বিবাদ বিসংবাদ রেষারেষি দলাদলি চলছিল (অনেক লোক এক জায়গায় জড়ো হলে যা চলে থাকে) এই উপলক্ষে সেগুলো স্পষ্ট ও প্রকাশ্য আকার নিয়ে বসল। একদলের সঙ্গে আরেক দলের মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

ওদিকে বারবার তাগিদ আসছে সেরেস্তা থেকে। অভিজিৎ নানারকম প্ল্যান নিয়ে ব্যস্ত এবং তার কোনো একটাকে রূপ দিতে হলে এ'দের সঙ্গে একটা খোলাখুলি আলোচনা দরকার। এটা হবে প্রধানতঃ ম্যানেজারের মারফৎ। কদিন অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত একাই যেতে হলো শম্ভুকে। শুধু একদিন নয়, দুচার দিন অন্তর অন্তর। অভিজিৎ তখন তার 'কটেজ স্কীম' নিয়ে পড়েছে। শম্ভুকে তার ঘনঘন দরকার।

কলোনীর নবীন ও প্রবীণ—দুমহলেই সরস আলোচনার খোরাক জুটল। প্রথমে চাপা, শম্ভুর অগোচরে, ক্রমশঃ প্রকাশ্যে, তারপর একেবারে সামনা-সামনি। "হনহন করে কোথায় চললে শম্ভুদা? ওখানে বুঝি? বেশ বেশ! "কেমন চলছে ভায়া? খুব জমেছে শুনলাম। কিছু সুবিধে-টুবিধে হল?"—সুবিধে কথাটায় মধ্যে গূঢ় ইঙ্গিত।

শম্ভু শুনে যেত, গায়ে মাখত না। এগুলোর উপরে কোন গুরুত্ব দিত না, কিন্তু ক্রমশঃ বুঝতে পারল, তলায় তলায় আরেকটা জিনিস ঘটছে যাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একদল ছেলে ছোকরার মধ্যে তার উপরে একটা বিরূপ মনোভাব কিছুদিন থেকেই চলছিল, এই ব্যাপারটাকে আশ্রয় করে সেটা দানা বাঁধবার সুযোগ পাচ্ছে। কিছু কিছু বড়দের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে সেটা।

কলোনীর যুবসমাজে নানারকম অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছে, সেকথা শম্ভুর অজানা ছিল না। কারণগুলোও সে দেখতে পাচ্ছিল। তার কোনোটাই তার তৈরী নয়, স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। প্রতিকারও তার হাতে নেই। তবু আঁচটো তাকেই সইতে হবে। সেজন্য তার ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু ভাবনা হচ্ছিল।

এই লোকগুলো যখন প্রথম এল, দুমুটো অন্নের জন্যে কোনো কাজেই পেছপাও হয়নি, অন্যের জমিতে জন খেটেছে, ষ্টেশনে গিয়ে কুলির কাজ

করেছে, মাল বয়ে নিয়ে গেছে এগ্রাম থেকে ওগ্রামে, মাথায় করে তরিতরকারি ফেরি করেছে, রিকস চালিয়েছে, রাস্তার ধারে ছোটখাটো দোকান নিয়েও বসেছে কেউ। সহরে গিয়ে গৃহ-ভৃত্যের কাজেও লেগেছে দু চার জন, যদিও এখানে সেটা গোপন রয়ে গেছে। যারা অক্ষম দুর্বল, তাদের একটা দল নিয়েছে ভিক্ষার আশ্রয়। বড়দের মধ্যে এখনো ঐসবগুলোই সাধারণ জীবিকা।

তখন যারা ছোট ছিল তারপর বড় হয়েছে। তারা এ সব কাজ করতে রাজী নয়। এর মধ্যে অনেকে কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে। চারদিকের হালচাল দেখে চোখ ফুটেছে, তারা অন্য কাজ চায়। কায়িক পরিশ্রমে আপত্তি নেই, কিন্তু ক্ষেতমজুর, মালটানা কুলি, ফেরিওয়ালা বা চাকর হতে চায় না। কলকারখানায় ঢুকে কালিঝুলি মেখে খাটতে প্রস্তুত, যদি নামের শেষে ফিটার, টার্নার, মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান বা ঐ গোছের একটা কোনো ভদ্র গোছের অভিধা থাকে। নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করে দু-একজন জুটিয়েও নিয়েছে অমনি ধারা কোনো কাজ যার সঙ্গে শুধু হাত নয়, হাতিয়ারের যোগ আছে। বেশির ভাগ বেকার।

পরিবর্তনটা মেয়েদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে। কিশোরী এবং যুবতীরা তাদের মা-দিদি-বৌদির মত বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসন মাজবেনা, রান্না করবেনা, ঘুঁটে দেবেনা, ছেলেপিলে রাখবেনা। তারা নার্স হবে, সেলাই-এর কল চালাবে, বিভিন্ন ফ্যাক্টরির নারী বিভাগে, অফিসে-দোকানে 'চাকরি' করবে। কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে গৃহস্থ পাড়ায় স্নো, পাউডার, দাঁতের মাজন, আচার বড়ি নিয়ে ঘুরতেও প্রস্তুত। খাটতে রাজী, কিন্তু সে খাটনির মধ্যে 'মান-সম্মান' থাকা চাই।

কে মেটাবে এই ক্রমবর্ধমান 'কাজের' চাহিদা? কোথায় কাজ? কালোনীর উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা তা বোঝেনা। তারা অধীর হয়ে উঠছিল। অধীরতা থেকে জন্ম নিচ্ছিল ঔদ্ধত্য, উচ্ছৃঙ্খলতা। বাপ-মা-কাকা দাদাদের মানেনা। কিছু বলতে গেলে দু কথা শুনিয়ে দেয়। একদা শম্ভুর যে প্রভাব ছিল তরুণ দলের উপর—বলতে গেলে একচ্ছত্র প্রভাব—ধীরে ধীরে তাতে ভাঙন ধরতে শুরু করেছিল।

শম্ভুর ভরসা অভিজিৎ। তার প্রাণ আছে, তাদের জন্যে অনেক কিছু

করবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু তার জন্যে সময় চাই। রাতারাতি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তা তো নয়। তার যারা একান্ত অনুগত তাদেরও একথা বোঝানো ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠছিল। জমিদারের সঙ্গে তার এতটা 'দহরম মহরম'ও অনেকে সন্দেহের চোখে দেখছিল। কে জানে তলায় তলায় কী মতলব আঁটছে লোকটা ?

প্রকৃতি শূন্য সহ্য করেনা। কলোনীর জীবন থেকে শম্ভু যেমন যেমন সরে যাচ্ছে, অন্য লোক এসে জুড়ে বসছিল সেই ফাঁকা জায়গায়। বাইরের মানুষ, চেহারায়, পোষাকে কথাবার্তায় অনেক বেশী 'সম্ভ্রান্ত', 'বাবু'-স্তরের লোক। প্রথমটা এরা তাদের বিশেষ আমল দেয়নি। কিন্তু তারা লেগে রইল, প্রায়ই আসতে লাগল দলে দলে। বোঝাতে লাগল, আমাদের কোনো স্বার্থ নেই, আপনাদের জন্যই এসেছি। এতদিন তো জমিদার আর সরকারের মুখ চেয়ে রইলেন। কী করল তারা ? এবার আমাদের কথা শুনুন, নাম লেখান আমাদের পার্টিতে, আসুন এক সঙ্গে কাজে নামি। দেখুন কী করতে পারি আমরা।

লোভনীয় ভবিষ্যৎ তুলে ধরল চোখের সামনে। সব চেয়ে যেটা বড় প্রয়োজন—কাজ ! তার আশ্বাস পাওয়া গেল। ছেলেরা ভিড়তে লাগল আস্তে আস্তে।

ছোটো খাটো নেতারাও আসতেন মাঝে মাঝে। পঞ্চায়েত ঘরে সভা করতেন। বলতেন, কে বলে আপনারা অবাঞ্ছিত উদ্বাস্তু ? আপনারা দেশের সম্পদ। আপনাদের কল্যাণে-ই দেশের কল্যাণ। সেই ব্রত নিয়ে এসেছি আমরা।

সব খবর শম্ভুর কানে পৌঁছত না। তবু কিছু কিছু জানত। এই কল্যাণ-কামীদের উপরে তার বিশেষ আস্থা ছিল না। এর চেয়েও বড় দুর্দিনে এই নেতাদের দ্বারে দ্বারে সে অনেক ঘুরেছে। কেউ মুখ তুলেও তাকাননি। সোজা বলে দিয়েছেন, "আমরা কী করবো, অকল্যাণ্ড হাউস-এ যান। আপনাদের সব দায়িত্ব গবর্মেণ্টের।" কেউ কেউ একথাও বলেছেন, এলেন কেন নিজের দেশ ছেড়ে ?

আজ যে হঠাৎ তাদের দরদ উঠলে উঠল এই উদ্বাস্তুদের জন্যে তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। এদের দলে না ভেড়াই ভাল। ছেলেদেরও

সে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, বুঝে শুঝে শুনে চলো। ফল হয়েছে উলটো। তারই উপরে সন্দেহ করেছে তারা। এবং শেষ পর্যন্ত শুনতে হল, সে 'দালাল'!

কাছাকাছি কোথাও একপাল শেয়াল ডেকে উঠল। অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার উঠতে হয়। কিন্তু উঠবার মত জোর খুঁজে পাচ্ছিল না শম্ভুচরণ। সেই কলোনীতে ফিরে যেতে হবে, যেখানে সে আজ অবাঞ্ছিত! অথচ এতদিন ধরে সে কী না করেছে এই লোকগুলোর জন্যে!

মা জেগে বসে আছে। হয়তো ঘর-বার করছে। বলে আসেনি, এত দেরি হবে। একগাদা অনুযোগ শুনতে হবে। সবাইকে হারিয়ে মা যেন আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরছে তাকে।

ফেরার পথে চলতে চলতে ভাবছিল, মাকে নিয়ে চলে গেলে কেমন হয়? আন্দামান কিংবা দণ্ডকারণ্যে? আবার নতুন করে জীবন শুরু করা নতুন মানুষের মধ্যে। সেই ভাল। তার উপরে যাদের আস্থা নেই, যাদের চোখে সে আজ—

"কে ওখানে?"

চমকে উঠল শম্ভু। কারা যেন আসছিল সামনের দিক থেকে। তাদের কারো গলা। এগিয়ে আসতেই চিনতে পারল। কলোনীর তিনটি ছেলে। প্রত্যেকের হাতে লাঠি। সমস্বরে কলরব করে উঠল—শম্ভুদা! কোথায় গিয়েছিলেন এত রাত্রে! আমরা এই সারা তল্লাটে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

শম্ভুর হঠাৎ মনে হল, এদের ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় নেই। এখানেই তাকে থাকতে হবে।

॥ ১২ ॥

দুর্গামোহন নেই। মাস দুই আগে রানীগঞ্জে গেছেন, মেজোছেলের কাছে। শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। বিশেষ কোনো অসুখ নয়, ভিতরে ভিতরে জোর পাচ্ছিলেন না। মেয়েকে কিছু বলেননি। সে নিজে থেকেই টের পেল এবং ব্যস্ত হয়ে উঠল। দুর্গামোহন বোঝালেন, ভাববার মত কিছু হয়নি। কলকব্জাগুলো ক্ষয়ে আসছে। কালধর্ম বলে একটা জিনিস আছে না? তাকে ঠেকাবে কেমন করে।

এ যুক্তি টিকলনা। ছেলেরা এল। 'বড়'র বাসা কোলকাতায়। সেখানে উনি যেতে রাজী হলেন না। কাজেকর্মে দু-একদিন যে গেছেন শ্যামবাজারে সেই গলির মধ্যে, তাতেই হাঁপিয়ে উঠেছেন। 'মেজো'কে এড়াতে পারলেন না। রানীগঞ্জ ফাঁকা জায়গা, দূরে পাহাড়, দৃশ্যপট সুন্দর, জলহাওয়া ভালো।

যেতে হল।

মাস্টার মশাই-এর অভাবটা বিশেষভাবে অনুভব করছিল অভিজিৎ। কলোনীর ব্যাপারে তার চিন্তাভাবনা পরিকল্পনা সবই তিনি শুরু থেকে জানেন। সে নিজেই অকপটে খুলে বলেছে। তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, কোথাও হয়তো তার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। অভিজিৎ প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তিকে মেনে নিয়েছে। মাস্টার মশাই-এর বুদ্ধি পরামর্শই শুধু যাচনা করেনি তার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছে। নিজের সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সচেতন। বিদ্যা বুদ্ধি হয়তো কিছুটা দিয়েছেন বিধাতা, কিন্তু যাকে বাস্তববুদ্ধি বলে সেখানে তার দৌড় কতখানি সে ভাল ভাবেই জানে। অথচ কাজে নামতে হলে ঐটিই প্রথম প্রয়োজন। তার সঙ্গে অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে মানবচরিত্র সম্বন্ধে। এখানেও তার জ্ঞান, অতি সীমিত। সেদিক দিয়ে মাস্টার মশাইয়ের উপর নির্ভর করা চলে। দীর্ঘজীবন ধরে মানুষ চরিয়ে মানুষ। সংসারের অনেক কিছু দেখেছেন, শুনেছেন এবং ঠেকে শিখেছেন।

দুর্গামোহন যদিও অবসর নেবার পর অনেকটা নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন, তবুও তাঁর এই পরম স্নেহভাজন হৃদয়বান ছাত্রটির ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেননি। একে প্রথম দেখেছিলেন যখন সে একেবারে ছেলেমানুষ। দীর্ঘকাল পরে আবার যখন দেখলেন, লক্ষ্য করলেন তখনো সে সাংসারিক ব্যাপারে ছেলেমানুষই রয়ে গেছে। জন্মসূত্রে জমিদার, কিন্তু জমিদারের বিষয়বুদ্ধি নিয়ে জন্মায়নি। পরেও আয়ত্ত করতে পারেনি। মনের কাঠামোটাই অন্য রকম। প্রাণ আছে। মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে দুঃখ পায়, সাধ্যমত দূর করবার কথাও ভাবে কিন্তু উপায় খুঁজতে গিয়ে অসহায় বোধ করে।

বৌরানীর চিঠি যখন তাকে এখানে নিয়ে এল, প্রথমটা অনাসক্ত মন নিয়েই এসেছিল অভিজিৎ। কটা দিন কাটিয়ে দেওয়া, তারপর ফিরে যাওয়া তার সেই পুরনো জীবনে। এখানকার যেটা বড় সমস্যা, এই 'জবর দখল কলোনী,' তার একটা সমাধানের প্রয়োজন বোধ করেছিল। কিন্তু তার মধ্যে নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়াতে চায়নি। লোকজন দিয়ে যতটা হয়। ম্যানেজার নিয়োগের উদ্দেশ্যও তাই। তারপর, লক্ষ্য করেছিলেন দুর্গামোহন, এই বাস্তুহারা মানুষগুলো ধীরে ধীরে তার চিন্তাভাবনার অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসল। এদের জন্যে একটা কিছু করা দরকার, এই অবস্থায় এতগুলো মানুষকে ফেলে যাওয়া যায় না—এমনি ধারা একটা মনোভাব ক্রমশঃ গড়ে উঠতে লাগল। সে নিজে হয়তো ততটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু দুর্গামোহন টের পেলেন। মনে মনে হাসলেন—জড়াবোনা বললেই কি হয়? কখন কোথা থেকে কোন বন্ধন এসে পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেউ বলতে পারে না।

মাস্টার মশাই-এর কাছে প্রথম প্রথম যখন আসত অভিজিৎ, তাদের মধ্যে নানা বিষয়ের আলোচনা হত। সাহিত্য, দর্শন, দেশের অবস্থা, তার কাশীর জীবন এবং আরো অনেক কিছু। দিনে দিনে কথাবার্তার ধারা একটা প্রধান খাতে গিয়ে দাঁড়াল—রিফিউজী! কী করা যায় এদের নিয়ে, কী ভাবে কতটা রিলিফ দেওয়া যায়, তারই নানা সম্ভব অসম্ভব প্রস্তাব ও পরিকল্প।

এক একটি পরিবারের জন্যে আলাদা আলাদা কটেজ তৈরির প্ল্যানটা

দুর্গামোহন জেনে যাননি। তিনি যখন ছিলেন তখন পর্যন্ত ওটা অভিজিতের মনে ঠিক দানা বেঁধে ওঠেনি। কল্পনায় ছিল, পরিকল্পনার স্তরে গিয়ে পৌঁছায়নি। ঐ বেড়াভাঙা, ছেঁড়া চটেঘেরা টালির চালাগুলোর মধ্যে নানা বয়সী মেয়েপুরুষ—বাপ মা ভাই বোন পুত্রবধূ যেখানে বাস করে, ('বাস করা' কথাটা বড় বেশী ভদ্র হয়ে গেল) যে-ভাবে মাল গুদামে গাদা দেওয়া জিনিসপত্রের মত পড়ে থাকে, সেকথা যখন উঠত তখনই বিশেষ করে বিচলিত হয়ে পড়ত অভিজিৎ। ওদের খাওয়া পরার অভাব, সব কিছু হারিয়ে আসার মতস্তাপ এবং হাজার রকমের দুঃখ দুর্দশা—এ গুলোর কোনটাকেই সে ছোট করে দেখেনি, কিন্তু তার মনকে সব চেয়ে বেশী পীড়া দেয় 'ঐ রকম করে থাকাটা।' তার বিশ্বাস,—এবং সেকথা সে জোর দিয়ে বলত মাষ্টার মশাই-এর কাছে—শ্লীলতা,—শালীনতা-লজ্জা সম্ভ্রম-বোধের অভাবই মানুষের সব চেয়ে বড় অভাব। ঐ ভাবে থেকে থেকে ঐ গুলো ওদের চলে যাচ্ছে, অনেকটা চলে গেছে এবং আর কিছুদিন পরে একেবারেই চলে যাবে। তখন আর ওরা মানুষ থাকবেনা জন্তু-জানোয়ারের স্তরে গিয়ে পৌঁছবে।

দুর্গামোহন শুনে যেতেন, প্রতিবাদ করতেন না। একদিন শুধু বলেছিলেন, ওরা ঐ ভাবে আছে বলে তুমি যতটা কষ্ট পাচ্ছ, ওরা নিজেরা বোধহয় ততটা কষ্ট পায় না।

"সেইটাই তো আরো মারাত্মক" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল অভিজিৎ, "মনের সূক্ষ্ম ধারগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে, লজ্জা-সরমের বোধশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলছে মানুষগুলো।"

আরেকদিন বলেছিল আমরা কটা প্রাণী এত বড় একটা বিশাল প্রাসাদ আগলে রেখেছি, যার সিকিভাগের সিকিভাগও আমাদের কাজে লাগছেনা, আর তার ঠিক পাশেই অতগুলো মানুষ মাথা গুঁজবার মত এতটুকু জায়গা পাচ্ছেনা, একথা যখন ভাবি, বড় লজ্জা হয়, স্যার। অন্ততঃ গোটা দুই মহলের দরজাগুলো খুলে দিলে কেমন হয় একথাও যে মনে না হয়েছে, তা নয়। তারপর ভেবে দেখেছি এনে তুললেই তো হলনা। ওখানে গিয়ে ওরা কখনো সহজ বা স্বচ্ছন্দ হতে পারবেনা। দে উইল নট্ ফীল অ্যাট হোম্। নিজের নিজের ঘর সংসার গুছিয়ে নিয়ে বসবার মত ব্যবস্থা বা

পরিবেশ তো নেই, তৈরি করাও যাবে না। কোনো একটা যোগটোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা যেমন ধর্মশালায় গিয়ে ওঠে, এও হবে অনেকটা তাই। তবু না হয় দেখা যেত চেষ্টা করে। কিন্তু একটা বড় কারণ আছে যার জন্যে ওটা হবার নয়।

কারণটা সঙ্গে সঙ্গে জানায় নি অভিজিৎ। কিন্তু দুর্গামোহন অনুমান করেছিলেন। তাই কোনো প্রশ্ন না করে অপেক্ষা করে রইলেন। অভিজিৎ কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলল, ঐ বাড়িটাকে আমি যে চোখেই দেখি, বৌ-রানীর কাছে ওর একটা আলাদা রূপ আছে। প্রথম প্রথম বুঝিনি, পরে দেখেছি, ঐ শূন্য ঘর দোর বারান্দা, চাতাল সিঁড়ি এবং বোধহয় দেয়ালের ইট কাঠগুলোও ওঁর কাছে জীবন্ত। একদিনের কথা আপনাকে বলবো। সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফিরে দেখি মাঝের মহলের একটা অন্ধকার ঘর থেকে ছায়ার মত বেরিয়ে আসছেন। আমাকে দেখতে পেলেন না, কেমন যেন আচ্ছন্নের মত আরেকটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। এমনি করে গোটা মহলটা ঘুরে বেড়ালেন। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন।

দুর্গামোহন আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, জানি; আমি হলধরের কাছে শুনেছি। মাঝে মাঝে অমনি করে উনি ঘুরে বেড়ান। তুমি ঠিকই বলেছ। ঐ বাড়িটার সঙ্গে ওঁর সারা জীবনটা জড়িয়ে আছে—হার হোল একজিস্‌টেন্স্। ওর মধ্যেই উনি বেঁচে আছেন।

সকলের দৃষ্টি তো সমান নয়। সব সমস্যাকেই বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দিক থেকে দেখে। একজনের কাছে যেটা সঠিক সমাধানের পথ, আরেকজনের কাছে সেটা ভুল, অর্থহীন। অন্যেরা যে-যা-ই মনে করুক, অভিজিৎ তার নিজস্ব চিন্তাধারায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, তার কলোনীর লোকগুলোর প্রথম প্রয়োজন ভদ্রভাবে থাকবার মত বাসস্থান। ঐ অভাবটাই সবচেয়ে বড় অভাব। হয়তো তার এই চিন্তাধারার জন্যে দায়ী তার বিশেষ মানসিক গড়ন, সচ্ছল স্বচ্ছন্দ এবং সম্ভ্রান্ত জীবনযাত্রা থেকে যার জন্ম। অপেক্ষাকৃত উপর স্তরের মানুষ। অন্নবস্ত্রের অভাব কোনোদিন টের পায়নি। তার যে যন্ত্রণা সেটা সে বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে বোঝে, জীবন দিয়ে বোঝে না। ক্ষুধার্তের জন্য তার

যে অনুভূতি তার মূলে অভিজ্ঞতার জ্বালা নেই। যে কারণেই হোক, এরা খেতে পরতে পাচ্ছেনা, সেটা প্রত্যক্ষ করেও এদের বসবাসের নির্লজ্জ দৈন্যটাই সে আগে দূর করতে চেয়েছিল।

এ নিয়ে বৌ-রানীর সঙ্গে তার যেদিন কথা হয়েছিল তিনি শুধু শুনে গিয়েছিলেন এবং এটুকু যখন বুঝতে পারলেন এদিকে তার মন অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তখন আর কিছু বুঝবার চেষ্টা করেননি, প্রয়োজনও বোধ করেননি। ও যা ভালো মনে করে করুক। এ বাড়ির কর্তারা খেয়ালের বশেই চলেছেন চিরকাল। তাদেরই তো বংশধর। সুতরাং এও সেই একই পথে চলবে, এইটাই ধরে নিতে হবে। তাঁরা পূজা-পার্বণে যাত্রা মাইফেলে টাকা ঢেলেছেন, এ ঢালছে উদ্বাস্তুদের পেছনে। এও খেয়াল, শুধু চেহারাটা আলাদা। কিছু একটা নিয়ে যে মেতে উঠেছে, এতেই তিনি খুশী। ভেসে বেড়াচ্ছিল, এবার যদি বাঁধা পড়ে।

অভিজিৎ যখন জানতে চাইল, কী মনে হয় তোমার? বৌ-রানী শুধু বললেন, 'বেশ তো, করনা।' হয় তো এর ভিতরে একটা জিনিস তিনি মন্দের ভালো বলে মনে মনে স্বাগত জানিয়ে থাকবেন। ঐ বস্তিটা তাঁর চোখের উপর থেকে এক পাশে সরে যাচ্ছে। বাড়িগুলো, অভিজিৎ যার নাম দিয়েছে 'কটেজ', তৈরি হচ্ছে ও ধারটায়। সদর মহলের দোতলার খোলা ছাদে গিয়ে দাঁড়ালে আবার গঙ্গা দেখা যাবে। একরাশ খোলার চালা আর একগাদা নোংরা লোক দৃষ্টি আগলে দাঁড়াবেনা। উদয়াস্ত তাদের চেঁচামিচি ঝগড়াঝাঁটি কানছুটো ঝালাপালা করে দেবে না।

বৌরানীকে যেমন বলেছিল, তেমনি তার ভাবনাগুলো নীহারের কাছে বসে ব্যক্ত করবার একটা ইচ্ছাও প্রথমটায় জেগেছিল তার মনে। তারপর আর তেমন উৎসাহ বোধ করেনি। ওসব কথা বলতে গেলে একটা অন্তরঙ্গতার পরিবেশ চাই। তাদের দুজনের মধ্যে সেটা ঠিক গড়ে ওঠেনি। কোন তরফ থেকেই তার চেষ্টা হয়নি। হৃদ্যতা ও সৌজন্যের অভাব হয়নি, কিন্তু সম্পর্কটা অনেকখানি যাকে বলে 'অফিশিয়াল' স্তরেই রয়ে গেছে। অভির মনে রয়েছে স্বাভাবিক সংকোচ—পাছে উনি মনে করেন সে তার পদ ও কর্তৃত্বের অন্যায় সুযোগ নিচ্ছে। 'মালিক' হবার অসুবিধা অনেক। বিশেষ করে অপর পক্ষ যেখানে মহিলা, তরুণী মহিলা।

তাছাড়া ও তরফেও একটি শান্ত আনুগত্য ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করেনি। যা করতে বলা হয় ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে চলে যায়। নিতান্ত যেটুকু কাজের কথা—যা না বললে নয়—তার বেশী তার মুখে কখনো শোনা যায় না। অভিজিৎও তাই ম্যানেজার ও তার নিয়োগ কর্তার যে সম্বন্ধ তার বাইরে নিজেকে বিস্তৃত হতে দেয়নি।

নীহারের কাছে তার এই মনিবটি শুরু থেকেই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। কথাবার্তায় ব্যবহারে অত্যন্ত সহজ সাবলীল, অকৃত্রিম সহৃদয়তার অভাব নেই। তবু তার মধ্যে এমন কিছু থাকে, যা তাদের ভিতরকার দূরত্বটা কেমন করে যেন বুঝিয়ে দেয়। নেহাৎ কম দিন হল না, রোজ না হলেও প্রায়ই দেখাশুনো হয়, কথা হয়, কখনো ওঁর ঘরে কখনো বা তার ঘরে, তাকে ডেকে না পাঠিয়ে নিজেই যখন চলে আসেন। বসেন তার ছোট টেবিলটার ওধারে। মাঝে মাঝে কিছু একটা দেখাতে কিংবা চিঠিপত্রে সই নিতে তাকে ওঁর আরো ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু সেটা যে তিনি অন্ততঃ মনে মনেও অনুভব করছেন এমন কোনো লক্ষণ সে দেখতে পায়নি। তার বয়সী একটি মেয়ের সম্বন্ধে আগ্রহ দূরে থাক, সামান্য কৌতূহলও যেন নেই।

এমন মানুষের কাছ থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে দূরে রাখা ছাড়া আর কী করতে পারে নীহার? এ নিয়ে যদি তার মনের কোণে একটি সূক্ষ্ম অভিমান জেগে উঠে থাকে, সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। পুরুষের কাছ থেকে এতখানি নির্বিকার ঔদাসীন্য কোনো মেয়েই বোধহয় মেনে নিতে পারে না। মনের তারে সুর তুলতে না পারলেও অন্ততঃ চোখের তারায় একটুখানি ছায়া ফেলতে চায় বৈকি?

সেখানে যদি সে ব্যর্থ হয়েও থাকে তবু মনিবের উপর নীহারের একটা গভীর সহানুভূতি গড়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে বলা যেতে পারে এক ধরণের স্নেহ। এঁকে একটি আশ্চর্য প্রাণ দিয়েছেন বিধাতা, কিন্তু যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সেখানে যেন বড় বেশী বেমানান। ঠিক এযুগের লোক নন। এখানকার সমস্যাগুলো বোঝেন না। পদে পদে অসহায় বোধ করেন। সেইটুকু বুঝতে পেরে নীহার যতটুকু তার সাধ্য মনিবকে সাহায্য করে যাচ্ছিল। ওঁর চিন্তাভাবনা-গুলো অনেক সময় উদ্ভট, এমন সব কাজ

করতে বলেন যার অর্থ বা উপযোগিতা বোঝা যায় না। কোনো কোনোটায় নিজের স্বার্থহানির সম্ভাবনা। আমলারা প্রশ্ন করে, কখনো কখনো বিরক্ত হয়। নীহার তাদের বুঝিয়ে শান্ত করে, "উনি যখন চাইছেন, যতটা সম্ভব সব দিক বাঁচিয়ে এটা আমাদের করে দিতে হবে।" মনে মনে হাসে,—এরা তো ওঁকে চেনে না। ওঁর কোথায় কি ক্ষতি হবে, সেইগুলোকে বড় করে দেখছে। কিন্তু সেসবের চেয়ে লোকটা যে কত বড় তা জানেনা।

অভিজিতের 'কটেজ' তৈরির স্কিমটা যখন তার হাতে এল, নীহার সেটা মনে মনে সমর্থন করতে পারেনি। তার মনোভাব সার্ভেয়ার শীতলবাবুর মত অতটা উগ্র না হলেও তাদের পক্ষে এতখানি অগ্রসর হবার সার্থকতা সে খুঁজে পায়নি। এতে করে উদ্বাস্তুদের আসল সমস্যার কতটা সমাধান হবে? তাছাড়া, শম্ভুচরণের সঙ্গে কথা বলে সে যতটা বুঝেছে, এতটা ওরা নিজেরাও প্রত্যাশা করে না। যে জমিটা ওরা দখল করে বসেছে, সেখানে ওদের অধিকার স্বীকৃত হলেই ওরা আপাততঃ সন্তুষ্ট। অবশ্য দাবির ওদের শেষ নেই, কিন্তু তার সবগুলো যে পূরণ হতে পারে না, সেটাও ওরা বোঝে। তাছাড়া গায়ে পড়ে বেশী উপকার করাটা মানুষ সাধারণতঃ সন্দেহের চোখে দেখে। বিশেষ করে, ঐ লোকগুলো। অনেক ঘা খেয়ে, নানা জায়গায় প্রতারিত হয়ে ওদের স্বভাবটাই সন্দিগ্ধ হয়ে গেছে। ওদের যখন বলা হবে অনেক ভালো বাড়ি তৈরি হচ্ছে তোমাদের জন্যে, ওরা হয়তো নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করবে—ব্যাপার কী? কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে উঠবে আশা করা যায় না। কটেজগুলো তৈরি করবার আগে ওদের কতগুলো কুঁড়ে তো ভাঙতেই হবে। সম্ভবতঃ তখনই গোল বাধবে। নিজেদের তৈরি ঘর-দোর ছেড়ে সাময়িকভাবে হলেও অন্য কোথাও উঠে যেতে চাইবে না, যদিও ঐ স্কিমেই তার জন্যে ব্যবস্থা করা আছে। সেটা কতখানি কাজে লাগবে, বলা শক্ত।

তবে শম্ভুচরণের সঙ্গে পরামর্শ করে প্ল্যানটা তৈরি হয়েছে, তার সমর্থন ও সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গেছে, এটা অবশ্য আশার কথা। কিন্তু কলোনীতে শম্ভুর সে একচ্ছত্র প্রভাব আর নেই। তার একটা বিরোধী দল গড়ে উঠেছে, এ খবর হয়তো অভিজিৎ তেমন রাখেন না, কিন্তু নীহার জানতে পেরেছে।

স্কিমটা কাজে লাগতে শুরু করার আগে এসব ব্যাপার নিয়ে মনিবের সঙ্গে আলোচনা করবার কথা একবার ভেবেছিল নীহার। শীতলবাবুকে যেদিন চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাবার নির্দেশ এল, সেই দিনই কথাটা পাড়বে বলে প্রায় স্থির করে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত এগোয়নি। হয়তো তার কারণ সেই সূক্ষ্ম অভিমান—উনি নিজে যখন একবার ডাকলেন না, আমি গায় পড়ে যাই কেন? কিংবা এও হতে পারে—এটাই যখন উনি একান্ত মনে চাইছেন এবং এতটা এগিয়ে গেছেন, এখন বাধা দিলে আঘাত পাবেন। তার চেয়ে সহযোগিতার হাত এগিয়ে দেওয়াই তার কর্তব্য।

তারপর ওদিনকার ঘটনা। নীহার এসে শুনল আমলাদের মুখে। একটু অতিরঞ্জিত হয়েই তার কানে এল ব্যাপারটা। সেটুকু বাদ দিলেও, এটা বোঝা গেল যাদের কথা ভেবে উনি অস্থির, তারা নিজেরাই একেবারে শুরু থেকে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো তার মূলে রয়েছে বাইরের প্রভাব। তা না হলেও এ আশঙ্কা ছিল। নীহারের নিজের মনেই তো জেগেছিল। তখন যদি গিয়ে সেটা জানিয়ে দিত, হয়তো উনি আরেকবার ভেবে দেখতেন। যে আঘাত থেকে ওঁকে বাঁচাবার জন্যে তখন গেলনা, তার চেয়ে অনেক বড় ঘা এসে পড়ল এবার।

স্পষ্টভাবে কেউ না বললেও নীহার বুঝতে পারছিল অনেকটা মুষড়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। স্বাভাবিক। কিন্তু এখানেই থেমে যাবেন বলে মনে হয়না। মনটা যতই কোমল হোক, কোথায় যেন একটা দৃঢ়তা আছে তার মধ্যে। মাঝে মাঝে বোঝা যায়। এই যেমন সেদিন। অত লোকের বিরোধিতার মধ্যে বিচলিত হননি। হটে আসেননি। ওদের নেতাদের মুখের উপর দৃপ্তভঙ্গিতে বলে এলেন—"এরা আমার জায়গায় এসে উঠেছে। এদের যা কিছু সমস্যা আমরা আর এরা মিলে মিটিয়ে ফেলবো। বাইরের কারো দরকার হবে না।"

কথাগুলো নীহার নিজের কানে শোনেনি। ওখানে সে ছিলনা, তখনো এসে পৌঁছায়নি। পরে এসে অন্য সকলের কাছে শুনেছে। এখানকার আমলা কর্মচারী পেয়াদা চাকর বাকর সবাই তাকে গর্বের সঙ্গে শুনিয়েছে। এতদিন পরে মনিবের মুখ থেকে জমিদারের ভাষা শুনতে পেল তারা। দেখতে পেল সেই তেজ। এই তো চাই।

এটা জমিদারের তেজ কিনা নীহার জানেনা। হতে পারে। একদা যাঁরা এই বাড়ি ও এস্টেটের মালিক ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে সে। অভিজিতের মধ্যে তাদের সেই আভিজাত্যের দম্ভ না থাকলেও আমিত্ব-বোধটা হয় তো রয়ে গেছে। অজ্ঞাতসারে তারই প্রকাশ হয়তো ঘটেছিল সেদিন—"এরা আমার জায়গায় এসে উঠেছে, এদের ভালো মন্দর ভারও আমার।" একে যদি আশ্রিত-বাৎসল্য বলা যায়, তার মূলেও 'আমি'।

মূলে যাই থাক, অভিজিতের এই নতুন রূপটি ভালো লেগেছিল নীহারের! তার ভিতরে যে পৌরুষের দীপ্তি আছে, মনে মনে কল্পনা করে তাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারেনি।

সেই ঘটনার পর কদিন মনিবের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তিনিও ডাকেন নি, নীহারেরও এমন কিছু কাজ পড়েনি, যা নিয়ে তাঁর কাছে যাবার দরকার হতে পারে।

সেদিন একটু দেরি করেই এসেছিল অফিসে। কিছুক্ষণ পরে হলধর এসে বলল, ছোটবাবু জানতে চাইলেন, এখন কি একবার যেতে পারবেন তাঁর ওখানে ?

"কোথায় তিনি ?"

"তাঁর আফিস কামরায়।"

"চল, যাচ্ছি।"

দরজার সামনে ভারী পরদা ঝুলছে। নীহার এসে দাঁড়াল তার বাইরে। যদিও 'যাচ্ছি' বলে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে তবু ঢুকবার আগে একটু ইতস্ততঃ করছিল। এমন সময় পরদাটা হাওয়ায় খানিকটা সরে যেতে চোখে পড়ল, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পিছনে অভিজিতের চেয়ার খানা খালি। এইমাত্র হলধর বলে এল, ছোটবাবু ঘরেই আছেন। কোথায় গেলেন এর মধ্যে ! ফিরে যাবে কিনা ভাবছে, ভিতর থেকে গলা পাওয়া গেল—"আসুন।"

নীহার ঢুকে পড়তেই কোণের দিকের ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল অভিজিৎ। তার নির্দিষ্ট আসনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, বসুন।

ইজিচেয়ারখানা এর আগে দেখতে পায়নি নীহার। যে কদিন সে আসে নি, তারই মধ্যে আনা হয়েছে। আগে থেকেও থাকতে পারত। মাঝে

মাঝে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্যে একটু বিশ্রাম বা আয়েশের প্রয়োজন সকলেরই দেখা দেয়। সেই জন্যেই এসেছে ওটা, সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে নীহারের মনে হল, এর সঙ্গে কোথায় যেন ওঁর বর্তমান মানসিক অবস্থার একটা সূক্ষ্ম যোগ আছে।

কোনো উপলক্ষে ম্যানেজারকে যখনই ডেকে পাঠিয়েছে অভিজিৎ, কাজের কথা পাড়বার আগে কুশল প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছে। কখনো কখনো জানতে চেয়েছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা কিংবা (গোড়ার দিকে) কেমন লাগছে এখানকার কাজকর্ম। আজ সে সব কিছু বলল না। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, সেদিনকার ব্যাপারটা সব শুনেছেন?

কোনদিনকার কোন্ ব্যাপার সে সম্বন্ধে কোনো আভাস না দিয়ে এমন খাপছাড়া ভাবে প্রশ্নটা এলেও নীহার উত্তর দিল,—"শুনেছি।" সে তো জানে ঐ একটা ব্যাপারই এই কদিন ধরে ওঁর মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। স্বস্তি দিচ্ছে না।

নীহার বসেছিল সামনা-সামনি চেয়ারটায়। অভিজিৎ টেবিলের উপর একটু ঝুঁকে পড়ে তার দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন এরা কারা?

নীহার মাথা নেড়ে বলল আমি কাউকে চিনিনা। তবে এটুকু জানি এরা একটা পলিটিক্যাল পার্টির লোক।

"সে তো আমিও বুঝতে পারছি, যদিও এখানকার পলিটিক্সের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু এতদিন তো এদের দেখতে পাই নি।"

"দরকার ছিল না বলেই আসেনি।"

"সে কী! এদের তো কত রকমের দরকার, আর সেগুলো বরাবর চলছে।"

"সেগুলো দিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই, ওরা এসেছে নিজেদের দরকারে।"

অভিজিৎ যে কথাটা ধরতে পারে নি, তার চোখ দেখেই বোঝা গেল। নীহার তার বক্তব্যটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলল, বেশ কিছু দিন হয়ে গেল তো। এবার এদের ভোটার লিষ্টে নাম উঠাবার সময় হয়ে এসেছে। ইলেকসনও এগিয়ে আসছে। এতগুলো ভোট হাত করতে পারলে অনেক সুবিধে।"

"এই ব্যাপার? বেশ তো, ওরা যাকে ইচ্ছা ভোট দিক না। আমাদের কিছু বলবার নেই, আমরা বাধা দিতেও যাচ্ছি না। কিন্তু আমাদের কাজে ওরা বাধা দিচ্ছে কেন? ঐ অসহায় লোকগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে তাতিয়েই বা তুলছে কেন?"

নীহার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। বুঝল যে ভদ্রলোক শুধু এখানকার পলিটিক্স কেন, কোনো পলিটিকস্‌ই বোঝেন না। জানেন না যে রাজনীতির ধর্মই হল অসন্তোষ সৃষ্টি করা; লোককে তাতিয়ে বা ক্ষেপিয়ে তুলে কাজ হাঁসিল করা। ইংরেজিতে যাকে বলে fishing in troubled waters, সেটাই হল ক্ষমতা দখল ও বিস্তারের সহজ পথ।

এই কথাগুলো বলতে গেলে অনেকটা বক্তৃতার মত শোনাবে বলে নীহার কুণ্ঠা বোধ করছিল। অথচ উনি অপেক্ষা করে আছেন, কিছু একটা বলা দরকার। তাই কিছুটা পাশ কাটিয়ে যাবার ধরণে বলল আমি ঠিক জানিনা। তবে মনে হয়, ভোট পেতে হলে যা-যা করা দরকার তাই ওরা করছেন। এই সরল লোকগুলোকে বোঝাচ্ছেন, জমিদার তো তোমাদের জন্য কিছু করেনি, করছেও না, যা করছে সব নিজের স্বার্থে। আমরা তোমাদের ভালোর জন্যে এসেছি। এই জমিতে তোমাদের পুরো দখল পাইয়ে দেবো। যারা বসে আছে তাদের কাজ দেবো, ভাল করে বাঁচবার মত সব ব্যবস্থা করে দেবো। মানুষ যখন দুর্দশার মধ্যে থাকে, এসব কথা শুনলে সহজেই গলে যায়। মনে করে এরাই আমাদের সত্যিকার আপন জন।

অভিজিৎ মন দিয়ে শুনছিল। নীহার থামলে আস্তে আস্তে বলল, তাই হয়তো হবে। কাউকে যদি দেখাতে চাই আমি তোমার বন্ধু, প্রথমেই বোঝাতে হবে অন্য সকলে তোমার শত্রু। তাছাড়া 'জমিদার' কথাটার মধ্যেই এমন একটা, কী বলবো, 'ঐতিহ্য' রয়ে গেছে, যে 'দুষমণ' ছাড়া অন্য ভাবে তাকে কেউ দেখেনা। জমিদারি চলে যাবার পরেও না। সে যাক। আপনার পলিটিক্যাল নেতারা কলোনীতে আসা যাওয়া করছেন, করুন। কিন্তু আমার কাছেও যে আসতে শুরু করেছেন।

"আপনার কাছে!" বিস্ময়ে চোখ তুলল নীহার।

—"দুভদ্রলোক এসেছিলেন সেদিন। বেশ রাত করে। এসেই শুরু করলেন শাসানি—'ওদের কি কচি খোকা পেয়েছেন? নিজেদের ভালো

মন্দ বোঝেনা ? আপনার ঐ বাড়ি তৈরির স্কীমটা যে নেহাৎ ভাঁওতা, ঐ লোভ দেখিয়ে লোকগুলোকে উৎখাত করবার চেষ্টা, সেটা ওরা বুঝে ফেলেছে। জোর জুলুম করে সুবিধে হলনা দেখে এই পথ ধরেছেন। এসব আপনাকে বন্ধ রাখতে হবে।'

আমি বললাম, যদি না রাখি ? ওঁদের মধ্যে যাঁর বয়স অল্প তিনি গর্জে উঠলেন, তাহলে আপনার প্যালেসসুদ্ধু ওদের দিয়ে জবর দখল করিয়ে দেবো।

আমি হেসে বললাম, এই ? তা সেজন্যে আপনারা আর মিছিমিছি কষ্ট করতে যাবেন কেন ? যদি দরকার বুঝি আমিই ওদের নিয়ে এসে বসিয়ে দেবো এখানটায়।

নীহার কৌতূহলী হল, শুনে কী বললেন ওঁরা ?

—"একটু যেন থমকে গেলেন মনে হল। তারপর যা বললেন, শুনে আমি থ। একেবারে উলটো সুর। আরেকজন, যিনি এতক্ষণ বিশেষ কিছু বলেননি, বয়স্ক লোক, এবার মুখ খুললেন। প্রথমেই আশ্বাস দিলেন, না, না, ওসব আপনাকে কিছুই করতে হবেনা, অভিজিৎ বাবু। আপনার পিতৃ-পিতামহের এত বড় বাড়ি ঐ হতভাগাগুলোকে ছেড়ে দেবেন কেন ? একবার ঢুকলে আর উঠবে মনে করেন ? কখখনো না। আর দুদিনে এর যে হাল করে ছাড়বে আপনি ধারণাও করতে পারেননা। কিছুদিন সবুর করুননা। ঐ জমি থেকেও যাতে ওদের তুলে দেওয়া যায়, সে চেষ্টা আমরা করছি। আর যদি নাও যায়, গবর্মেণ্টের ওপর চাপ দিয়ে আপনার জায়গার যা ন্যায্য দাম আদায় করে দেবার চেষ্টাও আমরা করবো। আপনি আপনার ঐ স্কিম-টিমগুলো বন্ধ করুন। আর—'

একটু থেমে সঙ্গীটির মুখের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, কী নাম যেন লোকটার ? উত্তর এল শম্ভুচরণ।

আবার ফিরলেন আমার দিকে—'হ্যাঁ ঐ শম্ভুচরণকে একেবারেই আমল দেবেন না। কিছু মনে করবেননা। আপনি ওকে ঠিক চিনতে পারেননি। এই উদ্বাস্তুগুলোকে আপনি যতটা সিম্পল মনে করেন, আসলে ওরা তা নয়। বিশেষ করে ঐ লোকটা। ভালো মানুষ সেজে থাকে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পাকা সয়তান। ওকে বিশ্বাস করবেননা।'

নীহার মুখটিপে হাসল—"শম্ভুবাবুর জন্যেই ওঁরা বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছেননা।"

অভিজিৎ বলল, কিন্তু সেদিনতো দেখলাম একদল ছোকরা শম্ভুকে কোনো পাত্তা দিলেন না।

—"ওদের ওঁরা হাত করে ফেলেছেন। কয়েকজনকে পার্টির কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। জামা কাপড় ছাড়া কিছু কিছু হাতখরচও পাচ্ছে তারা। কিছু ছেলে ঝুঁকছে সেদিকে। শম্ভু বাবু এই নেতাদের খপ্পরে পড়তে চাননা। ওঁদের মতলব আগেই বুঝতে পেরেছেন। ওঁর অনুগত একটা দলও আছে। তারা ওদিকে ভেড়েনি। তাহলেও উনি বেশ মুষড়ে পড়েছেন দেখলাম। সেদিন এসেছিলেন একটা ব্যাপারে।"

নীহারের মুখে একটা ভাবনার ছায়া পড়ল। লক্ষ করে অভিজিৎ বলল, কী ব্যাপার বলুনতো?

—"আপনাকে তখনই বলতাম। কিন্তু উনি বললেন, ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে পরে জানাবেন। সেই জন্যে অপেক্ষা করছি। এটা ঘটছে কিছুদিন থেকে। দু-চারটি মেয়ের মাঝে মাঝে খোঁজ পাওয়া যায়না। সকালে বেরিয়ে গেল, সন্ধ্যাবেলায় আর ফিরলনা। দু-তিন দিন পরে আবার দেখা গেল। বাড়ির লোকেও বলতে পারেনা কোথায় যায়। এমনও হতে পারে, তারা জানে কিন্তু বলতে চায়না। শম্ভুবাবু ভিতরে ভিতরে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, এদের কেউ কেউ পার্টির কাজ করছে, ভলান্টিয়ার হয়েছে। ব্যাজ লাগিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়ে মহলে ভোট ক্যানভাস করে বেড়ায়।"

—"রাত্রে থাকে কোথায়?" উদ্বেগের সুরে প্রশ্ন করল অভিজিৎ। নীহার বলল, ওরা বলে, আলাদা বাড়ি নেওয়া আছে মেয়ে ওয়ার্কারদের জন্যে। সেখানে খবার দাবার ব্যবস্থাও আছে। সেখানে থাকে। কিছু মেয়ে আবার অন্য কাজও করে। সেগুলো যে কী ঠিক স্পষ্ট করে বলে না। বাপ-মা ধমক দিলে উলটো পালটা জবাব দেয়। কোনো কোনো বাপ-মা চুপ করে থাকে, বেশী ঘাঁটাতে চায় না।"

কেন ঘাঁটাতে চায় না, শম্ভু বোধ হয় বলে নি। বলতে সঙ্কোচ বোধ করেছে, বিশেষ করে একটি মহিলার কাছে। হয়ত ইঙ্গিত দিয়েছিল, কিংবা এমনিতেই বুঝতে পেরেছিল নীহার। যে সংসারের কারো কোনো রোজগার

নেই, এ বেলা এক মুঠো জুটলেও ও-বেলা কোত্থেকে কী জুটবে তার নিশ্চয়তা নেই, সেখানে যদি দুটো পয়সা কেউ আনে, হলই বা সে বয়স্কা মেয়ে, কী করে আনল, তা নিয়ে অনাবশ্যক হুজ্জত করতে অনেকেই চায় না। কে জানে কেঁচো খুড়তে গিয়ে হয়তো সাপ বেরিয়ে পড়বে। তার চেয়ে চাপা আছে থাক।

নীহার ঐ প্রশ্নটা ঐখানেই ছেড়ে দিল। অভিজিৎ আর কিছু জানতে চাইল না। যে-টুকু শুনেছে তার থেকেই বাকিটা জানা হয়ে গেছে।

এ-ব্যাপারটা তবু সবখানি স্পষ্ট নয়, কিছুটা পরদার আড়ালে রয়ে গেছে, যদিও সে পরদাটা অতি সূক্ষ্ম। এর চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্ট ঘটনা সে নিজের চোখে দেখেছে।

স্বরূপকান্দিতে সবে এসেছে তখন। বোধ হয় মাসখানেকও নয়। কলোনী এবং তার সমস্যাগুলো এতখানি মনোযোগ কেড়ে নেয়নি। দুটো পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারে নি তখনো। ভোরবেলা তানপুরা নিয়ে বসা আর বেলা পড়লে বেরিয়ে পড়া গঙ্গার ধারে। যদিও কাশীর গঙ্গার সঙ্গে এ গঙ্গার অনেক তফাৎ এবং এখানেও ছেলেবেলায় যে গঙ্গাকে রেখে গিয়েছিল, সে-ও আর নেই। সেদিন তার দেহে যৌবন না থাকলেও এমন ধারা বার্ধক্যের শীর্ণতা দেখা দেয়নি।

এমনি একদিন বেড়িয়ে ফিরছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারদিকে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার, তারই মধ্যে হঠাৎ নজরে পড়ল রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে একখানা কালো রংএর মোটর দাঁড়িয়ে আছে। যখন অবাক হয়ে ভাবছে এখানে মোটর নিয়ে এল কারা, দেখতে পেল দুটি মেয়ে চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে ওদিক থেকে। একজনের পরনে শাড়ি, আরেকজনের ফ্রক, কিশোরী মেয়ে। অন্ধকারে অবয়বটা আবছা দেখা যায়, মুখ চেনা যায় না। তারা বোধ হয় ওকে দেখতে পায় নি। পা চালিয়ে ধরে ফেলল মোটরটা। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের একটা দরজা খুলে ধরল কে একজন। মেয়ে দুটি উঠতেই গাড়ি ছুটল কলকাতার দিকে।

কারা এরা? ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল অভিজিৎ। মাষ্টার মশাইকে বলল তার পরদিন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার চোখে আজ পড়ল। কিন্তু আমরা বেশ কিছু দিন থেকেই

জানি। শুধু এখানে নয়, ধুবুলিয়া, তাহেরপুর কিংবা আরো যে সব জায়গায় এরা এসে ডেরা বেঁধেছে, সব জায়গায় এই একই দৃশ্য। শেয়ালদহ ষ্টেশনে বোধ হয় আরো বেশী।

তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, কী করবে তুমি? এ হবেই। ঠেকাবার কোনো উপায় নেই।

সেদিন যা ছিল গোপন, লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাই প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। তার উপরে একটা মুখোস, যাতে বাইরে থেকে ধরা না যায়। তবু ব্যাপারটা যে একই, শুধু ধরণটা আলাদা, সে কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।

ঘরের বাইরে হলধরের সাড়া পাওয়া গেল। অভিজিৎ বলল, কী হলধর?

—আজ্ঞে, ম্যানেজার দিদিমণিকে ডাকছে।

—কে ডাকছে?

—দুটি মেয়েছেলে।

অভিজিৎ নীহারের দিকে ফিরে বলল, দেখুন কারা, কী বলে।

নীহার বাইরে আসতেই হলধর বলল, রূপার মা, মেয়েটাকেও ধরে এনেছে।

॥ ১৩ ॥

রূপা নামটা নীহারের জানা, শম্ভুর মুখে শুনেছে কদিন আগে। ঘরের সামনে এসে এক নজর দেখেই বুঝল মেয়েটাও তার চেনা। আরেকবার এসেছিল, আজকের মতই মায়ের সঙ্গে। মা বলেছিল তার চাটগাঁর গেঁয়ো ভাষায়, যেখানে হোক একটা কাজ-টাজ জুটিয়ে দাও, দিদিমণি। এখানে আর এক দণ্ডও রাখতে ভরসা পাচ্ছিনা।"

ভরসা না পাবার যথেষ্ট কারণ আছে। মেয়েটার চোখ মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিল নীহার। বয়স পনর ষোল, অর্থাৎ চলতি ভাষায় 'সেয়ানা' হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেটা শুধু বয়সে, দেহের গড়নে, কয়েকটি বিশেষ অঙ্গের পুষ্টিতে। কলোনীর অন্য মেয়েগুলো এই বয়সে পৌঁছবার আগেই যেমন সব দিক দিয়ে সেয়ানা হয়ে ওঠে, এ তা পারেনি। বড় বড় চোখ দুটো সরল, মুখখানাও বয়সের অনুপাতে কাঁচা। এদিকে দেখতে মন্দ নয়। মা কোথায় ঝিয়ের কাজ করে, ঐ মেয়ে ছাড়া তার আর কেউ নেই, সাধ্যমত ভাল খেতে পরতে দেয়। কাজেই স্বাস্থ্যটিও ভাল। এ মেয়ে নিয়ে সত্যিই ভাবনা হবার কথা। চারদিকে শিকারীর অন্ত নেই। তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার জন্য যে সব হাতিয়ার এই বয়সী মেয়েদের দরকার, বিশেষ করে যে পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছে, এ মেয়ের তূণে তার অভাব আছে। তারই ফল ফলতে দেখা গেল।

এর আগে দু-একটা ছোটো খাটো ঘটনা ঘটে গেছে। একবার কলোনীর দুটি লায়েক ছোকরা রূপার মায়ের অগোচরে ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল। দুপুরের দিকে বেরিয়ে রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত কোথায় ছিল তারা, কী করছিল, সেটা প্রকাশ পায়নি। তবে এর চেয়ে অনেক বড় বড় ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে ঘরে ঘরে। তাই এ নিয়ে মার খানিকটা চেঁচামেচি এবং মেয়েকে দু-চারটা চড় চাপড়—তার বেশী আর কোনো হৈচৈ হয়নি।

এর পরের বারে সে যাদের হাতে পড়ল তারা পুরুষ নয়, মেয়ে, এবং ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াল। রূপার মার মতে সেটাই নাকি স্বাভাবিক। "মেয়েমানুষ ছাড়া মেয়েমানুষের এতবড় সর্বনাশ আর কে করবে দিদিমণি ?"

দুটি মেয়ে, বেশ চালাক চতুর, রূপার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ; কিছুদিন থেকে ফর্সা জামাকাপড় পরে কোলকাতায় যাতায়াত করছিল। কয়েকদিন অন্তর অন্তর ফেরে। দু-এক বেলা থেকে আবার বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির লোকেরা বলে, ওরা পার্টির কাজ করে! 'কাজটা' কী তা নিয়ে কিছুটা কানাঘুসা চললেও প্রকাশ্যে কেউ প্রশ্ন তোলেনা। অনেকের ঘরেই ঐ বয়সী মেয়ে আছে, ঐ রকম একটা কিছু কাজ তাদেরও দরকার।

দেশ গাঁয়ে থাকলে মেয়ে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বাপ-মার মনে তার বিয়ের কথাটাই বড় হয়ে উঠত। এখানে ও ভাবনাটাকে সবাই এক পাশে সরিয়ে রেখে দিয়েছে। এদের সমাজ বলতে এই কলোনী। বাইরের লোকদের সঙ্গে বিরোধ হয় তো নেই, অনেকদিন কাছাকাছি বসবাস, আলাপ পরিচয় এবং কাজে কর্মে পারস্পরিক নির্ভরতার ভিতর দিয়ে একটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। সেটা বৈবাহিক সম্ভাবনার স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়নি। কলোনীর মেয়ে তাদের ঘরে বৌ হয়ে আসবে, একথা যেমন গ্রামবাসীদের চিন্তার অতীত, তেমনি কলোনী-বাসীদেরও কল্পনার বাইরে। মেয়ে যদি আনতে হয় কলোনীরই কোনো ঘর থেকে, যদি দিতে হয়, কলোনীরই কোনো ঘরে। কিন্তু 'ঘর' কোথায় ? এক একটা পরিবার যে-জায়গাটুকু দখল করে আছে, সেখানে স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বুড়ো বাপ-মা খুড়ী জেঠীরই মাথা গোঁজা চলেনা। তার মধ্যে আবার একটা বৌ এসে থাকবে কোথায়, তার চেয়েও বড় কথা, খাবে কী ? এরা যেখানে ছিল সেখানে বৌকে খাওয়াবার দায়িত্ব ছিল গোটা সংসারের, বরের একার নয়। কিছু করেনা, এমন ছেলেও বিয়ে করত, বাবা-কাকারা বিয়ে দিয়ে দিত। এখানে এসে নতুন অবস্থার ফেরে যার যার দায় তার তার নিজের। কেউ চাপিয়ে দেয়নি। আপনা থেকেই এসে পড়েছে। ছেলেরা জানে বিয়ে করতে হলে বৌকে খেতে দেবার মত সামর্থ্য চাই, তাকে নিয়ে বাস করবার মত ঘর চাই। মেয়েরাও সেটা বোঝে। তাই বিয়ের চিন্তা তাদের তরফেও নেই। কিন্তু বয়সের ধর্ম যাবে কোথায় ? তার গতি আটকাবে কে ?

প্রকাশ্য ও সহজ পথ যেখানে রুদ্ধ, স্বাভাবিক কারণেই সেখানে গোপন ও জটিল পথ দেখ দেয়। সে যাক।

মেয়েদুটি রূপাকে একদিন বলল, এই কোলকাতা যাবি ?

"না, ভাই, মা মারবে।"

আগের ঘটনা তার মনে আছে, তারাও জানে। তাই ভরসা দিল, "দূর হাবি, মারবে কেন ? যাবি তো আমাদের সাথে। আমরা নিয়ে যাবো।"

রূপা ভাবতে লাগল। ওরা তো কলোনীরই মেয়ে, জানাশুনো। ওদের সঙ্গে যেতে আর দোষ কী ? তবু মাকে জিজ্ঞাসা না করে সাহস করল না।

এবার নতুন টোপ ফেলল মেয়েদুটো। উদ্দেশ্য কী তারাই জানে। দল ভারী করার জন্যেই হোক, কিংবা নিরীহ বোকাশোকা ধরনের বলে রূপার উপর তাদের একটা স্নেহ ছিল বলেই হোক। বলল, যাসতো তোরও চাকরি হবে আমাদের মত। ভালোমন্দ খেতে পাবি। টাকা পাবি। তার থেকে তোর মাকেও দিতে পারবি। আমরা দিচ্ছিনা ?

রূপা প্রলুব্ধ হল। তাকিয়ে দেখল ওদের ফরসা জামা কাপড়ের দিকে, চকচকে চোখমুখের দিকে, কদিন আগেও যা ছিল শুকনো, রুক্ষ। আরেকটু ভাবল। তারপর রাজী হল। বন্ধুরা পরামর্শ দিল, এখনই কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। চাকরি পাবার পর জানালেই হবে। বেশ তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে মাকে।

তাক লাগাবার ব্যাপারটায় রূপা বেশ মজা পেল। বিকেলের দিকে মা যখন কাজে বেরিয়ে গেছে মেয়ে দুটোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। কেউ টের পেল না।

পরে জানা গেছে পার্টির কাজ-টাজ কিছু নয়। গোড়াতে হয়তো সেই রকম একটা কিছুর নাম করেই কেউ ঐ দুটি মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল। কিংবা এও হতে পারে, পার্টির মেয়ে ভলেন্টিয়ার হয়েই তারা শুরু করেছিল, যেমন আরো কিছু মেয়ে রয়েছে ঐ কাজে। তারপর কখন কিভাবে কোথা দিয়ে ছিটকে গিয়ে জুটেছিল এক বিশেষ পাড়ার রেস্তোরাঁয়, বিশেষ ধরণের নৈশ খদ্দেরের খাদ্য পবিবেশনের ভার নিয়ে এবং কদিনের মধ্যে নিজেরাও তাদের 'খাদ্য' হয়ে উঠেছিল, সে ইতিহাস উদ্ধার করা সহজ নয়।

উদ্বাস্তু মেয়ে হলেও প্রথম প্রথম মনটা যে ওদের বিদ্রোহ করে ওঠেনি তা নয়। কিন্তু তাকে মাথা তুলতে দেয়নি। পেটে বিদ্যা না থাক, বাস্তব-বুদ্ধি আছে। তাই দিয়ে নিজেদের বুঝিয়েছিল, বিয়ে থা যখন হবে না, বাপ-মা-ভাইয়েরাও বরাবর খেতে দেবে না—দেবেই বা কোত্থেকে, তখন একটা কিছু করে পেটা তো চালাতে হবে। কী করে, তা নিয়ে অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। দিন গেলে খাওয়া-পরা বাদে দুটো করে টাকা হাতে আসছে। তার জন্যে বাড়ির লোকেরাও হাত পেতে বসে আছে, জানতে চাইছে না কোত্থেকে এল, রোজগারের রাস্তাটা কী। হয়তো আন্দাজ করছে ; সন্দেহ করছে অন্য পাঁচজন। তা করুক। প্রকাশ্যে তো কেউ কিছু বলতে পারছে না। "বলুক দেখি ?"—এমনি একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে সকলের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে যেত আসত মেয়ে দুটি। জানত, যারা বলবে তারাও কেউ ধোয়া তুলসী পাতা নয়। পাপ ঢোকেনি কোথায় ? কিন্তু যতক্ষণ চাপা আছে, ততক্ষণ কোনো পাপই পাপ নয়, কোনো অন্যায়ই অন্যায় নয়।

ওদের ভয় ছিল শুধু এক জায়গায়—শম্ভুদা। গোড়ার দিকে হলে হয়তো এসব পথে পা বাড়াতে সাহস করত না। তখন শম্ভুচরণের সমর্থন নেই, কিংবা সে পছন্দ করে না, এমন কিছুই করা চলত না কলোনীতে। অল্প-সল্প যা হত, তাকে লুকিয়ে, তার অগোচরে। সব ছেলে-মেয়ের উপর তার প্রভাব ছিল একচ্ছত্র। তাতে ভাঙন ধরল যখন বাইরে থেকে ঐ 'বাবুরা' আসতে আরম্ভ করলেন। অনেক আশার কথা শোনালেন তাঁরা, মিটিং করলেন, বক্তৃতা দিলেন, কলোনীর হাজার রকম দুঃখ দুর্গতি, অভাব-অভিযোগ দূর করবার আশ্বাস দিলেন। ভরসা দিলেন,—তোমাদের আমরা কাজ দেবো, পার্টির কাজ, দেশের কাজ, তার থেকে তোমাদের খাওয়া-পরার ভাবনাও মিটে যাবে।

শম্ভু যে কেন ঐ বাবুদের আসা-যাওয়া পছন্দ করল না, মেয়ে দুটি এবং তার মত আরো অনেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। তার সেই এক কথা—আর বাইরের লোক নয়। এমনি ধারা অনেকে আমাদের ঠকিয়েছে ! সব মতলববাজ। নিজেদের কাজ গোছাতে আসে, সেটুকু হয়ে গেলেই সরে পড়ে। এবার যা কিছু করবার আমরা নিজেরাই করবো। জমিদারের সঙ্গে লড়তে হয় লড়বো, দরকার হলে বোঝাপড়া করবো। আমরা দশজনে যা

ভালো বুঝবো, তাই হবে। যাদের চিনি না, জানিনা, তাদের পরামর্শ বা সাহায্যের দরকার নেই।

আগে আগে শম্ভুচরণের সব কথা একবাক্যে মেনে নিত কলোনীর ছেলে-বুড়ো। ভিতরে ভিতরে পছন্দ হোক না হোক বাইরে কেউ প্রতিবাদ করতো না, বিরুদ্ধেও যেত না। এবারে আর তা হল না। দুটো দল হয়ে গেল। তারপর থেকেই চলছে গণ্ডগোল। ঝগড়া, বিরোধ, কথা কাটাকাটি। হাতাহাতিও হয়ে গেছে কয়েকবার। শান্তি বলে আর কিছু নেই কলোনীর জীবনে।

"মরুক গে", নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে মেয়ে দুটি, "আমরা তো বেঁচে গেছি।"

রূপাকে নিয়ে ওরা তুললো সেই রেস্তোরাঁয় নিজেরা যেখানে কাজ করে। তার পিছনে যে ছোট্ট ঘরটাতে ওদের থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেইখানে বসিয়ে মালিককে গিয়ে জানাল, আরেকজনকে চাকরি দিতে হবে। মালিক সরাসরি 'না' বলে দিল। আর লোকের দরকার নেই তার। মেয়েরা তাকে চেনে। পীড়াপীড়ি করতে লাগল, একবার দেখুন না।

দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেল লোকটা। 'রিফিউজী গার্ল' বলে যে জাতটার সঙ্গে সে পরিচিত, অনেক দিন ধরে দেখছে, এ তার থেকে একেবারে আলাদা। তার হাতে যারা এসে পড়ে, প্রায়ই না খেয়ে খেয়ে এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যেখানে তারা যে মেয়ে, অর্থাৎ দেহগুলো নারী-দেহ, সেটা সহজে ঠাহর হয় না। খাইয়ে দাইয়ে 'খদ্দেরের' চোখে পড়বার মত করে তুলতে সময় লাগে, পয়সাও কম লাগে না। তবে 'তৈরী' হয়ে গেলে সে পয়সা উঠে আসতে দেরি হয় না। তারপর মোটা লাভ।

এ মেয়েটা একেবারে 'তৈরী' হয়েই এসেছে। এর পিছনে টাকা ঢালতে হবে না। জামা কাপড়ে আর চেহারায় একটু চেকনাই নিয়ে আসতে যা সামান্য খরচ।

তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে রূপার পা থেকে মাথা এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত বারবার তাকিয়ে দেখল মালিক। মনে মনে বলল, একেবারে টাটকা মাল, বাসী নয়, ঘাঁটাঘাঁটি হয়নি। "দেখি, একবার তাকাও তো আমার দিকে" —কাছে গিয়ে মোটা, ভাঙা, কর্কশ গলাটাকে যতটা সম্ভব মোলায়েম করার

চেষ্টা করল। তাহলেও বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল রূপার। চকিতে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। খুশী হল মালিক। তার এবড়ো খেবড়ো মাংসল মুখে, ঘোলাটে চোখ ছুটোতে লোভ চকচক করে উঠল। ভালো ব্যবসা হবে একে দিয়ে।

চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই মেয়ে ছুটোর মধ্যে যে বড়, বলে উঠল, তাহলে আজ থেকেই দোকানে বেরোবে তো ?

"যাক না আজকের দিনটা। এত তাড়াতাড়ি কিসের ?"—বলে বেরিয়ে গেল মালিক। আসলে এ মেয়েকে' রেষ্টুরেন্টে' পাঠাবার ইচ্ছা নয়। টেবিলে টেবিলে চপ কাটলেট পৌঁছে দেওয়ার চেয়ে আরো কোনো লাভজনক কাজে একে লাগাতে হবে। তারই কথা ঘুরছিল মাথার মধ্যে।

সঙ্গিনীরা তখনই কাজে বেরিয়ে গেল। ওকে বলল, তুই থাক। ভয় কী ? আমরা এখানেই আছি, একটু পরেই আসছি।

চাপা অন্ধকার-মত ছোট্ট ঘরটার মধ্যে একা বসে বসে রূপার বুকের ভিতরটা হু হু করতে লাগল। মার কথা মনে পড়ছিল আর ভাবছিল কেন এলাম, কোথায় এলাম। দরকার নেই আমার চাকরির। ওরা এলেই বলবো, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

কিন্তু ওদের যে আর দেখা নেই। না আসুক ও একাই চলে যাবে। তার পরেই মনে পড়ল, পথ ঘাট সে কিছুই চেনে না। যাবার উপায় নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একটি বুড়ীমত মেয়েছেলে এসে বলল, এসো আমার সঙ্গে।

"কোথায় ?" জানতে চাইল রূপা।

"তোমার কাজ ঠিক হয়ে গ্যাছে।

"ওরা—ওরা তো এল না।"

"ওরা কারা ?"

রূপা তার সঙ্গী মেয়ে ছুটির নাম বলল। বুড়ী তাদের চেনেনা। কিন্তু এমন ধারা গাঁ থেকে সদ্য ভুলিয়ে আনা কিংবা হঠাৎ ছিটকে এসে পড়া মেয়েগুলোকে সে চেনে। তাই একগাল হেসে বলল ও, ওরা ? ওদের কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। চল।

রূপা ভরসা পেল। বেরিয়ে গেল বুড়ীর সঙ্গে।

রাস্তার উপর একটা রিক্স দাঁড়িয়েছিল। সেটা দেখিয়ে বুড়ী বলল, ওঠো। রূপা ইতস্তত করছিল। তার সঙ্গী মেয়েদুটো যে বলে গেল এখানেই আছে তারা। তাদের কাছে যেতে আবার রিক্স কেন? বুড়ী বোঝাল, তার যেখানে কাজ ঠিক হয়েছে সেটা একটু দূরে। হেঁটে যেতে কষ্ট হবে, তাই রিক্স পাঠিয়েছে মালিক, ওখানেই তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। পিঠে হাত রেখে নরম সুরে বলল, আমার সঙ্গে যাচ্ছ, ভয় কী?

রূপা আর আপত্তি করল না।

খানিকক্ষণ চলবার পর একটা দোতলা বাড়ির সামনে গিয়ে রিকস থামল। রূপা বুড়ীর পিছন পিছন ভিতরে ঢুকে সোজা উপরে চলে গেল। একটা টানা বারান্দা, তার গায়ে ছোট ছোট ঘর। প্রত্যেকটিতে একটি করে লোহার খাট, তার উপরে ধব ধবে পুরু বিছানা। তাছাড়া চেয়ার টেবিল আলনা, সব ঝকঝক করছে। খোলা জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে রূপার মনে পড়ল তার মাকে একবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। সে-ও এই কোলকাতায়। শম্ভুদা অনেক চেষ্টা করে ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তার সঙ্গে কয়েকদিন গিয়েছিল মাকে দেখতে। একটা মস্ত বড় ঘরে অনেক মেয়ের সঙ্গে ছিল তার মা। সেই খাটগুলো অনেকটা এই রকম দেখতে। যে-বারান্দা দিয়ে যেত আসত তার এক ধারেও এমনি কতগুলো ছোট ছোট ঘর ছিল। একটি করে খাট, তাতে একটি করে রুগী। ঐ বড় ঘরে অত ভীড়ের মধ্যে না রেখে তার মাকে ঐখানে রাখলেই তো ভাল হত, বলেছিল শম্ভুদাকে। শম্ভু হেসে বলেছিল, দূর বোকা, এ সব ঘরে কি আমরা থাকতে পারি? এ গুলো হল বড় লোকদের জন্যে। অনেক টাকা লাগে এখানে।

এই বাড়ির ঘরগুলো অনেকটা সেই রকম, তবে তার চেয়ে অনেক সুন্দর, আরো ভালো করে সাজানো। এটাও কি তাহলে হাসপাতাল? শুধু বড় লোকদের জন্যে? প্রশ্নটা চেপে রাখতে পারল না রূপা। বুড়ীর মুখে মুচকি হাসি দেখা দিল—"হ্যাঁ, এটা বড় লোকদের হাসপাতাল।"

—"কিন্তু একটাও রুগী নেই কেন?"

—"এখন কী? রাত্তির হলে আসবে।"

কথাটা রূপার বোধগম্য হল না? দিনের বেলা থাকে না, শুধু রাত্রে আসে, সে আবার কী রকম রুগী! তার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে

বুড়ী নিজেই সেটা খোলসা করে বলল, এখানে যারা আসে সব রেতের রুগী, দিনে থাকে না। তোমারও দিনমানে কিছু করবার নেই। খাও দাও ঘুমোও। সন্দের পরে কাজ।

কী কাজ, সে এখানে কি করবে রূপা ভেবে পেল না। তার কলোনির বন্ধু দুজন যা করে, সে শুনেছে রেষ্টুরেণ্ট্ না কি বলে, যেখানে অনেক লোক খেতে আসে, তাদের খাবার দেয়। তাকেও তাই করতে হবে, বলেছিল তারা। কিন্তু এটা তো খাবার জায়গা নয়, হাসপাতাল! এখানে তাকে কেন নিয়ে এল, কাজটাই বা কী, কিছুই সে বুঝে উঠতে পারল না।

বারান্দা পেরিয়ে বুড়ী তাকে যে ঘরে নিয়ে তুলল সেটা অন্যরকম। খাট-ফাট কিছু নেই। মাঝখান দিয়ে দড়ি টাঙানো, তাতে কয়েকটা শাড়ি সায়া ঝুলছে। ওধারে মেঝেতে দুটো মেয়ে ঘুমোচ্ছে, অনেকটা আলুথালু ভাবে। রূপার ভাল লাগল না। কপাল কুঁচকে তাকাল। কারা এরা? এত বেলায় অমন করে শুয়ে আছে! দরজা জানলা সব খোলা! সিঁড়ির মুখে ওদিকের কোন একটা ঘর থেকে পুরুষের গলা পাওয়া যাচ্ছিল। কেউ এসে পড়তে পারে তো।

বুড়ী বলল, এই তোমার ঘর। ওরাও এখানে থাকে। আরো মেয়ে আছে। তারা আসা-যাওয়া করে, থাকে না। কোলকাতায় বাসা কিনা। বেলা হল। চানটান করে নাও। দাঁড়াও তোমার জামা কাপড় নিয়ে আসি।

"এরা এখানে কী করে?" ঘুমন্ত মেয়েদুটোর দিকে আঙুল তুলল রূপা।

"নার্সের কাজ। তুমিও তাই করবে।"

রূপার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নার্স! নার্স হবে সে! সে যেন নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। নার্স কাকে বলে সে জানে। মায়ের অসুখের সময় অনেককে দেখেছে। অদ্ভুত ভালো লেগেছে তাদের পোষাক, গটগট করে চলা ফেরা, কথাবার্তা, হাবভাব। রুগীরা কত সমীহ করে চলে তাদের! মাকে দেখতে গেলেও রূপা আসলে দুচোখ মেলে তাকিয়ে থাকত ওদেরই দিকে। ওরা যেন এ জগতের জীব নয়, অন্য কোন্ রাজ্য থেকে এসেছে।

কখনো কখনো তার ভীরু মনের গভীর সঙ্গোপনে একটুখানি ক্ষীণ আশা যে জাগত না তা নয়, সেও যদি অমনি ধবধবে গাউন পরে কোমরে রঙিন বেল্ট, মাথায় সাদা রুমাল বেঁধে—আর ভাবতে পারত না। সে কি পাগল হয়ে গেছে? তাও কি কখনো হয়?

অথচ তাই হতে চলেছে আজ। রূপার ইচ্ছা হল তখনই ছুটে গিয়ে মাকে খবরটা দিয়ে আসে। আর শম্ভুদাকে। খুব খুশী হবে শম্ভুদা। সারা কলোনীতে ঐ একটি মানুষই তাকে ভালবাসে। তারও খুব ভালো লাগে শম্ভুদাকে। যে মেয়ে দুটো তাকে নিয়ে এসেছে তাদের সে কোনোদিন ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের উপরেও তার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

যারা শুয়েছিল তাদের একজনের ঘুম ভাঙতে সে পাশের মেয়েটিকে ঠেলা দিয়ে তুলে দিল—এই, কত ঘুমোবি? দুজনেই শুয়ে শুয়ে তাকাল রূপার দিকে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, আবার একটাকে জুটিয়েছে। একজন জানতে চাইল, নতুন এলে বুঝি?

"হ্যাঁ, খুশী মুখে জবাব দিল রূপা।

—"কোত্থেকে আসছ?"

রূপা তাদের কলোনীর নাম করল। মেয়েটি হাসল তার সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে—"আমাদেরই মত।" আরো কি সব কথা হল দুজনের মধ্যে। রূপা সব শুনতে পেল না। দু একটা শুধু কানে এল—"একবারে কচি, মুখখানা ছাখ্।" "দুদিনেই পেকে যাবে।"

সারা দিনটা এক অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। খাবার যখন এল, ভালো করে খেতে পারল না রূপা। সন্ধ্যার পর বুড়ী যখন সত্যিই এক স্যুট নার্সের পোষাক নিয়ে এল সে যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। তারপরেই ভয়ে বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল, সে তো কিছুই জানে না। পারবে তো? নার্সদের কত কাজ করতে হয়, হাসপাতালে দেখেছে। বুড়ী তাকে গাউন-টাউন পরিয়ে দিচ্ছিল। হয় তো তার মনের কথা আঁচ করে থাকবে। বলল, তোমাকে এখানে আর কিছু করতে হবে না, শুধু যে-সব বাবুরা আসবে তাদের মাসাজ করবে।

"সেটা কী?" চোখ তুলল রূপা।

ওদিকের জানালার ধারে যে মেয়েটি আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে পোষাক পরছিল সে পিছন ফিরে তাকাল। বুড়ী হাসল তার দিকে চেয়ে। তারপর বলল, মাসাজ জাননা? এই গা-হাত টিপে দেওয়া, যেখানে যেখানে বলবে মালিস টালিস করে দেওয়া।

সে আর কি এমন কঠিন কাজ?—মনে মনে ভাবল রূপা। সে ভেবেছিল কত কী যেন করতে হবে। বুড়ী আরো আশ্বাস দিল, বাবুদের কথা মত চললে এখান থেকে মাইনে যা পাবার তা তো পাবেই, তার ওপরে ভালো বখসিস পাবে।

কিছুক্ষণ পরে ঐ বুড়ীই তাকে ডেকে নিয়ে একটা ছোট ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। একটা রঙিন আলো জ্বলছিল। তাতে দেখা গেল একটা মোটা সোটা লোক বিছানার উপর শুয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে রূপার দিকে চেয়ে হাসল। হাসির ধরণটা ওর ভালো লাগল না। যে-ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওকে, সেটাও যেন কেমন কেমন। রূপার গা ছমছম করতে লাগল। লোকটার বয়স বোধ হয় চল্লিশ-টল্লিশ হবে। ভারী ছুটো গাল, থুতনির নীচে দু তিনটে ভাঁজ। ভাঙা ভাঙা মোটা গলায় বলল, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? কাছে এসো। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো।

বাংলাতেই বলল কথাগুলো, কিন্তু এমন একটা টান ছিল তার মধ্যে যা রূপা আগে কখনো শোনেনি। কলোনীতে তো নয়ই, তার চারপাশে যারা থাকে, তাদের মুখেও না। সে এগিয়ে গেল না, দরজাও বন্ধ করল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করতে লাগল।

লোকটা নিজেই উঠে গিয়ে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। জামাটা খুলে আলনায় টাঙিয়ে দিল। তারপর আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল, বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও দিকিন।

রূপার পা সরছিল না। তবু একটু একটু করে এগিয়ে গেল। বুড়ীর কথা মনে পড়ল। নিজেকে মনে মনে বোঝাল এই কাজ করতেই তো এসেছে সে। এক রাশ বড় বড় লোমে ঢাকা বিশাল বুক এবং তার নীচে ভুঁড়ির দিকে চেয়ে তার গা ঘিন ঘিন করে উঠল। না, এ কাজ সে পারবে না। ইচ্ছে হল পালিয়ে যায়। তারপর কী মনে করে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটা বলল, কী হল ? রূপা এবার আর একটু কাছে সরে গিয়ে সেই রোমশ বুকের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল। "ওভাবে নয়" বলে লোকটা ওর হাত ধরে টানতেই এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে ছিটকে সরে এল রূপা। বলল, আমি যাই।

"সে কী! যাবে কেন? আচ্ছা দাঁড়াও," বলে উঠে গিয়ে জামার পকেট থেকে ম্যানিব্যাগ বের করে একখানা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল—"নাও"।

"না"।

"না কেন? নাও, পরে আরো দেবো।"

রূপা নড়ল না, কথাও বলল না, শুধু ঘাড় তুলে আড় চোখে দরজার ছিটকানিটা দেখে নিল। লোকটা অদ্ভুত চোখ করে দেখছিল তার দিকে। হঠাৎ ছুটে এসে দুহাতে জাপটে ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল এবং খাটের উপর বসে দুপা দিয়ে তার পা দুটোকেও শক্ত বেড়ির মত জড়িয়ে ধরল। রূপা চেঁচাতে চেষ্টা করল, কিন্তু দুটো বিশ্রী পুরু মোটা ঠোঁট তার ওষ্ঠের উপর তখন ভীষণভাবে চেপে বসেছে। হাত দুটো শুধু খোলা ছিল। তাই দিয়ে লোকটার কাঁধ, বাহু, পাঁজর, পিঠ আঁচড়ে খামচে চুল ধরে টেনে প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই ভারী ভারী হাত পাগুলো যেন লোহার বাঁধনে পিষে ধরেছিল তাকে। নড়ায় কার সাধ্য। হঠাৎ এক ফাঁকে মুখটা একটু ছাড়া পেতেই মরিয়া হয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে তার গলার কাছটায় দাঁত বসিয়ে নিল। "উঃ" বলে একটা শব্দ করে সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিল লোকটা এবং এমন জোরে লাথি ছুঁড়ল যে তার ঘায়ে রূপা ছিটকে গিয়ে পড়ল ওধারের দেয়ালের পাশে। মাথাটা কেমন ঝিম ধরে গেল। তার পরেই মনে হল সারা কামরাটা দুলছে। দেখতে দেখতে তার চোখের সামনে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। আর কিছু সে জানে না।

যখন জ্ঞান ফিরল চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে রূপা প্রথমটা ঠাহর করতে পারল না কোথায় শুয়ে আছে। মাথাটা তখনো ভারী ভারী লাগছিল। হাত দিয়ে দেখল চুলগুলো ভিজে জবজব করছে। ঘরের মধ্যে কারা যেন আস্তে আস্তে কথা বলছিল। সেই বুড়ীর গলা শোনা গেল—কি

খুনে মেয়েরে বাবা! এটাকে কি জন্যে নিয়ে এলে তোমরা? আর আনলে যদি একটু শিখিয়ে পড়িয়ে আনতে হয়।

"আমরা মনে করেছিলাম নিজে থেকেই সব বুঝবে। কচি খুকী তো নয়। উত্তর দিল শান্তি—রূপা যাদের সঙ্গে এসেছিল, তাদের মধ্যে যে বড়। তার বন্ধু শুক্লাও ছিল ওখানে। সে বলল মেয়েটা আসলে ভারী বোকা। একটু বুদ্ধিসুদ্ধি থাকলে কখনো এমন কাণ্ড করে?

শান্তি বলল, ওতো কাণ্ড বাধিয়েই খালাস, এখন জল কদ্দুর গড়ায় ছাখ। আমাদের সুদ্ধ না তাড়িয়ে দেয়।

বুড়ীও সেই আশঙ্কা প্রকাশ করল—"এ সব জানাজানি হলে আমরা কেন মালিককে নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে।"

শুক্লা বলল, জানাজানি হবে কেমন করে? আমরা তো আর এখানকার কথা কাউকে কিছু বলতে যাচ্ছি না। এখানে আমরা থাকিও না। আমরা রেষ্টুরেণ্টে কাজ করি।

বুড়ী হাসল –"পুলিশ যদি টের পায় রেষ্টুরেণ্ট্ ফেষ্টুরেণ্ট কোনোটাই চাপা থাকবে না।"

একথার পরে আর শান্তি শুক্লার কোনো সাড়া পাওয়া গেলনা। রূপার দিকে ফিরল তারা। চোখ মেলেছে দেখে মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। শান্তি বলল, এখন কেমন লাগছে?

শুক্লা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি!" বুড়ীও এসে দাঁড়িয়েছিল এক পাশে। জিজ্ঞাসা করল, "কিছু খাবে?"

"রূপা কারো কোনো প্রশ্নের উত্তর দিলনা। শুধু বলল, আমি মার কাছে যাবো।"

"যাবি বৈ কি?" আশ্বাস দিল শান্তি "রাত পোহালেই নিয়ে যাবো। এখন ঘুমো।"

শুক্লা ওর চুলে হাত দিয়ে বলল, মাথাটা একটু তুলতে পারবি? চুলটা খুলে দিই। শুকিয়ে যাবে। বুড়ী বলল, জামাটাও বদলে দাও। ওপর দিকটা ভিজে গেছে।

পরদিন ফেরার পথে শান্তি শুক্লা ওকে বারবার করে বলেছিল, "এসব কিছু যেন বলিস না কাউকে। তোর মাকেও না। শুধু বলবি, আমাদের

সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলি কোলকাতায়, আমাদের কাছেই ছিলি সব সময়। আমরা কি করি টরি তাও বলবার দরকার নেই। বলবি, একটা ঘর নিয়ে থাকি। দিনের বেলা পার্টির কাজে বেরিয়ে যাই, সন্ধের সময় ফিরে আসি। দুবেলা নিজেরা রান্না করে খাই।"

রূপার যদি বুদ্ধি থাকত, এই পরামর্শই শুনত। এই পথই ধরত। কলোনীর বহু মেয়ে যা ধরেছে। উপর উপর ঠিক থাকলেই হল। ভিতরে ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব ভিতরেই থাক। কেউ তো জানতে চাইছে না। আসলে হয়ত জানে। বাপ মা জানে মেয়ে কী করে, কোথায় যায়, ভাইএরা জানে বোন তাদের কোথা থেকে পয়সা আনে, কি ভাবে আসে তাদের জামা কাপড় প্রসাধন। কিন্তু জেনেও কিছু বলে না। কেউ কাউকে ঘাঁটাতে যায় না। সব ঘরেই প্রায় এক ইতিহাস। চাপা আছে থাক, খুঁচিয়ে তুলতে গেলে সকলেরই অসুবিধা। সেটা সকলেই বোঝে।

শুক্লা ঠিকই বলেছিল। ঘটে একটু বুদ্ধি থাকলে রূপা যে কাণ্ডটা করে বসল, কখনো করত না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলত না। তার পরম ভাগ্য যে সে প্রথম নজরেই মালিকের চোখে লেগে গিয়েছিল, যার জন্যে তাকে 'রেষ্টুরেণ্টে' না পাঠিয়ে একেবারে সরাসরি মাসাজ ক্লিনিকে নিয়ে তুলেছিল। ঝানু ব্যবসাদার, এই হঠাৎ-পাওয়া মেয়েটার সদ্য-ফোটা তাজা যৌবনকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেয়েছিল। কপাল খুলে যেত রূপার। মাইনে তো ছিলই, তার উপরে "রুগীদের" দরাজ বখসিস। বুড়ী সেটা তার কাছে গোপন রাখে নি। ঘরে ঢুকবার পরেই সে প্রমাণ সে নিজেও পেয়েছিল। "রুগী" তাকে খালি হাতে পেতে চায় নি। রূপা বোকা মেয়ে। তাই নিজের ভবিষ্যৎ বুঝল না। ঐ রকম বেয়াড়াপনা করে বসল।

রেষ্টুরেণ্টের পিছনে সেই ছোট ঘরটায় নিয়ে শান্তি শুক্লা তাকে কম শোনায় নি পরদিন—"তুই একটা গাধা। ঘরের মধ্যে কী হচ্ছে, কেউ জানত নাকি? বাইরে সবাই জানত তুই নার্স। নার্সের পোষাক পরে কলোনীতে গিয়ে একবার দাঁড়ালে সক্কলের কাছে তোর কদর বেড়ে যেত। তোর মাকেও আর বাড়ি বাড়ি বাসন মাজতে হত না…এখনো ভেবে ছাখ্। যা হয়ে গ্যাছে, হয়ে গ্যাছে। রাজী থাকিস তো মালিককে বলে কয়ে রেখে দিতে পারি।"

কিন্তু রূপা রাজী হয় নি। শান্তি-শুক্লা যে তাকে বার বার করে অনুরোধ করেছিল—"কাউকে কিছু বলিসনে ভাই—" তাও রাখে নি। কলোনীতে পা দিয়েই ছুটে গিয়েছিল মার কাছে, কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই নিজে থেকে সব কিছু বলে গিয়েছিল। আগাগোড়া সব খুঁটিনাটি। কলোনীতে আড়াল বলে কিছু নেই। গায়ে গায়ে ঘর। বেড়া বলে যেটা আছে, সে শুধু নামে। চারদিকের খোলা চোখ এবং খাড়া কানকে তারা আটকাতে পারে না। রূপার মা মেয়েকে থামাতে চেয়েছিল। ত্রস্ত চোখে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল, চুপ চুপ। কিন্তু মেয়ে সে কথায় কান দেয় নি। তার মা অবাক হয়ে গিয়েছিল। রূপা ছেলেবেলা থেকে শান্ত, নিরীহ, যে যা বলে শোনে, সাত চড়ে রা করে না। বোকা বলে সবাই তাকে অবজ্ঞা করে, কথা বলতে গেলে থামিয়ে দেয়। সে প্রতিবাদ করে না, নিঃশব্দে মেনে নেয়। তাকে কেউ রাগতে দেখেনি। সে মেয়ের একী হল! সে যেন ফুঁসছে। ক্ষোভে রোষে অপমানে বঞ্চনায় না কিসে, তার মা জানে না। সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। একে নিয়ে সে কি করবে এখন! হঠাৎ মনে হয়েছিল 'ম্যানেজার দিদিমণির' কথা। তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

নীহারও অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই মেয়েটাকে সে আজ প্রথম দেখলনা। এর আগে যেদিন এসেছিল চুপ করে বসে ছিল ঐ বেঞ্চিটার উপর মায়ের গা ঘেঁষে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে যেন ভয়ে ভয়ে দেখছিল তার দিকে। শান্ত ভীরু দুটি চোখ। সারা মুখময় একটি সলজ্জ কমনীয়তা। একটি দুটির বেশী কথা বলেনি। তাও নিজে থেকে নয়, নীহারের প্রশ্নের উত্তরে, মৃদু স্বরে।

সেই মেয়ে আজ তার চোখের উপর পূর্ণ দৃষ্টি মেলে নির্লজ্জ প্রগলভের মত অসঙ্কোচে বলে গেল, একটি দুটি নয়, অনেক কথা যা এই বয়সী কোনো মেয়ে এমন অনায়াসে মুখ ফুটে বলতে পারে নীহার ভাবতে পারে না। আকারে ইঙ্গিতে বলতে গেলেও বাধে। ওর এতটুকু বাধল না। এত বড় লজ্জার কাহিনী শোনাতে গিয়ে মুখের উপর একটা লজ্জার ছায়াও পড়ল না।

সেদিনকার সে কোমলতাও যেন হঠাৎ উবে গেছে, লক্ষ করল নীহার।

একটা কঠোর রুক্ষতায় ছেয়ে আছে চোখ মুখ। যেন একটা দিনেই অনেক বয়স বেড়ে গেছে মেয়েটার।

তাই যায়, মনে মনে মাথা নাড়ল নীহার। বয়স তো সব সময়ে শুধু বছরের হিসাবে বাড়ে না, বাড়ে অভিজ্ঞতায়। সব অভিজ্ঞতা নয়, কোনো কোনো অভিজ্ঞতা যার তাত ও আঘাত এক একটা মানুষকে যেন রাতারাতি টেনে বড় করে দেয়। কামারশালার আগুনে পুড়ে হাতুড়ির ঘা খেয়ে একখণ্ড কাঁচা লোহার যে রূপান্তর ঘটে এও অনেকটা সেই রকম। চেহারাই শুধু বদলায় না, প্রকৃতিও পালটে যায়।

রূপাও তেমনি একটা রাতের কঠোর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। তার ভিতরে যে স্নিগ্ধতা ও মাধুর্যের রসটুকু ছিল হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেছে।

অথচ অন্য মেয়েরা, ওদেরই আশপাশের ঘরে যারা থাকে, ওরই মত অবস্থায় পড়ে তার সঙ্গে বেমালুম খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ভিতরে ভিতরে যদি কোনো বিদ্রোহ জেগে থাকে, বাইরে সেটা প্রকাশ পায়নি। প্রতিবাদ করেনি। অন্ততঃ ইংরেজিতে যাকে সীন ক্রিয়েট্ করা বলে— রূপা যা করে বসল—তেমন কিছুই করেনি।

অন্যেরা যা পেরেছে ও কেন তা পারল না? তার কারণ ওর বন্ধুরাই বলে দিয়েছে—'তুই একটা গাধা।' হয়তো তাই। ঘটে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি থাকলে ঐ মাসাজ-ক্লিনিকেই থেকে যেতে পারত এবং সুখে থাকত। প্রথম দিন ঐ রকম একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধালেও মালিক তাকে সরাসরি বিদায় করতে চায়নি। ওর বন্ধুদের বলেছিল, তোমরা ওকে বোঝাও। যদি বশ মানে আমি ওর জন্যে ভালো ব্যবস্থা করে দেবো। শান্তি শুক্লা ওকে বোঝাতে কসুর করেনি। কিন্তু রূপার ঐ এক কথা—না, আমি মার কাছে যাবো।

মা ওকে আদর করে ঘরে তোলেনি। তার প্রথম কথাই হল—কেন গেলি ওদের সাথে? আর গেলি যদি, অত সতী-গিরি ফলাবার কি দরকার ছিল?

রূপার মাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। মেয়ে শান্তি-শুক্লা বা ঐ ধরণের আর যারা রয়েছে চারদিকে, তাদের পথ ধরুক, এটা সে চায়নি।

কোনো রকমে দুবেলা দুটো জুটছিল। না জুটলেও মেয়ের 'রোজগার' দিয়ে অভাব মেটাবার মত মনোভাব তার ছিল না। মেয়ের উপর আশপাশের কয়েকটা ছেলের নজর আছে জানতে পেরে ওকেই সে যখন তখন বকাবকি করত—তোর আস্কারা না পেলে খালি খালি আসে ওরা? মার ধোরও করেছে মাঝে মাঝে। সন্দেহজনক মেয়েগুলোর সঙ্গেও মিশতে নিষেধ করে দিয়েছিল। অর্থাৎ চারদিকের ক্লেদের ছোঁয়া থেকে যথাসাধ্য বাঁচাবার চেষ্টা করেছে মেয়েকে। যদিও মনে মনে জানত শেষ পর্যন্ত বোধহয় বাঁচানো যাবেনা। এখানকার আবহাওয়াকে আটকাবে কেমন করে? চারদিক থেকে যে প্রলোভন দিনরাত হাত বাড়িয়ে টানছে তাকে ঠেকাবে কী দিয়ে? সত্যিই যখন ঠেকানো গেলনা, মেয়ে সেই সাধারণ পথই ধরল, তার মত অন্য দশজন যে পথে নেমেছে, তখন থেকে গেলেই তো পারত। ভিড়ের ভিতর। কোনো কথা উঠত না। আসত যেত যেমন অন্য মেয়েগুলো আসে যায়। তা নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনা। প্রথম প্রথম মনটা হয়তো খুঁত খুঁত করত—আহা, তার একটা মাত্র মেয়ে, তারও এই হাল হল! তারপর আস্তে আস্তে সয়ে যেত। কী করবে সে? আর সব মায়েরা যদি মেনে নিতে পারে, সেই বা কেন নেবেনা? সে তো আর ওদের থেকে আলাদা নয়।

কিন্তু এ কী করে বসল বোকা মেয়েটা! নামলই যদি তবে আবার ফিরে আসা কেন? বেশ, ফিরে না হয় এল। এসে চুপ করে গেলেই হত। কী দরকার ছিল ঢাক পিটিয়ে চার দিক তোলপাড় করবার? কেউ তো জানতে চায়নি কোথায় গিয়েছিল সে, কী হয়েছে সেখানে। মা হয়ে সে নিজেও জানতে চায়নি। ফিরে আসতেই বলেছিল, চুপচাপ থাক। যা হয়ে গেছে যেতে দে। মেয়ে শুনল না। চেঁচিয়ে মেচিয়ে কেঁদে কেটে সব ফাঁস করে দিল। এ তো শুধু ওর নিজের কথা নয়, এর মধ্যে রয়েছে শান্তি শুক্লার মত আরো অনেক মেয়ের কাহিনী যা এতদিন আড়ালে ছিল এবং আড়ালে রাখতে চেয়েছিল তারা এবং তাদের বাপ মা অভিভাবকেরা। আজ সারা কলোনীতে সাড়া পড়ে গেছে একটা মেয়েকে নিয়ে। যেন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে ফেলেছে সে।

ভয়ঙ্কর তো বটেই। একটা কুৎসিত বিষাক্ত সাপ, যে এতদিন এই

কলোনীর তলায় গর্তের মধ্যে লুকিয়েছিল, তাকে ও হঠাৎ বাইরে এনে ছেড়ে দিয়েছে।

রূপার কথা যখন শেষ হয়েছে তারপরেও নীহার তার দিকে তাকিয়েছিল। তার মা একরাশ কি বলে যাচ্ছিল সব তার কানে ঢুকছিল না। নীহার ভাবছিল, ওর মা বলছে মেয়েটা বোকা, ওর বন্ধুরাও তাই বলেছে, এ কাহিনী যারা শুনবে হয়তো সবাই তাই বলবে। কিন্তু শুধু বোকা বলেই কি সে এতবড় একটা কাণ্ড করে বসল? পুরুষের লালসা ও গায়ের জোরের শিকার হয়েছে, এমন অনেক মেয়েকে সে জানে। ওপার থেকে যারা দলে দলে চলে এসেছে তার মধ্যে বহু মেয়েই এই চরম অভিজ্ঞতা এড়াতে পারেনি। বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে নীহার তাদের নিজের চোখে দেখেছে, নিজের কানে শুনেছে তাদের লাঞ্ছনার কাহিনী। কী করেছে তারা? স্বেচ্ছায় আত্মদান কেউ করেনি, বাধা দিয়েছে যতটা সম্ভব, তারপর ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে। এ ছেড়ে দেওয়া অনেকটা যেন অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পন, ঐ অবস্থায় যা অনিবার্য, যা অবশ্যম্ভাবী, তাকেই মনে মনে মেনে নেওয়া।

একটি মেয়ে বলেছিল, "কী করবো বল, বিধাতাই তো মেরে রেখেছে আমাদের, যেদিন মেয়েমানুষ করে পাঠিয়েছিল সংসারে।" অর্থাৎ এটা যেন বিধিলিপি, মেয়ে হয়ে জন্মাবার দণ্ড বা অভিশাপ।

অনেকেই তাদের জীবনের এই কটা মুহূর্তকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। কেউ যেন না জানে, অন্ততঃ পুরুষের কানে যেন না যায়। তারা জানে সেখান থেকে হয়তো সহানুভূতি বা করুনার অভাব হবে না। যা ঘটে গেল তাকে একটা নিছক দুর্ঘটনা বলে দেখবার মত উদার দৃষ্টিও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই দৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকবে অসম্মান, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন ঘৃণা। মেয়েরা জানে ধর্ষিতা নারীকে কী চোখে দেখে পুরুষ। আগে তাকে অস্পৃশ্য বলে বর্জন করত। কিন্তু দেশবিভাগের বিপর্যয়ের পর তাদের সংখ্যাটা এমন বিপুল আকার নিয়ে এল যে, পুরুষ সমাজ তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হল। তার বিচার বুদ্ধি বা বাস্তব অবস্থার উপলব্ধি তাকে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। কিন্তু সে গ্রহণ কি সসম্মানে গ্রহণ? তার পিছনে কি অকুণ্ঠ ও উন্মুখ অন্তরের সায় আছে?

একটি মেয়ে, দেশ থেকে উৎখাত হবার কয়েক মাস আগে তার বিয়ে

হয়েছে, নীহারকে বলেছিল, সর্বনাশ যখন ঘটল, তার আগে তার স্বামীকে তারা মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। জ্ঞান ফিরে এলে ও শুধু একটা কথাই বারবার জিজ্ঞেস করছিল আমাকে। আমি জানি যদি অস্বীকার করি ও অবিশ্বাস করবে। তাই বলে ফেললাম। ও এমন চোখে তাকাল আমার দিকে যেন আমি আর সে আমি নই, অন্য মানুষ। তারপর থেকে যখন তখন বলে 'ওটা কিছুনা, স্রেফ ভুলে যাও ওকথা।' আমি বুঝতে পারি, আমি ভুললেও ও কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

যারা লুকিয়ে রাখতে চায়নি এমন কজনকেও জানে নীহার। কুমারী মেয়ে। অসঙ্কোচে বলে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে একটা দুরন্ত অভিমান, যারা এর জন্যে দায়ী, এই অবস্থার মধ্যে মেয়েদের যারা টেনে এনেছে, তাদের উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ।

একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছিল তার মায়ের একটি মাত্র কথায়— "তোকে ওরা মেরে ফেললনা কেন হতভাগী ?" সে দেখিয়ে গেল, ওরা না মারলেও সে নিজেতো নিজেকে মারতে পারে।

লুকিয়েই রাখুক আর প্রকাশই করুক, এমন একটি মেয়ের কথাও নীহার মনে করতে পারলনা যে এই বোকা মেয়েটার মত পুরুষের পাশব আক্রমণকে শুধু প্রাণপণ বাধা দেয়নি, সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছে। একা, অসহায় এবং বন্দী। উদ্ধারের কোনো পথ নেই। বরং যাদের বন্ধু বলে বিশ্বাস করেছিল, তারাই তাকে ঠেলে দিয়েছে ঐ লোকটার কবলে, যে তাকে পিষে মারতে পারে। তবু সে ভেঙে পড়েনি, ভয় পায়নি। অন্য কোনো অস্ত্র না পেয়ে বিধাতার দেওয়া যে আদিম অস্ত্র নখ এবং দাঁত, তাই নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ বল সে কোথা থেকে পেল ? একে গোঁয়াতুমি বলে উড়িয়ে দিলে ভুল করা হবে। তার মা প্রথমটা তাই বলেছিল, তারপর নিজেই নিজের প্রতিবাদ করেছে—'গোঁয়ার তো ও কোনোদিন ছিল না। ভীতু ঠাণ্ডা, সাত চড়ে রা করেনা।' তবে কী এটা ? মনোবল ? নৈতিক বল ? নাম যা-ই হোক, নীহারের মনে হল, এ বস্তু যে পায় সে আপনা থেকেই পায়। কোত্থেকে, কেমন করে—সে প্রশ্নের কোনো মীমাংসা নেই। কোন্ পরিবেশে, কী শিক্ষা দীক্ষা বা আদর্শের আওতায় সে মানুষ, সে কথাও অবান্তর।

রূপা তখনো মাথা নীচু করে বসে আছে বেঞ্চির উপর। সেই দিকে আরেকবার চেয়ে দেখল নীহার। মনে হল মেয়েটার গোটা রূপটাই বদলে গেছে। এতক্ষণ তাকে সে স্নেহের চোখে সহানুভূতির চোখে দেখছিল, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল শ্রদ্ধা। হ্যাঁ, এই একফোঁটা তুচ্ছ উদ্বাস্তু মেয়েটা তার কাছে শুধু নয়, সব মেয়ের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্রী। নারী জীবনের যেটা সবচেয়ে বড় এবং অত্যাজ্য সম্পদ তাকে ও আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করেছে, কারো সাহায্যে নয়, নিজের আশ্চর্য শক্তির বলে।

ওর দিকে চেয়ে চেয়ে নীহারের হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার নিজের জীবনের একটা ছোট্ট অধ্যায়, না কেউ জানেনা, কাউকে সে বলেনি। সে-ও তো প্রায় ঐ অবস্থায় পড়েছিল। সেই মুহূর্তে সহসা যদি—থাক, ঐ বিশেষ কথাটা এতদিন যখন বন্ধ আছে আজ আর তার কপাট খুলে দিয়ে কাজ নেই। আর পিছন ফিরে তাকানো নয়। যা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তারই দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে চলা।

রূপার মার বকবকানি তখনো থামেনি। তার মধ্যে একটা কথা নীহারের কানে গেল—চাটগাঁর দেহাতী ভাষায়, তার মধ্যে হতাশার সুর—এটাকে নিয়ে আমি এখন কী করি ?

—তোমাকে কিছু করতে হবে না।

কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে কেমন অর্থহীন ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল রূপার মা। নীহার যোগ করল, ওকে আমার কাছে রেখে যাও।

॥ ১৪ ॥

নীহার ভেবে দেখল, এই মেয়েটা শুধু যে তার মার কাছেই এক অবাঞ্ছিত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, ওকে নিয়ে গোটা কলোনীতে এমন উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে এখন অন্ততঃ তাকে তার মধ্যে পাঠানো ঠিক হবেনা। যেখানে হোক একটা আশ্রয় ওকে দিতে হবে। অভিজিৎকে বললে এ বাড়িতেই রেখে দেবার ব্যবস্থা হতে পারে। আশ্রিত স্ত্রীলোক অনেক আছে এখানে। কিন্তু তারা একে কী চোখে দেখবে সহজেই বোঝা যায়। তাছাড়া কলোনীর উপরেও তার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। 'আমাদের মেয়ে তোমরা ধরে নিয়ে আটকে রেখেছ'—এমনি একটা ধুয়ো তুলতে কতক্ষণ? সমস্ত ব্যাপারটা হয়তো তখন একটা পলিটিক্যাল রূপ নিয়ে নতুন কোনো আন্দোলনের রসদ যোগাবে। বাহিরের 'নেতারা' তো সেই ফাঁকই খুঁজছেন।

সে সব কথা বাদ দিলেও একে যেখানে সেখানে রেখে দেওয়ায় নীহারের মন সায় দিচ্ছিল না। এই তুচ্ছ উদ্বাস্তু মেয়েটাকে কেউ বুঝবে না। কোলকাতায় পালিয়ে গিয়েছিল, তারপর একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে এসেছে —এর সম্বন্ধে এইটাই সাধারণ অভিমত। সেই ভাবেই দেখবে সবাই। কেউ জানবে না কী আছে এর মধ্যে, জানতে চাইবে না।

রূপা ছোট্ট বেঞ্চিটার উপর চুপ করে বসে ছিল। নীহার চেয়ে দেখল। তার চোখে মুখে এতক্ষণ যে উত্তেজনার ঝাঁজ ছিল সেটা এবার মিলিয়ে গেছে। আগেকার সেই শান্ত লাজুক ভাবটা অনেকখানি ফিরে এসেছে, চোখে সেই সরল চাহনি।

"মার জন্যে মন কেমন করছে?"

রূপা মৃদু হেসে মাথা নেড়ে জানাল, না।

"ধর যদি তোমাকে আমাদের বাসায় বা অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হয় মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?"

রূপা বাঁ দিকে মাথা নোয়াল—পারবে।

দরজার বাইরে একটি পরিচিত কাশির আওয়াজ পেয়ে নীহার বলল, কী হলধর ?

"আজ্ঞে, বৌরানী বললেন, আপনার যদি সময় থাকে একবারটি ওপরে যাবেন।" ঘরে ঢুকে রূপাকে একা বসে থাকতে দেখে বলে উঠল, ওর মা কোথায় গেল ?

"কাজে গ্যাছে বোধহয়।"

"এই সেরেছে! মেয়েকে নিয়ে যেতে আসবে তো ? একে কিন্তু একা ছেড়ে দেওয়া মোটেই ঠিক হবে না।

নীহার হাসি চেপে বলল, ওর মা না আসে তুমি পৌঁচে দিয়ে এসো।

"আমি! আপনার পায়ে পড়ি দিদিমণি, ঐ হুকুমটা করবেন না। আবার কোত্থেকে কোথায় চলে যাবে, তারপর আমাকে ধরে টানাটানি।

নীহার এবার হেসে ফেলল—আচ্ছা, তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে না। বৌরানীকে বল গিয়ে আমি মিনিট দশেকের মধ্যে যাচ্ছি। বাবু আছেন তো ?

"না। তিনিও এতক্ষণ বৌরানীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। একটু আগে উঠে নিজের ঘরে গেলেন।"

"ও, আচ্ছা। তাহলে চল আমি এখনই যাচ্ছি।"

রূপার দিকে ফিরে বলল, তুমি এখানে ব'সো, কেমন ? আমি একটু পরেই আসছি।

"হ্যাঁ, চুপটি করে বসে থাকো।"—খবরদারির সুরে যোগ করল হলধর, "ম্যানেজার দিদিমণি যতক্ষণ না আসছেন কোথাও যাবে না।"

বৌরানীর কাছ থেকে সম্ভাব্য অনুযোগ আসবার আগে নীহার নিজেই বিনীত কণ্ঠে ত্রুটি স্বীকার করল, অনেক দিন আসতে পারিনি।

বৌরানী হাসি মুখে বললেন, আমিও ডাকিনি। জানি, নানা ঝঞ্ঝাটে আছ তোমরা। ঠাকুরপোর সঙ্গেও বড় একটা কথাবার্তা হয় না আজকাল।

বলতে বলতে হাসিটা মিলিয়ে গেল। একটা ম্লান ছায়া পড়ল মুখের উপর। মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে অনেকটা যেন স্বগতোক্তির মত বললেন, আগে জানলে ওকে আমি কাশী থেকে টেনে আনতাম না। বেশ ছিল নিজের

মনে। যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াত, পড়াশুনা গান বাজনা নিয়ে থাকত। এখানে এসে সব গ্যাছে। তার বদলে—যাক, যে-জন্যে তোমাকে ডেকেছি, আজ ওদিকটা একটু সকাল সকাল সেরে নিতে হবে তোমাকে।

"বেশ তো। কী করতে হবে বলুন।"

"আমি একটু বেরোবো তোমার সঙ্গে।"

নীহার সবিস্ময়ে চোখ তুলল। সেই দিকে চেয়ে যোগ করলেন, খুব অবাক হয়ে গ্যাছ, না? হবার কথাই। কোথায় যাচ্ছি শুনলে আরো অবাক হবে।…যাচ্ছি তোমাদের বাড়ি।

—আমাদের বাড়ি!

নীহারের চোখের বিস্ময় এবার কণ্ঠেও ফুটে উঠল। সেই সঙ্গে একটা অপ্রত্যাশিত খুশির সুর—সত্যি যাবেন? আমি কিন্তু কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

দিদিমা তো আপনাকে দেখবার জন্যে পাগল। কতদিন বলেছেন আমাকে একদিন নিয়ে চল ওঁর কাছে।

"আননি কেন?" অনুযোগের সুর বৌরানীর।

"আমি যখন বেরোই, উনি তখন ভীষণ ব্যস্ত।"

"বেশ তো, তোমার যেদিন ছুটি, ওঁর ফুরসত মত কোনো সময়ে নিয়ে আসতে পারতে।"

"ছুটির দিনগুলোয় এমন কুঁড়েমিতে ধরে"—বলে হেসে ফেলল নীহার। বৌরানীও হাসলেন, "কই, তোমাকে দেখে তো তা মনে হয় না। বরং ঠিক উলটো; চলায়ফেরায় কাজে কর্মে সব সময়েই চটপটে।

নীহার প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বলল, কখন বেরোবেন?

"আমি তো এখনই তৈরী। তুমি ছাখ, গাড়িটাড়ি কখন আছে। যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। ফিরতে আবার বেশী রাত না হয়।

নীহার তখনই নীচে নেমে এল। ভাবতে ভাবতে এল রূপাকে নিয়ে কী করা যায়। সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যেত। আপাততঃ তাই ভেবে রেখেছিল। যতদিন অন্য কোনো বন্দোবস্ত না করতে পারে ওদের ওখানেই থাকত। দিদিমার ছোটখাটো কাজকর্মগুলো করে দিত। কিন্তু বৌরানী যাচ্ছেন, এখন আর সেটা সম্ভব নয়। জানতে চাইলে, ও যে এই কলোনীর

মেয়ে সেটা চেপে যাওয়া ঠিক হবেনা। তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে কেন যাচ্ছে। কারণটা সংক্ষেপে বলতে গেলেও আসল ঘটনাগুলো একেবারে ঢেকে রাখা যাবে না। কী ভাববেন বৌরানী? তাছাড়া অভিজিতকে এখনো কিছুই বলা হয়নি।

ঘরে ঢুকবার আগেই রূপার গলা পাওয়া গেল। কার সঙ্গে যেন অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। রীতিমত খুশির সুর। হলধরের সঙ্গে এতটা ভাব হয়ে যাবে, সেটা দুদিক থেকেই অকল্পনীয়। কিন্তু সে ছাড়া এখন আর কে আসতে পারে তার আফিসে?

ঢুকে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নীহার। রূপার বেঞ্চির আর একটা কোণ দখল করে ছিল শম্ভুচরণ। ম্যানেজারকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে পড়ে নমস্কার করল।

"কখন এলেন?" বলতে বলতে নীহার তার চেয়ারে গিয়ে বসল। চোখের ইঙ্গিতে শম্ভুকেও সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, বসুন। শম্ভু তার আগের জায়গাতেই বসে পড়ে বলল, এই আসছি।

"মার খবর কি, বলুন।"

"তেমন ভালো নয়।"

"হাসপাতালেই আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি তাহলে কলোনীতে এখনো আসেন নি?"

"আজ্ঞে না। মার দেখাশুনার জন্যে কাছাকাছি থাকতে হচ্ছে।"

নীহার আর কোনো প্রশ্ন করল না। শম্ভু বুঝতে পারল, সে কী জন্যে এসেছে, কী বলতে চায় সেটা জানবার জন্যেই এ নীরবতা। একবার রূপার দিকে তাকাল, একটু ইতস্ততঃ করল, তারপর বলল, এই মাত্তর ওর মার কাছে থেকে আসছি।

'দাঁড়ান', বলে উঠে পড়ল নীহার। রূপাকে হাতের ইশারায় ডেকে নিয়ে ও পাশের একটা খালি ঘরে বসিয়ে রেখে ফিরে এসে বলল, বলুন।

শম্ভু বলল, না; আমি কিছু বলতে আসিনি, এমনিই এলাম।

একটু থেমে ধীরে ধীরে যোগ করল, "চোখের ওপর দেখছি কলোনীর

মেয়েগুলো একটা একটা করে বড় হচ্ছে আর জাহান্নামের পথ ধরছে। কিছু করতে পারছি না। এটাও যেতে বসেছিল। আপনি ওঁকে বাঁচিয়ে দিলেন।....

"হলধরের কাছে শুনলাম আপনি এখনই বাইরে যাচ্ছেন। তাহলে আর আটকে রাখবো না।"

বলেই উঠতে যাচ্ছিল। নীহার বাঁ হাতের ছোট্ট ঘড়িটার দিকে চেয়ে বলল, বসুন না। এখনো মিনিট দশেক সময় হাতে আছে।

শম্ভু অপেক্ষা করে রইল, কিছু হয়তো বলবেন, ম্যানেজার। তার মুখের ভাব থেকেও সেই রকমটা মনে হল। বলতে চান, কিন্তু ইতস্ততঃ করছেন। তখন সে নিজেই অগ্রণী হল—"আমাকে কিছু বলবেন ?"

"না, মানে ঐ মেয়েটির ব্যাপারেই। আজ বিকেলে ওকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো ভেবে রেখেছিলাম। আপাততঃ আমাদের বাসায় থাকবে। কিন্তু এখ্‌খনি বেরোতে হচ্ছে বলে—"

"ও, তা বেশ তো। আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। আজ সন্ধ্যার দিকে কিংবা কাল যখন বলবেন আপনার বাসায় পৌঁছে দেবো।"

"আপনার কোনো অসুবিধে হবে না ?"

"কিচ্ছু না। আমি এক বন্ধুর বাসায় আছি। তার বৌ ছেলে আছে। সেখানেই থাকতে পারবে।"

নীহার আশ্বস্ত হল। তারপরেই ভাবল, রূপাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। শম্ভুচরণকে বসতে বলে পাশের ঘরে গিয়ে বলল, শোনো রূপা, আজ আর তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারছ না। আমাকে অন্য কাজে বেরোতে হচ্ছে। শম্ভুবাবুকে বলতে আজকের মত উনি তোমাকে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছেন। যাবে ? ওঁর এক বন্ধুর—

কথাটা শেষ হবার আগেই রূপা উঠে দাঁড়াল। নীহার অবাক হয়ে দেখল, তার সারা মুখখানা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মনে পড়ল, একটু আগে তার ঘরের বাইরে থেকে এর গলা শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যেও উপচে পড়ছিল খুশির সুর। ঘরে ঢুকে যখন দেখল সে শম্ভুচরণের সঙ্গে কথা বলছে, নীহার মনে মনে হেসেছিল—মেয়েটা সত্যিই বড় সরল।

তাছাড়া শম্ভুচরণকে কলোনীর ছেলেমেয়েরা সকলেই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে একান্ত নিকটজন বলে মনে করে।

এই মুহূর্তে ওর চোখ মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, বোধ হয় সেইটুকুই সব নয়।

মিনিট কয়েক পরে রূপা যখন শম্ভুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল, নীহার পিছনে দাঁড়িয়ে দেখল সে যেন হেঁটে যাচ্ছে না, হাওয়ায় ভেসে চলেছে।

দিদিমা জানতেন, বৌরানী বিধবা। তাঁর রূপের খ্যাতিও শুনেছিলেন নাতনীর মুখে। সেদিক দিয়ে তিনি বিস্মিত হন নি, যদিও কোনো প্রৌঢ়া নারীর মুখমণ্ডলে এমন একটা সতেজ সুষমা এর আগে কোথাও দেখেন নি। একদা বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত হলেও তাঁর বর্তমান জীবনযাত্রা অতি সরল, সাদাসিদে, সে কথাও বলেছিল নীহার। কিন্তু বৌরানী যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, পরণে শান্তিপুরী থান, সর্বাঙ্গে জড়ানো মোটা সিল্কের চাদর, খালি পা, সম্পূর্ণ নিরাভরণ—গলায় একটি সূক্ষ্ম হার পর্যন্ত নেই, কিংবা হাতে একটি আংটি—দিদিমা কিছুক্ষণ বিস্ময়ে চোখের পলক ফেলতে পারলেন না। নীহার ফিসফিস করে 'বৌরানী' কথাটা উচ্চারণ করতেই সামলে নিলেন, নাতনীকে প্রায় ধমকে উঠলেন, থাক তোকে আর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। আমি দেখেই বুঝেছি। এসো মা এসো।

'এসো' কথাটাও অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে এলো। মহামায়া তো শুধু বড় ঘরের বধূ নন, এক অতিপ্রাচীন ও প্রখ্যাত জমিদার পরিবারের প্রৌঢ়া গৃহিনী। তাঁকে 'আসুন', বলে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করাই সমুচিত হত। কিন্তু কী ছিল তাঁর মুখে চাল-চলনে কিংবা সহজ অনাড়ম্বর বেশে দিদিমা প্রথম দেখাতেই তাঁকে আপন করে নিলেন এবং সোফা-কৌচ দিয়ে সাজানো বাইরের ঘরে না বসিয়ে একবারে নিজের শোবার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। মহামায়া যখন নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন, তখনো 'থাক' 'থাক' করে সরে গেলেন না, বেশ সহজ ভাবেই সেটা গ্রহণ করলেন। মাথায় হাত রাখলেন, কিন্তু কোনো আশীর্বাদ সূচক কথা শোনা গেল না। তার বদলে কেমন একটা ধরা ধরা উদাস সুরে বললেন, যা মনে করেছিলাম তাতো নয়, তুমি বোধহয় ওর মায়ের বয়সীই হবে, কিংবা হয় তো কিছু ছোট। ঐ

একটিই দিয়েছিলেন ভগবান। বড় অসময়ে চলে গেল। তাও যদি স্বাভাবিক ভাবে যেত—

বলতে বলতে গলাটা প্রায় মিলিয়ে এল, চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। হঠাৎ নিজেকে সংবরণ করে নিলেন। মুখে একটা ম্লান হাসি টেনে এনে বললেন, এই ছাখ, প্রথম এলে তুমি। কোথায় তোমার কাছ থেকে দুটো কথা শুনবো, তা না, নিজেই কাঁছুনি গাইতে শুরু করলাম। তুমি ভালো হয়ে বসো মা। খুকু, ওঁর কাছে একটু ব'স। আমি এখখনি আসছি।

এই হঠাৎ বাইরে যাবার প্রয়োজনটা নীহার যেমন বুঝল, বৌরানীও মনে মনে অনুভব করলেন। নিজেকে তখনই সামলে নিলেও পুরোপুরি আত্মস্থ হতে কিছু সময় লাগবে।

বৌরানীর কাছে এ একটা নতুন জীবন যার স্বাদ তিনি তাঁর বিবাহিত জীবনে কখনো পাননি। 'কর্তাদের আমলে' তাঁর বাইরে বেরোবার কাল ও উপলক্ষ—দুইই ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ক্বচিৎ কখনো আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি যখন যেতেন, সর্বত্রই তিনি বাঁড়ুয্যে বাড়ির বৌরানী। ঐ পরিচয়টি তাঁকে বর্মের মত ঘিরে রাখত। উৎসবে অনুষ্ঠানে সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে একত্র হলেও এক হয়ে মিশে যাবার উপায় ছিল না। পূজোপার্বণে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর কিংবা অন্য কোন দেবস্থানে যখন যাবার সুযোগ ঘটত, সেখানেও বাঁড়ুয্যে বাড়ি তার দাসদাসী পাইক বরকন্দাজের সমারোহ নিয়ে সদলবলে উপস্থিত।

তারপর একে একে সবাই যখন চলে গেলেন, মাথার উপর কেউ রইলেন না, একেবারে একা হয়ে গেলেন বৌরানী, তখন ইচ্ছা করলে অনায়াসে বেরোতে পারতেন। বিশেষ কোথাও না হোক, এই বিশাল তিনমহলা ভবনের অবরোধ থেকে একটু বাইরে দিয়ে দাঁড়ানো। কিন্তু সে ইচ্ছাটাই চলে গিয়েছিল। বাধা নিষেধের বেড়া যেদিন ছিল, তাকে ডিঙোবার জন্যে মনটা মাঝে মাঝে ছটফট করত। সে যখন রইল না তখন এই বন্দিদশার সঙ্গে ভিতরে ভিতরে যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। এতকাল পরে যখন বেরিয়ে পড়লেন, এক অদ্ভুত মুক্তির হাওয়া লাগল মনে।

নীহারের দাদামশাই এক সময়ে জজিয়তি করতেন। এখন নিরবচ্ছিন্ন অবসর। পড়াশুনা দিয়ে তার সবটা ভরাট হয় না। বাকী সময়টা চুপ করে

ইজি চেয়ারে পড়ে থাকেন। ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে কর্ম ও স্মৃতিময় পূর্ব জীবনের রোমন্থন, বার্ধক্যের যা প্রধান, হয় তো বা একমাত্র অবলম্বন। কিছুদিন আগেও বাইরে খানিকটা ঘুরে আসতেন, বসতেন গিয়ে বৃদ্ধদের আড্ডায়। এখন বড় একটা যান না। ভাল লাগে না। তাছাড়া বার্ধক্যের সহচর ব্যাধির দল দিন দিন নানা অঙ্গে আশ্রয় নিচ্ছে।

তাঁর সঙ্গে বৌরানীর দেখা করিয়ে দেবার প্রস্তাব দিদিমা বা নীহার কারো কাছ থেকে আসেনি। নীহার জানে, দিদিমাও শুনেছিলেন দু-একটি অন্তরঙ্গ ক্ষেত্র ছাড়া অনাত্মীয় পুরুষের সামনে বৌরানী বেরোননা। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি নিজেই নীহারকে বললেন, মেসোমশাই আছেন তো?

"আছেন!"

"চল, একবার দেখা করে আসি।"

প্রস্তাবটা এমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ যে নীহারের মনে হঠাৎ একটা চমক খেলে গেল। পরমুহূর্তে খুশির সুরে বলল, আসুন।

বেশীক্ষণ নয়, মিনিট কয়েক। দুতরফে সামান্য দুচারটি মামুলী কথাবার্তা। দাদামশাই প্রথমটা 'আপনি' বলেই শুরু করেছিলেন। বৌরানী আপত্তি করতে সঙ্গে সঙ্গে 'তুমিতে' নেমে এলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে বিশেষ করে বললেন, আমার এই নাতনীটিকে তুমি কী চোখে ছ্যাখ সবই শুনেছি। ওতো তো তোমার কথায় পঞ্চমুখ। প্রথম প্রথম একটু ভাবনা হয়েছিল বৈকি! তারপর একেবারে নিশ্চিন্ত। মনে করি তোমার কাছে আছে মানে নিজের বাড়িতেই আছে।

'নিজের বাড়ি' কথাটার মধ্যে একটা যেন শুভ-সূচনার ইঙ্গিত আছে। অনুভব করলেন বৌরানী। মুখে কিছু বললেন না, মনে মনে বললেন, ভগবান করুন, তাই যেন হয়।

একটু 'মিষ্টিমুখ' না করিয়ে দিদিমা কিছুতেই ছাড়লেন না। যখন উঠবার সময় হল বললেন, তুমি আসবে ভাবতেই পারিনি। কী যে খুশী হলাম। আবার এসো।

"আসবো বৈকি?" সঙ্গে সঙ্গে বললেন বৌরানী। শীগ্‌গিরই হয়তো আসতে হবে।"

দিদিমা ওঁর মুখের দিকে তাকালেন। নীহারও চোখ তুলল। শেষের

কথাটায় একটা কোনো প্রয়োজন বা উপলক্ষের ইঙ্গিত ছিল। পরের উক্তিতে সেটা স্পষ্ট হবে দুজনের মনেই হয়তো সেই অপেক্ষা ছিল। কিন্তু বৌরানী আর কিছু বললেন না। দিদিমাকে একবার পায়ের ধুলো দেবার অনুরোধ জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

ম্যানেজারকে যেমন কথা দিয়ে এসেছিল, সেইমত পরদিন বিকালের দিকে শম্ভুচরণ রূপাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছল। পাছে বাড়ির নম্বর খুঁজে বের করতে অসুবিধা হয়, একটু সকাল সকালই আসতে বলেছিল নীহার। শম্ভু বলেছিল, আপনি ঐ সময়ে ফিরতে পারবেন তো?

"না পারি, আপনি দিদিমার সঙ্গে গল্প করবেন।"

"তিনি তো আমাকে চেনেন না।"

"চেনেন বৈকি? আমিও খানিকটা আগে আগেই এসে পড়বো।"

দিদিমা নীচেই ছিলেন। কড়া নাড়তে নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। জানতে চাইলেন, "কোত্থেকে আসছেন?"

শম্ভু নিজের নাম বলতেই সঙ্গে সঙ্গে খুশীর সুরে বললেন, ও, তুমি শম্ভু? এসো বাবা।

খুকু, মানে তোমাদের ম্যানেজার এখনো ফেরেনি। এসে পড়বে শীগ্গিরই।

ঢুকেই ডানদিকে একখানা ফালতু ঘর। দুদিকে দেয়াল ঘেঁসে দুখানা ছোট তক্তপোষ পাতা। উপরে সতরঞ্চি বিছানো। সরাসরি দোতলার ড্রইং রুমে না নিয়ে গেলেও চলে এমন ধারা লোকজন এলে বসানো হয়। দিদিমা ওদের সেদিকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, তোমরা আসবে খুকু জানে?

"আজ্ঞে, তিনিই আমাদের আসতে বলেছেন।"

"বসো" বলে একদিকের তক্তপোষটা দেখিয়ে দিয়ে নিজে অন্যটায় বসলেন, "এ মেয়েটি কে?"

"ওর নাম রূপা।"

"কে হয় তোমার?"

শম্ভু রূপার মুখের দিকে তাকাতেই সে চকিতে চোখ নামিয়ে নিল। শম্ভু বলল, আমরা এক কলোনীতে থাকি…দিদিমাকে পেন্নাম করলিনে?

রূপা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দিদিমা সস্নেহে তার চিবুকটা তুলে ধরে বললেন, মুখখানা ভারী মিষ্টি তো।

শম্ভু হাসি মুখে বলল, ওর ওপর আমার হিংসে হচ্ছে।

"কেন বল দিকিনি ?"

"ওরা উঁচু জাত ! তাই দিব্যি আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারল। আমার সে উপায় নেই। আমি নমশূদ্র।"

"তাতে কী হয়েছে ? আমার অত ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার নেই।"

"আমি পায় হাত দিলে এই অবেলায় আপনাকে চান করতে হবে না তো ?"

"না, না। আমি কাউকে অস্পৃশ্য মনে করি না।"

শম্ভু প্রণাম সেরে নিজের জায়গায় ফিরে আসতে আসতে বলল, যখন দেশে ছিলাম, আমার এক খুড়িমা ছিলেন। আপনাদের মত ব্রাহ্মণ। একটি ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। সে আর আমি এক সঙ্গে পড়তাম। খুব ভাব ছিল দুজনের, প্রায়ই যেতাম ওদের বাড়ি। খুড়িমা বলতাম ওর মাকে। তিনি আমাকে ছেলের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। এক সঙ্গে খেতে দিতেন। মানে, সে বসত বারান্দায়, আমি উঠোনে। আমাদের আরো বন্ধু ছিল— বামুন কায়েতের ছেলে। তারা ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত। আমারও বড্ড ইচ্ছা হত একবারটি ওঁর পায়ের ধুলো নিতে। মনের কথাটা একদিন বলেও ছিলাম। তিনি হেসে ফেলে বললেন, "কেন আমাকে অবেলায় নাইতে ছোটাবি হতভাগা ? তোকে আমি এমনিই আশীর্বাদ করছি।' আমি জানি যাকে অস্পৃশ্য বলে আমাকে তিনি কখনো তা মনে করেন না, করতে পারেন না। কিন্তু তাঁর পা দুটো স্পর্শ করবার অধিকারও দেননি কোনোদিন।"

দিদিমা মন দিয়ে শুনলেন। পরে বললেন, ঠিকই বলেছ। 'অস্পৃশ্য' কথাটার মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব আছে। কিন্তু ওঁর বা ঐ রকম আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিধবা যাঁরা ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে খুব কড়া তাঁদের মনে ও সে সব কিছু নেই। ওটা একটা সংস্কার। আমি তাও মানি না। বিহারে যদ্দিন ছিলাম —সারা জীবনটা প্রায় সেখানেই কেটেছে আমাদের—তদ্দিন একটু আধটু যা ছিল, এখানে এসে সব ছেড়ে দিয়েছি। তারপর খুকু যখন এল—যাক সে সব কথা। তোমাদের কলোনীর খবর কী বল।

নাতনী সম্পর্কে একটা কী বলতে গিয়ে চেপে গেলেন, শম্ভু সেটা বুঝতে পারল। কিন্তু ও নিয়ে কিছু বলল না। দিদিমার প্রশ্নের জবাব দিল—কলোনীর খবর খুব একটা রাখি না।

দিদিমা বিস্ময়ের সুরে বললেন, সে কী! খুকুর কাছে তো শুনেছি, ওখানকার সবকিছুই তুমি। তোমার কথায় ওরা ওঠে বসে।

—না না সে সব কিছু নয়। ব্যাপারটা হল, আমিই ঐ লোকগুলোকে ওখানে এনে ফেলেছিলাম, এবং শুরু থেকেই ওদের ভালোমন্দর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম। দিন রাত একসঙ্গে কাজ করেছি। ভালোবাসত সবাই। বড় দুর্দিন গেছে তখন। আমার ওপরেই সব ভার ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর অভিজিৎ বাবু এলেন, তার কিছুদিন পরে ম্যানেজার এলেন। যখন বুঝলাম ওঁরা কলোনীর মানুষগুলোর কল্যাণ-চান, যতটা সাধ্য ওঁদের সাহায্য করবার চেষ্টা করেছি। ওঁরাও আমাকে স্নেহ করেন, অনেকখানি নির্ভর করেছেন আমার ওপর। সেটা কারো কারো পছন্দ হল না। তাতেও আটকাত না। নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিতে পারতাম। হঠাৎ বাইরে থেকে একদল 'বন্ধুর' আমদানি হল। তাঁরাই সব ভার নিয়েছেন। আমার আর দরকার নেই।

"তুমি ওখান থেকে চলে এসেছ নাকি?"—কিছুটা যেন উদ্বেগের সুরে জানতে চাইলেন দিদিমা। শম্ভু বলল, না, ঠিক চলে আসিনি। কিছুদিন ধরে আমাকে কোলকাতায় থাকতে হচ্ছে। মার অসুখ; হাসপাতালে আছেন। দুবেলা দেখাশুনা করতে হয়।

"ও-ও, কেমন আছেন তিনি?"

"প্রায় সেরে উঠেছেন। কদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে বলছে।"

"তারপর ওখানে ফিরে যাচ্ছ তো?....এই যে তোমাদের ম্যানেজার এসে গ্যাছেন। এত দেরি করলি যে?"

"বেরোতে যাবো, হঠাৎ এক ঝামেলায় আটকে গেলাম।"

"ঝামেলা তো তোমাদের লেগেই আছে"—বলতে বলতে উঠে পড়লেন দিদিমা। ঝামেলা শুনে শম্ভুও জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল। সেই দিকে চেয়েই ওপাশের খাটটায় বসতে বসতে বলল নীহার, পুলিশ এসেছিল কলোনীতে।

"পুলিশ !" চমকে উঠল শম্ভু।

"অবাক হবার কী আছে? পলিটিক্‌স্ এলেই পুলিশ আসবে, এ তো জানা কথা। এতদিন যে আসেনি, তাতেই বরং অবাক হতে পারেন।"

শম্ভু আর কিছু বলল না। তার মুখের উপর একটা দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। পলিটিকস্-এর সঙ্গে পুলিসের সংযোগ কতটা ঘনিষ্ঠ তা যে তার জানা নেই তা নয়। কিন্তু একটা জিনিস জানা আর সেটাকে সত্যি সত্যি ঘটতে দেখা—এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। পুলিস নামক পদার্থটিকে শম্ভু চেনে। সে দেখেছে ওটি অনেকটা লাঙলের ফালের মত। ঢুকবার মুখটা সরু, যত ভিতরে যায় ততই বিস্তৃত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সব কিছু ওলট পালট করে দেয়। সেই গোড়ার দিকে, কলোনীতে পলিটিক্‌স্ যখন আসেনি, তখনো জমিদারের লোকদের হাত ধরে ওদের শুভাগমন হয়ে গেছে কয়েকবার। ভাঙাচোরা ওলট পালটও কম হয়নি। কিন্তু সে আসাটা ছিল ক্ষণস্থায়ী।

অন্য পথ দিয়েও এসেছে পুলিস। বলা যেতে পারে ওখানকার কিছু বাসিন্দার গন্ধ শুঁখে শুঁখে, ওপারে থাকতেই যারা অন্ধকারে ঘোরাফেরা করত, এবং এপারে এসেও স্বভাবটা ছাড়তে পারেনি। শম্ভুকে সেখানে রীতিমত কঠোর ও কঠিন হতে হয়েছিল। তাছাড়া অন্য পথ ছিলনা। দেহের কোনো অংশে যখন পচ ধরে এবং মাছি আসতে শুরু করে তার গন্ধে, গোটা অঙ্গটাকেই তখন কেটে বাদ দিতে হয়। শম্ভুও তেমনি সেই বিষদুষ্ট সঙ্গী কজনকে নির্মম হাতে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মাছি আসাও বন্ধ।

আজ যে ওরা আসছে, সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে এবং আলাদা পথ ধরে। এ আসা হয়তো চলতেই থাকবে।

"কী অত ভাবছেন?" জিজ্ঞেস করল নীহার।

"না, তেমন কিছু নয়। আমি তাহলে এখন উঠি। ওকে পৌঁছে দেবার কথা ছিল। দিয়ে গেলাম।"

"পৌঁছে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে উঠতে হবে, তেমন কোনো কথা ছিল কি?"

শম্ভু হাসল—"আপনি ক্লান্ত হয়ে এলেন। এবার বিশ্রাম করবেন...."

"বিশ্রামের দরকার নেই। তবে চট করে চানটা সেরে নেবো। সেইজন্যে

আপনাকে একটু বসতে হবে।"....বলেই উঠে পড়ল নীহার এবং রূপার দিকে চেয়ে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

যাবার জন্যে পা বাড়াতেই শম্ভু বলে উঠল, আপনি কি কলোনী হয়ে এলেন?

নীহার ফিরে দাঁড়াল। বুঝল ব্যাপারটাকে মন থেকে সারাতে পারছেনা শম্ভু। বলল, না। কেন বলুন তো?"

"পুলিস এসে কী করল জানতে চাইছিলাম।"

"যা করে থাকে, ধর-পাকড়। এখন তো ওখানে দুটো পলিটিক্যাল পার্টি কাজ করছে। তাদের সম্পর্ক ত জানেন—" দুহাতের তর্জনী বেঁকিয়ে একটার পর একটা রাখল নীহার। তারপর বলল, দু-দল থেকেই ধরেছে শুনলাম।"

শম্ভুর মুখখানা ম্লান দেখাল। ধীরে ধীরে অনেকটা যেন আপন মনে বলল, আজ দেরি হয়ে গ্যাছে। কাল একবার গিয়ে খবর নিয়ে আসবো।

"না! এখন বেশ কিছুদিন আপনাকে ওদিকে যেতে হবে না।"

বলেই বেরিয়ে গেল নীহার। শম্ভু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার চলে যাবার পথের পানে। কলোনীর ব্যাপার নিয়ে তার অনেক দিন অনেক কথা হয়েছে ম্যানেজারের সঙ্গে। ভদ্রমহিলা বরাবরই মৃদু, মোলায়েম। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নির্দেশ যেখানে দিয়েছেন, তার মধ্যেও যেন অনুরোধের সুর। এরকম স্পষ্ট দৃঢ় নিষেধের সুর কোনোদিন শোনা যায়নি ওঁর কণ্ঠে। ঐ সুরের মধ্যে কোথায় যেন একটা মাধুর্যের স্পর্শ ছিল। সেটাই বিশেষ ভাবে অনুভব করল শম্ভু। তার মনটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

নীহারের হাতে একটা প্যাকেট ছিল। উপরে গিয়ে খুলতেই তার ভিতর থেকে বেরোল একখানা ছাপা শাড়ি আর তার সঙ্গে রঙ মেলানো ব্লাউজ। রূপার সামনে মেলে ধরে বলল, কেমন হয়েছে বল দিকিন?

"খুব ভালো" উচ্ছল কণ্ঠে বলল রূপা। পাট করে তার হাতে তুলে দিতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেনা এমনভাবে বলে উঠল, "আমার!"

"হ্যাঁ। তোমার জন্যেই তো নিয়ে এলাম। যাও, ওঘর থেকে পরে এসো।"

রূপা তখনই ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। নীহার হাসিমুখে বলল, "দাঁড়াও।"

বাথরুমে নিয়ে গিয়ে সাবান তোয়ালে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, চুলটা খুলে ফেলো, বেশ করে গা ধুয়ে নাও। তারপর নতুন জামা কাপড় পরে এঘরে এসো।

নীহার চলে যেতেই দরজাটা বন্ধ করে বড় বড় চোখে চারদিকটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রূপা। এরকম ঘর ;—এমন সুন্দর করে সাজানো গোছানো,—স্নান করবার, সাজবার এত রকমের উপকরণ সে তার এই ষোল সতের বছরের জীবনে কোনোদিন দেখেনি। কোনোদিন জানত না। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। জিনিসগুলোয় হাত দিতে গিয়ে দুরু দুরু করছিল বুকের ভিতরটা। অতবড় আরশীটার দিকে চোখ পড়তে প্রথমটা হঠাৎ চমকে উঠল, সচকিতে একবার দেখে নিল চারদিকটা। না, আর কেউ নয়, সে নিজেই নিজেকে দেখছে।

তারপর অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আলোকোজ্জ্বল আয়নার মধ্যে। এমন করে নিজেকে তো কোনোদিন দেখেনি, দেখবার সুযোগও আসেনি তার জীবনে। আজই প্রথম যেন নতুন করে চিনল নিজেকে, নতুন করে বুঝল, ঐ যে মেয়েটা তার দিকে চাইতে গিয়ে ভালো করে চাইতে পারছেনা সে তার নিজেরই প্রতিরূপ। তার সঙ্গে যেন একটা নতুন অন্তরঙ্গতা অনুভব করল। তার ভিতর দিয়ে নতুন করে ভাল লাগল নিজেকে। সংগোপনে মনে হল, সবাই যে বলে মেয়েটা দেখতে বেশ, কথাটা বোধহয় মিথ্যা নয়।

মুশকিল হল জামা খুলতে গিয়ে। ঐ মেয়েটা যে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে! হলই বা ও নিজে। তাও তো কখনো হয়নি তার জীবনে। নিজের অনাবৃত রূপ এমন নির্ভয়ে অসঙ্কোচে দেখবার অবসর পেল কোথায়? কলোনীতে সব চেয়ে বড় সমস্যা ছিল স্নান। যখন ছোট ছিল মোটা ফ্রকের উপর, বড় হবার পর শাড়ির উপর আষ্টে পৃষ্ঠে গামছা জড়িয়ে জড়সড় হয়ে গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে ছুটতে ছুটতে ফেরা। চারদিকে চোখ। সেদিকে না তাকিয়েও বুঝত সেগুলো জামা কাপড় গামছার আবরণ ফুঁড়ে বিঁধে যাচ্ছে তার দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে। শুধু কি পুরুষ? নানা বয়সী মেয়েরাও কটমট করে তাকায়। যারা স্নেহ করেন, তাদের মুখেও ঐ এক কথা—বড় বাড়ন্ত গড়ন মেয়েটার।

ঘরে এসে কাপড় ছাড়াও নিরাপদ নয়। এধার ওধার থেকে তীর

ছুঁড়ছে জোড়া জোড়া চোখ। ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাদের অবাধ গতি। গভীর রাতেও জামা খুলবার উপায় নেই। ঘুমের মধ্যে মা বকে যাচ্ছে— "কাপড় ঠিক করে শো।" কে কোথায় ওত পেতে আছে কে জানে? জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলোই যথেষ্ট। কৃষ্ণ পক্ষে হালে আমদানী টর্চ।

আরশীর সামনে জামা খুলতে গিয়ে যখন হাত সরছিলনা, নিজের বোকামিতে নিজেরই হাসি পেল রূপার। এখানে তো কারো চোখ নেই। এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে সে একেবারে নির্ভয়, নিরাপদ। তবু খানিকটা সময় লাগল সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে। তারপর যখন খুলল, সহসা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল লজ্জার রঙিন আভা। ধীরে ধীরে সেটা মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল মুগ্ধ বিস্ময়। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নিজের দেহের পানে।

রূপা যখন বাথ্‌রুমে, নীহার গেল দিদিমার খোঁজে। তিনি তখন রান্না ঘরে। নাতনী ও তার অতিথিদের জলখাবারের আয়োজনে ব্যস্ত। ওকে দেখে বললেন, হয়ে গ্যাছে; আর পাঁচ মিনিট ওদের বসতে বলে এসেছিস তো?

"শম্ভুবাবু বসে আছেন। রূপাকে উপরে নিয়ে এসেছি।"

দিদিমা নীহারের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, মেয়েটি কে রে?

"তোমাকে সব বলবো। কিছুদিন বোধ হয় ওকে এখানে রাখতে হবে।" তারপর দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়।

"বেশ তো। কেউ নেই বুঝি ওর?"

"মা ছাড়া আর কেউ নেই? সে-ও পরের বাড়ি কাজ করে পেট চালায়।"

"আহা, তাই অমন মুখ শুকনো করে বসেছিল।....তুই চট করে মুখ হাত ধুয়ে নে। আর দেরি করিসনে।"

নীহার চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে রূপাকে সঙ্গে করে যখন ফিরে এল দিদিমার কাছে, তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন,—"বাঃ, একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমার মত দেখতে।" রূপা এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিতেই বললেন, হয়েছে হয়েছে, কতবার পেন্নাম করবে।

নীহার বলল, ওদের দেশের নিয়ম নতুন কাপড় পরলে গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়। আমাকেও না করে ছাড়েনি।

শম্ভুকে দিদিমা নিজে সামনে বসে খাইয়ে গিয়েছিলেন। সে নীহারের কাছে বিদায় নেবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। একটু পরেই সে এল। পিছনে রূপা। পরণে নতুন কাপড় জামা, লম্বা বিনানী ঝুলছে পিঠের উপর, হালকা প্রসাধনের চিহ্ন। শম্ভুর চোখ দুটো মুগ্ধ হয়ে গেল। পরক্ষণেই সে সামলে নিল নিজেকে। হালকা সুরে বলল, এ করেছেন কী! রাস্তা ঘাটে হলে তো চিনতেই পারতাম না এ আমাদের সেই রূপা।

রূপাকে কেউ বলে দেয়নি। নিজেই সলজ্জ মুখে এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে শম্ভুর পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই চেঁচিয়ে উঠল আরে, আরে, ও কী করছিস্।

"বাঃ তাতে কী হয়েছে!" মৃদুস্বরে প্রতিবাদ জানাল রূপা, নতুন কাপড় দিলেন মাসিমণি।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু কুলীন কায়েতের মেয়ে! শেষকালে আমাকে পাপে ডুবিয়ে মারবি?"

"নীহার বলল, ঐ সব জাত-টাতের ব্যাপার আছে নাকি কলোনীতে?"

"আসলে নেই। ওখানে আমরা সব একজাত—রিফিউজী। তবে ওর মা হয় তো—"

নীহারের মনে পড়ল, মাসকয়েক আগে ওর মা একবার বলেছিল তার নিজের ভাষায়, 'আমার এই মেয়েটাকে দু'টো খেতে পরতে দিতে পারে এমন একটা ছেলে-টেলে দেখে দাওনা দিদিমণি। যে কোন জাতের হলেই চলবে।' শম্ভুর কথাটা শেষ হবার আগেই বলল, ওর মাও যদ্দুর জানি জাত নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে কথা থাক, রূপা এখন আমার কাছেই রইল। আপনি মাঝে মাঝে খবর নেবেন।

"ওর খবর আর কী নেবো? আপনার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। ব্যস্, আমার কাজ ফুরিয়ে গেল। তবে আমি আসবো। এমনিই; আপনার সাথে দেখা করতে।

॥ ১৫ ॥

দুর্গামোহন ফিরে এসেছেন। অনেকদিন ছিলেন না। বালীগঞ্জে পৌঁছে একখানা পোষ্টকার্ড লিখেছিলেন অভিজিৎকে। সেও উত্তর দিয়েছিল। তারপর আর চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়নি। মাঝখানে ওঁর অভাবটা যখন বিশেষভাবে অনুভব করছিল, অভিজিৎ মনে করেছিল মাষ্টারমশাইকে একটা চিঠি লিখবে। বিশেষ করে ওঁর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আর লেখেনি। এখানকার সমস্যাগুলো জানাতে যাওয়া মানে তাঁকে উত্যক্ত করা বইতো নয়। ফিরে আসার খবর পাবার পরদিনই দেখা করতে গেল। দুর্গামোহন বাইরের বাগানে পায়চারি করছিলেন। অভিকে দেখতে পেয়ে সাদরে ডেকে নিয়ে বসালেন। এদিকের খোঁজ খবর নেবার আগে অভিই জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন, স্যর?

"কেমন দেখছ?" সহাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করলেন দুর্গামোহন।

"অনেক ভালো। বেশ সেরে উঠেছেন এই ক'মাসে।"

"সেরে না উঠে উপায় আছে? যাওয়া মাত্র ডবল 'গার্জেনে'র পাল্লায় পড়ে গেলাম। একটি তো সঙ্গেই ছিল, আরেকটিও একেবারে তৈরি হয়ে ছিলেন। আমার বৌমা। পালা করে খবরদারি। নিয়মের একচুল এধার-ওধার হবার যো নেই।"

"তবু যদি আমাদের একটা কথাও শুনতে" বলতে বলতে বেরিয়ে এল গৌরী। তার চেহারাতেও স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য সহজেই চোখে পড়ে। ফর্সা রঙটা বড় ফ্যাকাসে মনে হত, এখানে যখন ছিল। এবার তার উপরে একটি স্নিগ্ধতার স্পর্শ লেগেছে। অন্য একটা পরিবর্তনও লক্ষ্য করল অভিজিৎ। তার সামনে যখনই বেরিয়েছে গৌরী, ঠিক যেন স্বচ্ছন্দ হতে পারেনি। আড়ষ্টতা না হলেও কেমন একটা বাধোবাধো ভাব। আজ সে অনেক সহজ ও সপ্রতিভ। বেরিয়ে আসা এবং কথাবার্তার মধ্যে অনাবশ্যক কুণ্ঠার জড়তা নেই। গ্রাম ছেড়ে বাইরে বেরোনর ফল, মনে মনে

বলল অভিজিৎ। কিংবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে, যা সে জানে না।

গৌরী এগিয়ে এসে প্রথমে অভিকে এবং তারপর বাবাকে প্রণাম করল, ওদের সব খোঁজ খবর নিল এবং জানাল যে এদিকটা একটু গুছিয়ে নিয়েই বৌরানীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

গৌরী চলে গেলে দুর্গাচরণ অভির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, তুমি কিন্তু অনেকটা রোগা হয়ে গ্যাছ অভি। অসুখ বিসুখ করেছিল নাকি?

"নাতো। বেশ ভালোই ছিলাম। তবে ভাবনা হচ্ছে এইবারে একটা অসুখ টসুখ না করে বসে।"

"কেন?" উদ্বেগের সুর দুর্গামোহনের।

"বৌরানীও বলছেন আমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছি। সেই অপরাধে খাবারের বহর যা বাড়িয়েছেন বড় বড় পালোয়ান ছাড়া আর কারো পক্ষে সেটা সামলানো সম্ভব নয়।"

দুর্গামোহন হেসে উঠলেন—"তা বললে চলবে কেন? তাঁর রাজত্বে বাস করে তুমি রোগা হতে থাকবে অর্থাৎ তাঁর ব্যবস্থা বান-চাল করে দেবে, তার একটা শাস্তি আছে তো। তবে তিনি যা দিচ্ছেন নির্ভাবনায় খেয়ে যাও। তোমার দরকার অ-দরকার তিনি তোমার চেয়ে ভালো জানেন। তারপর তোমার কলোনীর খবর কী বল।

দুর্গামোহন অনেকদিন ছিলেন না। সুতরাং সকলের আগে এই সম্বন্ধেই তাঁর আগ্রহ দেখা দেবে, অভিজিৎ জানত। এই ক-মাসে যা কিছু ঘটেছে, সব দিক দিয়ে অবস্থাটা যেখানে এসে ঠেকেছে, তার সঙ্গে তার নিজের চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি বিবরণ মাষ্টারমশাই-এর কাছে খুলে বলবার আগ্রহ তার তরফের কম নয়। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাই মিনিট দুয়েক চুপ করে থেকে বলল, সেটা তো দু-এক কথায় বলা যাবে না স্যর। আপনি সবে এলেন। দু-চার দিন যাক, তারপর সবই জানাবো।

দুর্গামোহন লক্ষ করলেন, তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের মুখে যে মৃদু হাসিটি ফুটে উঠল সেটা বড় নিষ্প্রভ, যেন জোর করে টেনে আনা, কণ্ঠ-স্বরেও উৎসাহের কোনো লক্ষণ নেই। মনে পড়ল যাবার আগে এই চোখ মুখেই তিনি কত না উদ্যম ও উদ্দীপনা দেখে গেছেন! স্বভাবতই এই পরিবর্তনের কারণটা

জানবার ইচ্ছা হল। বললেন, "তোমার কি এখন কোনো কাজ আছে?"

"কিছু না। কেন বলুন তো?"

"তাহলে একটা মোটামুটি আইডিয়া বরং দিতে পার—কদ্দুর কী হল। ডিটেল্‌স্ না হয় পরে শোনা যাবে।"

অভিজিৎ বলল, বর্তমানে ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে, খবরের কাগজের ভাষায় তাকে বলা যেতে পারে 'অচলাবস্থা'।

"কী রকম?"

এরপরে অভিজিৎকে একটু বিস্তৃতির দিকেই যেতে হল। তার 'কটেজ স্কিম্'-এর উল্লেখ করতে গিয়ে তার পিছনে যে মনোভাব তারও কিছুটা আভাস দিল। দুর্গামোহনের সেটা আজানা ছিল না। তাদের বাড়ির সামনে ঐ কুৎসিত বস্তিটা, এবং তার ভিতরে একপাল মানুষ যে-ভাবে বাস করছে (বাস করা না বলে বরং বলা যেতে পারে পড়ে আছে) এখানে এসে অবধি সেটাই তার চোখ দুটোকে অহরহ পীড়া দিচ্ছিল। হতে পারে এটা তার একটা দুর্বলতা। খাওয়া পরার চেয়ে থাকাটাকেই সে বড় করে দেখছে। অনেকে হয়তো এই মানসিকতাকে উপহাস করবে। তা করুক। তবু ওটাই তার কাছে মানুষ নামক জীবের উপর সব চেয়ে চরম অবমাননা বলে মনে হয়েছে। সকলের আগে তার থেকেই সে বাঁচাতে চাইছিল লোক গুলোকে। বস্তির ঐ জমিটার স্বত্বটুকু ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া তার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু অভিজিৎ বুঝেছিল তাতে করে ওদের ঐ জীবনযাত্রাকে মেনে নেওয়া হবে। ঐ ভাবেই ওরা থাকবে তার চোখের উপর। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ও পরিবেশ ওদের এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে যে, ঐ বসবাসের গ্লানি কদর্যতা ও অসম্মান আর লাগে না। প্রথম যখন এসেছিল, তখন লাগত। তারপর ঐ ভাবে থেকে থেকে অনুভূতির ধারগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে। ধাপে ধাপে অনেক নীচে নেমে গেছে ওরা। আরো যাবে।

অভিজিৎ চেয়েছিল সকলের আগে ঐ জান্তবদশা থেকে টেনে তুলে মানুষগুলোকে খানিকটা ভদ্র, পরিচ্ছন্ন এবং সম্ভ্রান্ত স্তরে নিয়ে যাওয়া। একটা ছোট্ট চালার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী তাদের বয়স্থ ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ ইত্যাদি

একরাশ নরনারীর ঠাসাঠাসি হয়ে হয়ে থাকার যে পশুসুলভ জীবন, তার বদলে তারা পেত ছোট ছোট 'বাড়ি', যেখানে হাত পা ছড়িয়ে থাকতে না পারলেও লজ্জাসরম-শ্লীলতা-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলার মত আব্রুর অভাব হত না।

কী করে তার এই প্ল্যান শুরুতেই বানচাল হয়ে গেল, কারা এসে কী মন্ত্র দিয়ে এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে ওদের ক্ষেপিয়ে তুলল এবং তারপর থেকে সারা কলোনীতে যে ক্ষোভ, বিদ্বেষ ও বিরোধ ধূমায়িত হয়ে চলেছে এবং মাঝে মাঝে তার থেকে আগুন জ্বলে উঠছে—তার একটা মোটামুটি ছবি মাষ্টার মশাই-এর সামনে তুলে ধরল অভিজিৎ। তারপর বলল, কী যে ওরা চায়, তাই আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না।

দুর্গাচরণ বললেন, কী চায়, ওরা নিজেরা জানলে তো তোমাকে বোঝাবে ? সেই দেশ ছাড়ার পর কিংবা বলতে পার তার আগে থেকেই যে অবস্থার মধ্য দিয়ে ওরা চলেছে তারই ফল হল এই বিভ্রান্তি। নিজেদের ভালো মন্দ বুঝবার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে। তাই-ই হয়। আমরা শুধু ওদের দুঃখ কষ্টটাই দেখি। বাইরে থেকে সেটাই চোখে পড়ে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার চেয়ে অনেক বেশী যেটা ওরা এতদিন ধরে সয়ে এসেছে সেটা হল নানাজনের কাছ থেকে নানারকম অন্যায়, অবিচার, প্রতারণা এবং সহানুভূতির মুখোস পরা নিষ্ঠুরতা। ওরা এত বেশী ঠকেছে যে, মানুষের সদিচ্ছার উপরে আর বিশ্বাস নেই। সব কিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখে। এই অবস্থায় কাউকে বাইরে থেকে ভালো করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তাছাড়া তুমি যা কিছু করতে যাও ওদের ঐ নতুন শুভাকাঙ্ক্ষীর দল সব ভেস্তে দেবে।

অভিজিতের অভিজ্ঞতাও তাই। বলল, কিন্তু এতে করে কী লাভ হচ্ছে তাদের ? হয়তো হচ্ছে। আমরা জানিনা। না যদি হয় তাহলেও করবে। ওটা ওদের ধর্ম। সে-সব তুমি বুঝবে না। তুমি তো ঐ দল গুলোকে চেননা। আমি চিনি। আমি যা নিয়ে ছিলাম, তোমরা যাকে বল শিক্ষাব্রত সেখানেও দেখেছি ঐ লড়াই। সেটা ঠেকাতেই তোমার দম ফুরিয়ে যাবে, ভালো কিছু করবার উপায় নেই। কিন্তু আমি তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি। রণে-ভঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। তোমার তো আর সে কথা বলা চলে না।"

"আমারও দেখছি ঐ বেরিয়ে আসা ছাড়া অন্য পথ নেই স্যর। থেকে আর কী করবো ?"

এমন একটা হতাশার সুর ছিল এই কথাকটির মধ্যে যে দুর্গামোহন সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারলেন না। অভিজিৎও কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলল, তাই ভাবছিলাম এবার চলে যাই। অনেকদিন তো হল। কিন্তু এ দিকে বৌরানীকে নিয়ে এক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

"কী সমস্যা ?" উৎকণ্ঠিত হলেন দুর্গামোহন।

অভিজিৎ বলল, কিংবা বলতে পারেন, আমাকে নিয়েই তিনি সমস্যায় পড়েছেন এবং যে সমাধান করতে চাইছেন, তার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা ছাড়া আর কোনো পথ দেখছি না।

দুর্গামোহনের উৎকণ্ঠা দূর হল। মৃদু হেসে বললেন, ব্যাপারটা কী বলতো ?

—"আপনি হাসছেন। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই সিরিয়াস। এতদিন শুনে এসেছি, (ইদানিং একটু বেশী জোর দিয়ে বলছেন কথাগুলো) এই যে বিশাল বাড়িটা, যার আমি একমাত্র এবং একচ্ছত্র মালিক, সেটা শুধু আমার 'বাড়ি' নয়, সম্পত্তি নয়, আমার পিতৃ-পিতামহের গচ্ছিত সম্পদ, আমার মহৎ উত্তরাধিকার। এর সম্বন্ধে আমার একটা পবিত্র দায়িত্ব আছে। তাঁর নিজের ভাষায় বলি—'একে তুমি রক্ষা করবে, ভোগ করবে। তা না হলে পূর্ব-পুরুষের ওপর তোমার যে কর্তব্য, সেটা লঙ্ঘন করা হবে।'

দুর্গামোহন বললেন, ঠিকই বলেছেন। এর ভেতরে আপত্তি করবার তো কিছু নেই।

"আপত্তি আমি করছি না স্যর, যদিও এর মধ্যে 'মহৎ' বা 'পবিত্র' কী আছে আমি জানি না। তবু বৌরানীর এই মনোভাবকে আমি শ্রদ্ধা করি। এবং সেইজন্যই এই বাড়ি বা সম্পত্তি সম্পর্কে এমন কিছু করিনি বা করতে চাই না, যাতে তাঁর মনের সায় নেই। এবারে তিনি আরেক ধাপ এগিয়ে গেছেন। শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎও তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমার অবর্তমানে কী হবে এই বাঁড়ুয্যে বাড়ির ? কে ভোগ করবে আমার পূর্ব-পুরুষের এই সেক্রেড্ ট্রাস্ট্ ? কার হাতের এক গণ্ডুষ জল তাঁদের স্বর্গত আত্মাকে তৃপ্তি দেবে ? সে ব্যবস্থাও আমাকে করে যেতে হবে। শুধু

বাড়ি এব সম্পত্তি নয়, আমাদের এই প্রাচীন বংশকে রক্ষা করবার দায়ও আমার।"

কথাগুলো অনেকটা হালকা সুরে বলছিল অভিজিৎ। কিন্তু দুর্গামোহনের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। তাঁর কথাতেও সেই ভাব প্রকাশ পেল। ধীরে ধীরে বললেন, এ বিষয়ে বৌরানীর যে উৎকণ্ঠা সেটা খুবই স্বাভাবিক। তুমিও একে লঘু করে দেখতে পার না।

অভিজিৎ বলল, "আমি লঘু করে দেখছি না। কিন্তু—"

"জানি, তুমি কী বলবে", বাধা দিয়ে বললেন দুর্গামোহন, "এ ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। সেই যখন ছোট ছিলে, তখন থেকে তোমাকে অন্য চোখে দেখি, তারপর অভিভাবক হিসেবে যে স্বীকৃতি ও সম্মান তোমার কাছ থেকে পেয়েছি, তার থেকে কথাটা আপনা হতেই মনে এসেছিল। তুমি যখন এলে তার কিছু দিন পরে এ বিষয়ে একটা ইঙ্গিতও দিয়েছিলাম। তুমি স্পষ্টভাবে বলেছিলে বিয়ে থা করবার ইচ্ছা তোমার নেই। অর্থাৎ তোমার মতে তারপরে আর কোনো কথা নেই। ওটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে এবং সাধারণ অবস্থায় নিশ্চয়ই তাই! কিন্তু তুমিও জান, আমিও জানি, সংসারে এমন ক্ষেত্র আছে বা এমন অবস্থা দেখা দেয় যেখানে ঐ 'ব্যক্তি'কে গুটিয়ে আনতে হয়, ইচ্ছা অনিচ্ছার পাল্লাকে খাটো করতে হয়। তা না হলে অনেক জায়গায় টান পড়ে।"

বলতে বলতে অভিজিতের মুখের দিকে চোখ তুললেন। সে সেটা লক্ষ করে বলল, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি, স্যর। কিন্তু এটা শুধু আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়। তার চেয়ে অনেক বড় আরো কিছু আছে এর পেছনে। সেটা সেদিন আপনাকে বলিনি। মনে করেছিলাম বলবার দরকার হবে না। কিন্তু বৌরানী যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন হয় তো বলতে হবে। তাঁকেও, আপনাকেও। তিনি বুঝবেন কি না জানি না, আপনি বুঝবেন।"

"বাবা"—ভিতর থেকে গৌরীর ডাক শোনা গেল। দুর্গামোহন সাড়া দিলেন, কী মা? ভেজানো দরজা খুলে বেরিয়ে এল গৌরী। বলল, তোমরা

কথা বলছিলে বলে এতক্ষণ ডাকিনি। কিন্তু আর দেরি করলে তোমার পিত্তি পড়বে। তোমাদের চা-টা দিয়ে দিই। প্রদীপদা কখন ফিরবেন তার তো কিছু ঠিক নেই।

দুর্গামোহন কোনো উত্তর দেবার আগেই অভিজিৎ ব্যস্তভাবে বলে উঠল, আপনার এখনো চা খাওয়া হয়নি ?

"না ; ইচ্ছা করেই দেরি করছিলাম। প্রদীপ এলে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। সেই সঙ্গে তিন জনে বসে গল্প করতে করতে চা খাওয়া যেত।"

"আমি ও পাট মিটিয়ে এসেছি। এখন আর কিছু চলবে না।"

"এটুকু চলবে", সঙ্গে সঙ্গে বলল গৌরী, তেমন কিছুই তো করিনি।"

দুর্গামোহন মেয়ের কথায় সায় দিলেন, তাই তাহলে দে। আমরা খেয়ে নিই। ওর হয় তো দেরি হবে। কদ্দূরে গিয়ে পড়েছে কে জানে ?

গৌরী ভিতরে চলে গেল। দুর্গামোহন অভির দিকে ফিরে বললেন, আমার মেজো ছেলে ভুবনের বন্ধু। বাড়ি ধানবাদে। তিন পুরুষ ধরে বিহারের বাসিন্দা। বাপ মস্ত বড় কোলীয়ারীর মালিক। একটা নয়, বোধ-হয় গোটা তিনেক। ঐ মাইন-সংক্রান্ত কি সব শেখবার জন্যে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে। ওর ও-সব ভালো লাগল না। শিখে এল সুগার টেকনলজি। কয়লার বদলে চিনি। আমি তো ওসব কিছু বুঝি না। ভুবনের কাছে শুনলাম চিনি-সম্পর্কে যত রকম বিদ্যা আছে, সবটাতে বিশারদ। যাভা আর কোন্ কোন্ জায়গা থেকে মোটা মাইনের চাকরির অফার এসেছিল। কোনোটাই নেয় নি। চাকরী করবার ইচ্ছা নেই। সুগার মিল খুলবে। তাই নিয়ে মেতে আছে। আর একটা ইণ্টারেষ্ট আছে, এবং তা নিয়ে বেশ কিছু পড়াশুনোও করেছে দেখলাম। সেটা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ফিলজফি।

অভি হেসে উঠল—তাই নাকি ? "অদ্ভুত কম্বিনেশন বলতে হবে। সুগার টেকনলজির সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ফিলজফি !"

"মানুষটাও অদ্ভুত, কথাবার্তায় চালচলনে। বিলেত থেকে ফিরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। জমে গেল বন্ধুর বাবার সঙ্গে। প্রায়ই আসত এবং তার কোনো সময় অসময় ছিল না। ধানবাদ থেকে রাণীগঞ্জ নিজেই

গাড়ি চালিয়ে এসে উপস্থিত। এসেই আমাকে নিয়ে পড়ত। দর্শন নিয়ে না হয় এক-আধটু নাড়াচাড়া করে থাকি। কিন্তু চিনির আমি কী জানি বল। সম্পর্কই বা কী? চায়ের সঙ্গে ছ'বেলা ছ' চামচ। তাও ডাক্তার বন্ধ করে দিয়েছেন। তাহলেও তার জন্মের আগের ইতিহাস থেকে বর্তমান বাজার সব শুনতে হবে এবং মতামত দিতে হবে।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম, আমাদের অঞ্চলে কিছু কিছু আখের চাষ হয়, বোধহয় আরো হতে পারে। অনেক জমি পড়ে আছে। এক আউষ ছাড়া আর কোনো ফসল হয় না। তাও বৃষ্টির ওপর নির্ভর। তাই শুনেই এসেছে। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ে। এ কদিন চা খেয়ে বেরোত। তা না হলে গৌরী বকাবকি করে। আজ দেখছি—এই যে এসে পড়েছে।"

পর মুহূর্তেই ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল বছর তিরিশেক বয়সের একটি যুবক। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রং আগে হয় তো ফর্সাই ছিল, বর্তমানে তামাটে। সম্ভবতঃ কড়া রোদের প্রভাব। পরণে সার্ট ট্রাউজার ঘামে ভিজে জবজব করছে। চোখে মুখে—শুধু চোখে মুখে নয়, বলতে গেলে সর্বাঙ্গে—ব্যস্ততার চাঞ্চল্য।

ছুর্গামোহন বললেন, তোমার কথাই হচ্ছিল। এসো পরিচয় করিয়ে দিই।

নামটা শুনেই প্রদীপ বলে উঠল, ও, ওঁকে তো আমি চিনি। নমস্কার! আপনার সঙ্গে আজকালের মধ্যেই দেখা করবো ভাবছিলাম।

অভিজিৎ প্রতি নমস্কার করে বলল, বেশ তো আসুন না।

—হ্যাঁ, যাবো। একটা প্রপোজল্ আছে আপনার কাছে। মানে, আপনার ঐ প্যালেশটা—

গৌরী চা ইত্যাদি নিয়ে আসতেই ছুর্গামোহন বলে উঠলেন, ওসব পরে হবে, আগে খেয়ে নাও।

—সেই ভালো। খিদেও পেয়েছে।

গৌরী প্রদীপের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, জামাকাপড়গুলো ছেড়ে নেবেন না?

—কেন? নিজের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

—সব যে ভিজে জবজব করছে।

—তা হোক, এখ্‌খনি শুকিয়ে যাবে।....আপনি ঠিকই বলেছিলেন কাকাবাবু, যা দেখলাম, খুব ভালো আখ হবে এখানকার মাটিতে। দরকার শুধু জল আর কিছু ফারটিলাইজার। সেটা এমন কিছু শক্ত নয়। ওদিকের দু-একটা গাঁয়ে ঢুকে কিছু কিছু চাষীদের সঙ্গেও কথা বলেছি।

কো-অপারেটিভ ফার্মিং-এ ওদের রাজী করানো যাবে বলেই মনে হয়। ক্যাশ ক্রপের মূল্য ওরা বেশ বোঝে। লোকগুলো লেখাপড়া হয়তো জানে না। কিন্তু বেশ ইনটেলিজেণ্ট্। বুঝিয়ে দিলে ধরতে পারে।

কথা বলতে বলতে খাওয়াও চলছিল। চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে এবার অভিজিতের দিকে ফিরল, "লেবার তো আপনার বাড়ির সামনেই রয়েছে। দূরে যেতে হবে না। এ একটা মস্ত সুবিধা। এই আখের চাষ আর সুগার মিলের ব্যাপার নিয়ে আমি তো অনেক জায়গা ঘুরেছি। ল্যাণ্ড্ পাওয়া যায়, কিন্তু ধারে কাছে এমন একটা লেবার মারকেট কোথাও পাই নি। তার মানে এ নয় যে আমাদের দেশে লোকের অভাব। লোক প্রচুর আছে, দরকারের চেয়ে বরং বেশীই আছে। কিন্তু সে সব হচ্ছে জনতা।"

'জনতা' শব্দটির উচ্চারণের মধ্যে একটু বোধ হয় ব্যঙ্গের সুর ছিল। অবশিষ্ট চাটুকু এক চুমুকে শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আমরা চাই জন, জনতা নয়। একরাশ ম্যান্ জড়ো হলেই তাকে ম্যান পাওয়ার বলা চলে না। আপনার এই লোকগুলোর ভেতরে একটা ডিসিপ্লিন আছে। কাজ করবার ইচ্ছা আছে। ট্রেনিং দিলে ওখান থেকে একটি চমৎকার লেবার ফোর্স তৈরি করা যাবে। সেটা চাষের কাজেও লাগবে, ফ্যাকটরীর কাজেও লাগবে। হ্যাঁ, ঐ ফ্যাকটরীর স্কিমটা নিয়েই আপনার সঙ্গে বসা দরকার। দেখা না হলেও আপনার সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর আমি এরই মধ্যে সংগ্রহ করেছি।

অভিজিৎ হেসে বলল, কোত্থেকে বলুন তো? সেগুলো নিশ্চয়ই ভালো খবর নয়।

—ভালো-মন্দ জানিনা। তবে আমার কাজের পক্ষে ফেবারেবল। আপনার ঐ জবরদখলওয়ালাদের কাছ থেকেই পেয়েছি।

দুর্গামোহন বললেন ও তাহলে ও দিকটাও ঘুরে এসেছ ?

—ওদিকটা মানে কলোনীর ভেতর যাইনি। ওঁর রাজত্বে ঢুকবার আগে একটা পারমিশন তো চাই।

অভিজিৎ বলল, আপনি বোধহয় জানেন না, ওটা আর এখন আমার রাজত্ব নয়। ওখানে যারা রাজত্ব করছেন, তারা আপনার মত পার্মিশনের অপেক্ষা না করে ঢুকেছেন এবং বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন।

"জানি", সঙ্গে সঙ্গে বলল প্রদীপ, "সে খবরও আমি পেয়েছি। তবে ওদের নিয়ে আমি একেবারেই মাথা ঘামাইনা। ঘা থাকলেই মাছি আসে। যতক্ষণ না শুকোয় ভনভন করতে থাকে। শুকিয়ে গেলে আপনিই চলে যায়। কাজেই আসল দরকার হল টু হীল আপ দা উন্ড্, ঘা যাতে তাড়াতাড়ি সারে সেই ব্যবস্থা করা। আমি যেটুকু খবর পেয়েছি—আপনা থেকেই যা কানে এসেছে ওদের সঙ্গে দু চারটা কথাবার্তা বলে—তাতে বুঝেছি সেদিকে আপনার ইচ্ছা এবং চেষ্টা কোনোটারই অভাব নেই। তখনই ভেবেছিলাম কাকাবাবুর কাছ থেকে আপনার পুরো খবর জেনে নেবো।

দুর্গামোহন বললেন, জানবে কখন ? এসে অবধি তো বাইরে বাইরেই আছ। দশটা মিনিটও বোধহয় আমরা এক সঙ্গে বসিনি।

—তা অবিশ্যি ঠিক। তবে এখানে একটা অন্য কারণও আছে।

—কী সেটা ?

প্রদীপ অভিজিতের দিকে ফিরে বলল কিছু মনে করবেন না। জমিদারদের সঙ্গে আমি বড় একটা মিশিনি। আমার ধারণা তারা বেশ কিছুটা—কি বলবো ?

"দাম্ভিক ?" হাসি মুখেই বলল অভিজিৎ।

—না, দাম্ভিক বলবোনা। একটা আইসোলেসানের গণ্ডির মধ্যে বাস করেন, যার ফলে অন্য লোক তাদের ঠিক নাগাল পায়না। বিশেষ করে কাকাবাবুর মত একজন রিটায়ার্ড মানুষ যাঁর কাজ হল ঘরে বসে দর্শন চর্চা।

—তার মানে আমাকে তুমি জমিদারদের সঙ্গে মেশার অযোগ্য বলে মনে করছ ? ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন দুর্গামোহন। ওরা দুজনেই হেসে উঠল। প্রদীপ বোধহয় কৈফিয়ৎ স্বরূপ একটা কী বলতে যাচ্ছিল,

দুর্গামোহন তার আগেই বললেন, তোমার ধারণাটা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। তবে অভির সম্মুখে বলতে পারি অতবড় জমিদার বংশের সন্তান হয়েও ও ঠিক জমিদার হতে পারেনি। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ? সেটা দু-একদিনেই বুঝতে পারবে।

—এখনই বুঝতে পারছি। এতে করে আমার অনেক সুবিধে হল। তাহলে অভিজিৎ বাবু—

—বলুন।

—আপনার কাছে কবে যাবো ?

—যেদিন আপনার সুবিধে ? আমি তো সব সময়েই হাজির।

—কাল বিকেল চারটা ?

—বেশ।

—তার আগে শুধু একটা কথা জেনে নিই।

—কী, বলুন।

—আচ্ছা ঐ বাড়িটা কি আপনার একার ? অন্য কোনো সরিক আছে, কিংবা আর কারো কোনো স্বত্ব ? কিছু মনে করবেননা। এই সামান্য পরিচয়ের পর এই জাতীয় প্রশ্ন হয়তো একটু—

—"ওসব ব্যাপার আমার কাছ থেকে শুনো"—কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন দুর্গামোহন।

অভিজিৎ যখন বাড়ি ফিরল বেলা বারোটা বেজে গেছে। বৌরানী এগারটার পর থেকেই ব্যস্ত হয়ে ঘরবার করছিলেন। হলধরকে ডেকে খবর নিলেন, তাকে কিছু বলে গেছে কিনা। সে কিছুই বলতে পারল না। দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে এইটুকু শুধু জানা গেল বাবু গঙ্গার দিকে গেছেন। সে তো রোজই যায়। কিন্তু এর অনেক আগেই ফিরে আসে। কখনো কচিৎ কৃষ্ণনগর গিয়ে থাকে, সেরেস্তার কোনো দরকারে। তাও খেয়ে দেয়ে ত্বপুর বেলা এবং যাবার আগে বৌরানীকে জানিয়ে যায়। কোলকাতায় গেলেও না বলে যায় না।

যখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন এবং কাকে কোথায় পাঠাবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তখনই হলধর ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, ছোটবাবু আসছেন। দেউড়ির বাইরে বেশ কিছুটা দূরে থাকতেই দেখতে পেয়ে সে উপরে ছুটেছিল। তখনই আবার নেমে গিয়ে যখন জানল অভিজিৎ এই কাছেই ছিল, ত্বর্গামোহনের বাড়ি, হলধর একেবারে থ। মাষ্টার মশাই ফিরে এসেছেন এ খবর সে জানে না, বৌরানীও না। তবু কিছুক্ষণ আগে প্রস্তাব করেছিল—"ও বাড়িটা একবার দেখে আসবো ?" বৌরানী সঙ্গে সঙ্গে সেটা নাকচ করে দিলেন—"ওখানে কী যাবে ? ওঁরা তো কেউ নেই।"

অভিজিৎ উপরে উঠেই বৌরানীর মুখের দিকে চেয়ে সলজ্জ কৈফিয়তের সুরে বলল, বড্ড দেরি হয়ে গেল। একবার মনে করেছিলাম কাউকে দিয়ে—

বৌরানী থামিয়ে দিলেন—"চট করে চান সেরে নাও। খাবার সময় কখন উৎরে গেছে।"—বলে আর দাঁড়ালেন না ; খাবার দাবারের বন্দোবস্ত করতে ভিতরে চলে গেলেন।

খেতে বসেও বিশেষ কোনো কথা হল না। অভিজিৎ মাষ্টার মশাই এর

ওখানে ছিল বৌরানী সেটা হলধরের কাছেই শুনতে পেয়েছেন। আর কিছু জানবার ছিল না। দুজনকেই তিনি ভাল করে জানেন। কোনো একটা প্রসঙ্গ নিয়ে জমে গেলে শিক্ষক ও ছাত্র কেউ কারো চেয়ে কম নয়, এ তিনি আগেও দেখেছেন। এইটুকু শুধু আশ্চর্য লাগল, গৌরী তো এ সব বিষয়ে খুব কড়া। তার শাসনে বাবাকে রীতিমত ঘড়ি ধরে চলতে হয়, যথেচ্ছ বকবক করবার সুযোগ পাননা ভদ্রলোক, এবং সে ব্যাপারে অভিকেও সে খাতির করে না, অভির কাছেই শুনেছেন। আজ যে একটি বিশেষ কারণ ঘটেছিল—একটি তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব—বৌরানীর জানবার কথা নয়। অভিও বলল না। কিন্তু খেতে খেতে তার মনটা মাঝে মাঝে মাষ্টার মশাই এর বৈঠকখানাতেই আনাগোনা করছিল। বৌরানী যথারীতি টেবিলের পাশে পাখা নিয়ে বসেছিলেন। দেওরের আনমনা ভাবটা তাঁর নজর এড়াল না। বললেন, রান্নাটা আজ ভালো হয়নি, না? আমি তো একবারও যেতে পারিনি ও দিকটায়।

—না, না; ভালো হয়নি কে বললে? বেশ হয়েছে।

—তবে খাচ্ছ না যে?

—"এই তো খাচ্ছি"—বলে অভিজিৎ অনেকগুলো ভাত ভেঙে নিয়ে হাত বাড়িয়ে যে বাটিটা পেল উপুড় করে দিল তার উপর।

বৌরানী মনে মনে হাসলেন। কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বললেন, মাসিমা এসেছিলেন!

"মাসিমা?" খাওয়া থামিয়ে চোখ তুলল অভিজিৎ। বৌরাণী বুঝিয়ে দিলেন, "নীহারের দিদিমা। আজ তোমার কাছারির ছুটি তো। ও-ই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। এগারটা পর্যন্ত তোমার জন্যে অপেক্ষা করে চলে গেলেন।

—আমার জন্যে? তেমন কোনো বিশেষ দরকার ছিল কি?

বৌরানী মুখ টিপে হাসলেন, "তা দরকার বিশেষ বৈকি? থাক, সে সব পরে হবে। এখন খেয়ে বিশ্রাম করগে। বিকেলে যেন আবার না বলে বেরিয়ে যেও না।"

অভিজিতের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। বৌরানী যে একটি বিশেষ পথে এগিয়ে চলেছেন, সে জানত। এতদিন তার উপরে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি

কিন্তু এবারে তিনি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছেন যে ব্যাপারটাকে আর ফেলে রাখা চলে না। তার দিকটা স্পষ্ট ও খোলসা করে বলে দিতে হবে। ঠাট্টা তামাসার স্তর পার হয়ে গেছে। এবার সিরিয়াস্ ভাবে বোঝাপড়ার পালা।

স্বরূপকান্দিতে দৈনিক কাগজ পাওয়া যায়, তবে দেরিতে। কোলকাতায় বা তার কাছাকাছি যাদের বাস তাদের মত সে প্রাতঃকালীন চায়ের সঙ্গী নয়, মধ্যাহ্ন ভোজনের পরবর্তী সহচর। অভিজিৎ খাওয়া দাওয়া সেরে তার উপরের বসবার ঘরে যে ইজিচেয়ারখানা আশ্রয় করে, তার হাতলের উপর পাট করা থাকে দুখানা কাগজ—একটা বাংলা, আরেকটা ইংরেজী। আজও তেমনি ছিল এবং অন্যদিনের মত আরাম চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে তার একখানা সে খুলেও ধরল চোখের সামনে। কিন্তু খবরগুলো চোখের সীমানা পেরিয়ে মনের এলাকায় ঘোরাফেরা করবার বড় একটা সুযোগ পেল না। সেখানে তখন অন্য ভাবনা জুড়ে বসেছে।

বৌরানী নীহারের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন, শুধু আজ নয়, অনেক দিন থেকে, বোধহয় তার আসবার কিছু পরেই। হবারই কথা। এত বড় একটা শূন্য পুরীতে একজন মনোমত সঙ্গিনীর অভাব তিনি দীর্ঘকাল ধরে অনুভব করেছেন। তাঁর মঙ্গলা বা অন্যান্য ঝিএরা সেটা পূরণ করতে পারে না। তারা তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং একান্তভাবে তাঁর অনুগত। তবু হাজার হলেও তারা পরিচারিকা, যদিও দাস দাসীর সঙ্গে আগেকার আমলের যে দূরত্ব, মহামায়া বাঁড়ুয্যে বাড়ির বৌরানী হয়ে আসবার পরে যেটা দেখেছিলেন, সেটা তিনি কোনদিনই মনে মনে মেনে চলেননি। যখন একা হয়ে গেলেন তখন বাইরের দিক থেকেও তার কড়াকড়ি আরো কমে গিয়েছিল এবং ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা আপনা হতেই অনেকখানি সহজ ও অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তাহলেও 'সঙ্গিনী' বলতে যা বোঝায় সে স্তরে তারা পৌঁছতে পারেনি।

নীহার যখন এল, 'চাকরে মেয়ে' সম্বন্ধে বৌরাণীর বাঁড়ুয্যে বাড়ির মন তখনো স্বভাবতই বিরূপ, যদিও অভিজিৎ এবং মাষ্টার মশাই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাইরে তার কোনো বিরুদ্ধাচরণ করেননি, বরং সেটা মেনে নিয়েছিলেন। তারপর এই মেয়ে ম্যানেজারটির সম্বন্ধে একদিকে তিনি যেমন

সংস্কার-মুক্ত হয়েছেন, আরেকদিকে সে-ও তেমনি চাকরির খোলস-মুক্ত হয়ে তাঁর একান্ত কাছটিতে দাঁড়িয়েছে। একদিকে মহামায়ার নিঃসঙ্গ জীবন এবং স্নেহপ্রবণ হৃদয়, আরেকদিকে নীহারের উন্মুখ মন ও মধুর স্বভাব—এই তুয়ে মিলে ওঁদের পরস্পর সম্পর্কে একটা দ্রুত বিবর্তন নিয়ে এসেছিল।

নীহার সবে মাস চারেক এসেছে তখন। মহামায়া ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওদিকে অভিজিতের কী একটা দরকারী কাজ ছিল ম্যানেজারের সঙ্গে। খবর নিয়ে জানল 'তিনি ওপরে গেছেন, বৌরানীর ঝি এসে ডেকে নিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কাজটা সেদিনের মত মুলতবী রেখে এবং অফিস বন্ধ করে যখন উপরে উঠছে, মাঝের মহলের সিঁড়ির মুখে যে দৃশ্যটি দেখল তার জন্যে তখনো সে প্রস্তুত ছিলনা। নীহার নত হয়ে বৌরানীর পায়ের ধুলো নিয়ে বলছে, তাহলে আসি দিদি? মহামায়া পরম স্নেহে তার চিবুকে হাত রেখে বলছেন, এসো বোন। আবার কবে আসছ?

—যবে ডাকবেন।

—না ডাকলে বুঝি আসতে নেই আমার কাছে?

—তা কেন? তবে ডাকলে সুবিধে হয়। কাজে ফাঁকি দেবার অজুহাত পাওয়া যায়।

—দাঁড়াও, ঠাকুরপোকে বলে দেবো তুমি কাজে ফাঁকি দাও।

—বেশতো, দেবেন।

—তাই নাকি? খুব জোর দেখছি।

নীহারের কোনো উত্তর শোনা যায়নি। সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ তার মুখের চেহারাটাও দেখতে পায়নি। তবে বুঝেছিল, এর পরে তুজনের ঐ একান্ত এবং অন্তরঙ্গ বিদায় নেওয়ার মাঝখানে তার হঠাৎ গিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। নিঃশব্দে নেমে গিয়েছিল।

এই ভগিনী সম্পর্কটাকে পাকাপাকি রূপ দেবার অভিপ্রায় কবে থেকে দেখা দিয়েছিল বৌরানীর মনে, অভিজিৎ জানেনা। ওদের তুজনকে জড়িয়ে কথাচ্ছলে মাঝে মাঝে যে মধুর ইঙ্গিত করেছেন সেগুলোকে নিছক পরিহাস বলে উড়িয়ে দিয়েছে। হাসিঠাট্টার আড়াল দিয়ে ইদানিং তিনি যেন আরো কিছুর আভাস দিতে চেয়েছেন, এরকম সংশয় কখনো কখনো মনে জেগেছে।

কিন্তু তাকে আমল দেয়নি। এমনকি বৌরানী যেদিন নীহারের দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, সেদিন মনে মনে আশ্চর্য হলেও এর মধ্যে তাঁর কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য থাকতে পারে এরকম কোনো সন্দেহ হয়নি। আজ দিদিমাও ঘুরে গেলেন। একে নিছক সৌজন্য বলে মনে করা যেত। কিন্তু এই মাত্র সে নিঃসংশয় হয়ে এল। উভয় পক্ষের এই যাওয়া আসার অন্তরালে তার ভূমিকাটা আর অস্পষ্ট নেই। সেই সঙ্গে আরেকজনের।

সেই আরেকজন কি এ বিষয়ে সজাগ? বৌরানী কি তার মন জেনে নিয়ে তারপর অগ্রসর হয়েছেন? স্পষ্ট করে হয়তো জিজ্ঞাসা করেননি, যেমন নিজের দেওরকেও করেননি। দেওরের বেলায় তিনি অভিভাবিকা। বাঁড়ুয্যে বাড়ির ঐতিহ্য অনুসারে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই। তবু হয়তো করতেন, ঐতিহ্যটাই এ ক্ষেত্রে সব নয়, এটুকু তিনি জানেন। করেননি, তার কারণ বোধহয় এই যে তিনি ধরে নিয়েছেন দেওরের সম্মতি আছে। একটি শিক্ষিতা সুদর্শনা সুচরিতা তরুণীর সঙ্গে তার এতদিনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ভিতর দিয়ে যে সৌহার্দ্য, সান্নিধ্য এবং মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সে তো তিনি জানেন, দেখেছেন, তার বেশী আর জানবার কী আছে?

কিন্তু অপরজনের বেলায়? সেখানেও কি শুধু ঐটুকুই জেনেছেন তিনি, না তার চেয়ে গূঢ় ও গভীর আরো কিছু যা অভিজিৎ জানে না, জানবার চেষ্টাও সে কোনদিন করেনি? তাই বলে একথা সে নিজের কাছে কী করে অস্বীকার করে যে, তার মন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বা নির্বিকার? কর্মসূত্রে দিনের পর দিন একটা নির্জন ঘরের নিকট সংস্পর্শে তাদের আসতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তার ফাঁকে দুটি একটি অপ্রয়োজনীয় কথা কিংবা অহেতুক হাসির বিনিময় যে হয়নি তা নয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তবু কখনো কখনো একটি গভীর চাহনী, এক পশলা উচ্ছ্বসিত হাসি, কোনদিন একটু বিশেষ সাজ প্রসাধন, কিংবা হঠাৎ কোনো কারণে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়া এক ঝলক রক্তিমাভা অভিজিৎকে কিছুক্ষণের জন্যে আনমনা করে দিয়েছে। তার জানতে ইচ্ছা হয়েছে, এর সবটাই কি অকারণ, না ভিতরে কোনো অর্থ আছে? তারপরেই মনটাকে সে সরিয়ে এনেছে সেখান থেকে। ওটা তার অজানা জগৎ। শুধু অজানা নয়, নিষিদ্ধ জগৎ। তাই ইচ্ছা করেই ওদিকের সব দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছে। এতদিনেও তার জীবনের শূন্য বেলায় কোনো

নারীর চরণচিহ্ন কখনো পড়েনি। সুযোগ এলেও সে পড়তে দেয়নি। ডাক যে আসেনি তা নয়, কিন্তু সে সাড়া দেয়নি।

প্রথম যৌবনের উন্মেষকালে যে অমোঘ নিষেধবাণী এই পথ থেকে তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, অভিজিৎ ভেবেছিল, সারাজীবন তাকে সে নিজের অন্তরের-নিভৃত কোণে সঙ্গোপনে রেখে দেবে। এতদিন রেখেও ছিল। কিন্তু আর বোধহয় রাখা গেল না।

বৈকালিক চা-এর ব্যাপারটা সাধারণতঃ অভিজিতের ঘরেই আসে। মাঝে মাঝে ব্যাতিক্রম দেখা দেয়।

বৌরানী যেদিন মনে করেন সেদিনকার মাধ্যাহ্নিক আয়োজনটি তাঁর মনোমত হয়নি, কিংবা অভিজিৎ কোনো কারণে তার যথোচিত ব্যবহার করেনি—ছুটোই হয়তো তাঁর কল্পনা—সেদিন চা-এর বদলে আসে ডাক। ঐ পর্বটা তাঁর সামনে বসে মেটাতে হয়। সেটা সত্যিই পর্ব এবং তার কোনো অংশই বাদ দেওয়া চলে না।

ছুপুরে খাবার-টেবিলের কথাবার্তা থেকে অভিজিৎ ধরে নিয়েছিল আজও ডাক আসবে। তাই মঙ্গলার হাতে খাবারের ডিস আর তার পিছনে কিষণের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দেখে একটু আশ্চর্য লাগল। একটু পরেই এলেন বৌরানী। কিন্তু অন্য দিনের মত এটা খাও, ওটা কেন ফেলে রাখলে-ইত্যাদি উপরোধ অনুযোগ কিছুই শোনা গেল না। টেবিলের ওদিকে একটা চেয়ারে নিঃশব্দে বসে রইলেন এবং অভির খাওয়া শেষ হতেই দরজার বাইরে যে ঝিটি অপেক্ষা করছিল তাকে ডেকে ট্রে ইত্যাদি সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। অভিজিৎ অপেক্ষা করে রইল। বৌরানী কী বলবেন সে জানে। উত্তরে তার বক্তব্যটা ঠিক কীভাবে উপস্থিত করলে আকস্মিক আঘাত থেকে তাঁকে যতটা সম্ভব বাঁচানো যায়, মনে মনে তারই মহড়া দিতে লাগল। কিন্তু বৌরানী তার বিশেষ কোনো সুযোগ দিলেন না। কোনো রকম ভূমিকা না করে সরাসরি বললেন, শুভকাজের সূচনা শুভ দিন দেখে করতে হয়। মাসিমারও তাই ইচ্ছা। এ মাসে তেমন ভাল দিন নেই, বোশেখের গোড়াতে ওঁরা আসছেন। তারিখটা ওঁদের আর আমাদের সুবিধেমত পরে স্থির করা যাবে।

অভিজিৎ সবই বুঝল। তাই কোনো অনাবশ্যক প্রশ্ন না করে শুধু বলল ওঁরা মানে?

—ওঁর দাদামশাইও আসছেন। আমি অবিশ্যি বলেছিলাম, তিনি আর এতটা পথ কষ্ট করে আসবেন কেন? বুড়ো মানুষ, শরীরও তেমন ভালো না। শুনলেন না। বললেন, 'মেয়েটার বাবা থাকলে সে-ই যেত। সে যখন নেই আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। আমার তরফ থেকেই প্রস্তাবটা আসা উচিত।' ওঁরা দুজন আর সঙ্গে একটি ছেলে, ওঁদের কিরকম আত্মীয়। এ দিকের পথ ঘাট চেনে। নীহার তো আর আসতে পারবে না। হ্যাঁ; তোমার হয়ে আমি কিন্তু তাকে ঐদিনটা ছুটি দিয়ে দিয়েছি। মঞ্জুর হবে তো? ....বলে মুখ টিপে হাসলেন বৌরানী।

অভি সে হাসিতে যোগ দিল না। গম্ভীর হয়ে শুনছিল। আরো কিছুক্ষণ তেমনি গম্ভীর হয়ে রইল। বৌরানী লক্ষ্য করে বললেন, কী ভাবছ?

—তুমি কি ওদের কথা দিয়েছ?

—কেন, বল দিকিন?

—না, এমনিই জিজ্ঞেস করছি।

—যাকে কথা দেওয়া বলে সেটা ঠিক হয়নি। আগে ওঁদের দিক থেকে প্রস্তাব আসবে, তারপর আমাদের তরফ থেকে যা বলবার বলবো। তবে আমার মনের কথা ওঁদের জানতে বাকী নেই।

অভিজিৎ বলতে পারত, তার আগে আমার মনের কথা তো জানতে চাওনি। বড় রূঢ় শোনাবে বলে বলল না। তাছাড়া বলবার পথও বোধহয় সে রাখেনি। এ বিষয়ে বৌরানীর মনোভাব তার অজানা নয়। শুরুতে সেটা ছিল আকার ইঙ্গিত ও হাসি-পরিহাসের আড়ালে অস্পষ্ট, সম্প্রতি কিছুদিন থেকে তাঁর কথাবার্তা ও কার্যকলাপে স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। সেটা লক্ষ করেও অভিজিৎ যদি তার স্বভাবজাত মন্থরগতি ত্যাগ করে বাস্তবের মুখোমুখি এসে না দাঁড়িয়ে থাকে, তার জন্যে বৌরানীকে দায়ী করা চলে না।

এইসব যখন ভাবছে তার নীরব বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে বৌরানীর মনে এক অজানা আশঙ্কার ছায়া পড়ল। শুষ্ক কণ্ঠে ডাকলেন, অভি! অভিজিৎ চমকে উঠল। বৌরানীর মুখে ঠাকুরপো ডাকই সে শুনে এসেছে এতদিন, তাতেই অভ্যস্ত। নাম শুনল এই প্রথম এবং তার মধ্যে একটা উৎকণ্ঠার সুর। চোখ তুলে তাকাতেই তিনি বললেন, এসব কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

—এমনিই। বলছিলাম—

—থামলে কেন? বল। আমার কাছে কিছু লুকিও না।

—না, আর লুকোনো চলে না। এবার সবটাই বলা দরকার।

দরকার হলেও কিভাবে শুরু করবে যখন ভাবছে বৌরানী বললেন, এই সম্বন্ধ কি তোমার পছন্দ হয়নি? নীহারকে তো তুমি এতদিন ধরে দেখছ। আর ওর—

"না না, সে সব কিছু নয়" তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল অভিজিৎ।

তবে?

অভিজিৎ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। বৌরানী তীব্র দৃষ্টিতে তার আনত মুখের পানে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে সে চোখ তুলে ধীরে ধীরে বলল, তোমার মনে আছে বৌরানী, আমি আসবার কিছুদিন পরে একদিন বলেছিলে, শেষ সময়ে কী একটা কথা মা তোমাকে বলে যেতে চেয়েছিলেন?

বৌরানীর চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। বললেন, মনে আছে বৈকি ভাই? সেকি কোনোদিন ভুলবার? কিন্তু এমনি আমার অদৃষ্ট, সে কথা আমার শোনা হল না।

—মনে হয় আমাকে যা বলে গেছেন, সেইটাই তোমাকে জানিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

"তোমাকে বলে গেছেন! কী বলেছেন? কোথায়? কবে? কী করে?"—উত্তেজনায় আবেগ আর ধরে রাখতে পারছিলেন না মহামায়া। অভিজিৎ আগের মত ধীর ভাবেই বলল, ওরই বোধহয় মাসখানেক আগে একটা চিঠি লিখেছিলেন আমাকে। মার কাছ থেকে সেই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি। আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা, অনেক বানান ভুল তার মধ্যে। মা যে লেখাপড়া জানতেন তাইতো আমার জানা ছিল না।

—জানতেন না। তুমি চলে যাবার বেশ কিছুদিন পরে শুরু করেছিলেন। সারাদিনে তো সময় হত না। সবাই শুয়ে পড়লে রাত জেগে জেগে পড়তেন, লিখতেন; ঘরে দরজা বন্ধ করে। কেউ জানতনা, শুধু আমার কাছে এক আধটু দেখিয়ে নিতেন বলে আমি জেনেছিলাম। বারণ করে দিয়েছিলেন, কাউকে যেন না বলি। শরীর খারাপ, চোখেও কম দেখেন। বেশ কষ্ট

হত। আমি মাঝে মাঝে বলতাম, এমন করে চোখ দুটো নষ্ট করছেন কেন? কী হবে এ বয়সে লেখাপড়া শিখে? শুনতেন না শুধু বলতেন, দরকার আছে! সে দরকার যে এই, কেমন করে জানবো? থাক, এবার বলো, কী লিখেছিলেন চিঠিতে।

—চিঠিটা কাশীর বাড়িতে আয়রণ-সেফ্ এ রয়ে গেছে। নিয়ে এলে ভাল হত। তুমি দেখতে পেতে।

—যাক, তুমি মুখেই বল।

অভিজিৎ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। এতদিন পরে আর একবার বোধ হয় মনে মনে চোখ বুলিয়ে নিল চিঠিখানায়। তারপর বলল, এ এমন কথা যা চিঠিতে যদি বা লেখা যায়, মুখে বলা য়ায় না। আর বলবেনই বা কেমন করে? আমি আবার এ বাড়িতে পা দিই তা তো তিনি চাননি।

সে কথা বৌরানীর চেয়ে কে বেশী জানে? যখন খুব বাড়াবাড়ি, আর কোনো আশা নেই, কতবার করে বলেছেন, ঠাকুরপোকে একটা খবর দিই। দিনগুলো ভেসে উঠল চোখের উপর। মহামায়া নীরবে অপেক্ষা করে রইলেন। অভিজিৎ বলে চলল, "সারাজীবন ধরে কত যন্ত্রণাই তো সইতে হয়েছে মাকে। আমি সবটা না দেখলেও বুঝতে পারি। কিন্তু চিঠির প্রতিটি অক্ষরে যে যন্ত্রণা ফুটে বেরিয়েছে তার কোনো তুলনা নেই। সে সব এখন থাক। যে কথাটি বলবার জন্য চিঠির আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাকে তিনি বলেছেন তাঁর শেষ ইচ্ছা, সেইটুকু জানিয়েই আমার ছুটি। আমার কাছে সেটা কেবলমাত্র ইচ্ছা নয়, তাঁর আদেশ। সেইদিন থেকেই মাথা পেতে নিয়েছি। লিখতে পারিনি। আমার চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছত কিনা কে জানে? শুধু মনে মনে বলেছিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত হও মা। তাই হবে। এ বাড়িতে বৌ হয়ে আর কেউ আসবে না।

"কী বললে!" অস্ফুট স্বরে এইটুকুই শুধু বলতে পারলেন বৌরানী। অভিজিৎ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। তারপর বলল, এক জায়গায় আছে তাঁর নিজের কথা। অনেক আলো, অনেক বাজনা-বাদ্য-শাঁক আর উলুধ্বনির মধ্যে দুধে আলতার পাথরে এসে যেদিন দাঁড়ালেন, সেদিন থেকেই টের পেয়েছেন অতি বড় অভিশাপ মাথায় না করে কেউ এ বাড়ির বৌ হয়ে আসে না। এর প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি দেয়ালে জমে আছে

অনেক হতভাগিনীর চাপা কান্না আর দীর্ঘশ্বাস। তাঁরই মত যারা এসেছিল, বহু পুরুষ ধরে। তোমার কথাও রয়েছে চিঠিতে।

—আমার কথা!

—এতবড় বংশের প্রথম সন্তান। মা হয়েও তার বিয়ে তিনি অন্তর থেকে চাননি। আর একটা মেয়ে এসে তাঁরই মত এই বিশাল পুরীর ঐশ্বর্য আর অসম্মানের মধ্যে তিল তিল করে শুকিয়ে মরবে এটা সইতে পারেননি। কিন্তু বাধাও দেননি। জানতেন, দিলে তা টিকতনা। ছোট ছেলের বেলাতেও হয়তো টিকবেনা। তবু তাঁর শেষ ইচ্ছাটা তাকে জানিয়ে গেলেন।

অভিজিতের আর কিছু বলবার ছিল না। যখন থামল, বৌরানী গালের নীচে হাত রেখে নিশ্চল পাথরের মত বসে আছেন। তাঁর মধ্যে যেন কোনো জীবনের স্পন্দন নেই। ঠোঁটের কোণে একটি ম্লান হাসি ফুটিয়ে তুলে অভিজিৎ বলল, অর্থাৎ ও পর্বের এইখানেই ইতি।

"আমার একটা কথা শুনবে?" যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন বৌরানী।

—বল।

—তুমি কাশী ফিরে যাও। আগে যদি জানতাম, তোমাকে এখানে টেনে আনতাম না।

আমি বুঝতে পারছি তুমি কী ভাবছ। বেশ, তাই না হয় হল। পালিয়ে গেলাম এই বাড়ি থেকে। কিন্তু আর সব থেকে পালাবো কেমন করে?

—আর সব মানে?

—অনেক কিছু, এক কথায় যাকে বলতে পার আমার গৌরবময় উত্তরাধিকার।

কথাটার মধ্যে যে ব্যঙ্গের সুর ছিল, বৌরানী সেটা খেয়াল করলেন না। বললেন, জমি-জমা টাকা কড়ি? সে সব তো তুমি নাওনি, কোনোদিন চাওওনি। যা আছে পড়ে থাক, কিংবা যেখানে খুশি বিলিয়ে দাও।

অভিজিৎ মাথা নাড়ল—"সে সব নয়।" ঘরের দেয়ালের একদিকে তার পিতার, আরেক দিকে পিতামহের বড় বড় দুটো তৈলচিত্র ছিল। সেই দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওঁদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, যা রয়েছে আমার রক্তে, আমার শিরায়, আমার দৃষ্টিতে এবং হয়তো চিন্তাধারায়, সেই উত্তরাধিকার।

তাকে তো বিলিয়ে দেওয়া যায় না। যেখানেই পালাই, সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করবে।

হালকা ভাবে এবং খানিকটা হেঁয়ালির মত করে বললেও কথাগুলোর অন্তরালে যে গভীর বেদনা ছিল বৌরানীকে সেটা স্পর্শ করল। এই ধরনের উক্তি অভিজিৎ আগেও করেছে তাঁর কাছে। আজ যা বলল তার সুর আলাদা। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিশাল বংশের সঙ্গে তার যে অচ্ছেদ্য নাড়ির যোগ, তার জন্যে তার মনের তলায় কোথায় যেন একটা গ্লানি রয়ে গেছে। এই ধারাটাকে সে আর টেনে নিয়ে যেতে চায়না। সম্পদের মধ্যে মানুষ হয়েও মানুষের যে সহজাত সাধ আকাঙ্খা, কামনা বাসনা ভোগস্পৃহা সব থেকে দূরে একা এক শূন্য নিঃসঙ্গ জীবন বরণ করে নিয়েছে, বাকী দিনগুলো সে তারই মধ্যে কাটিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত। সেই রিক্ততা এক বেদনাময় মর্মান্তিক রূপ নিয়ে দেখা দিল বৌরাণীর সামনে এবং তাঁকে একেবারে নির্বাক করে দিল। বলতে পারলেন না, তাঁর অন্তরের যেটা দৃঢ় বিশ্বাস, অভি, তুমি ওঁদের, তবু ওঁদের নও। সবার থেকে আলাদা, একক। তুমি সবখানিই তোমার মায়ের, ভিতরে বাইরে তাঁরই প্রতিচ্ছায়া।

॥ ১৭ ॥

মায়ের অবস্থা বেশ ভালোর দিকে যাচ্ছিল। হাসপাতালের ডাক্তারেরা ভরসা দিয়েছিলেন আর কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া যাবে। শম্ভুচরণ ভাবছিল এবার আবার কাজে লাগবে। মাকে আপাততঃ কোলকাতায় বন্ধুর বাড়িতেই রেখে দেবে। বন্ধুটি ভাগ্যবান এবং বুদ্ধিমান। আগেই চলে এসেছিল, দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে। ওপারে যাবার জন্য মুখিয়ে আছে এমনি একটি মুসলমান পরিবারের কাছ থেকে একরকম জলের দামে কিনে ফেলেছিল বাড়িটা। কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর মোটামুটি গোছের চাকরিও একটা জুটে গিয়েছিল। বৌ ছেলে নিয়ে সচ্ছল ও সুখী সংসার। শম্ভুচরণের সঙ্গে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা। অনেক দিনের ব্যবধানে হলেও চিনতে সময় লাগেনি। একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে। তারপর মাঝে মাঝে কোলকাতায় এলে শম্ভু বসন্তর ওখানে একবার ঢুঁ মেরে যেত। মার অসুখের ব্যাপারে যা কিছু করণীয় সেই করেছে। তার এবং বিশেষ করে তার বৌএর ইচ্ছা নয় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর মাকে আবার কলোনীতে ফিরে যেতে হয়। বসন্ত শম্ভুকে বলেছিল, মা তো রইলেনই। তুমিও চলে এসো ওখান থেকে। একটা কাজ কর্ম জুটিয়ে নাও। কদ্দিন আর পরের বোঝা টানবে? কথায় বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

শম্ভু মনের কথা ভাঙেনি, বন্ধুর কথাতেও 'না' করেনি, মৃদু হেসে বলেছিল দেখি।

মায়ের ইচ্ছার বহরটা ওদের চেয়ে আরো বেশী।

বসন্তর বৌ যখন হাসপাতালে দেখতে যেত, তার দিকে বারবার তাকাতেন আর মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলতেন, আহা আমার কপালে এমন একটি কবে জুটবে? কথাটা একদিন মুখফুটে বলেও ফেলেছিলেন ছেলের কাছে। সরাসরি বলতে সাহস হয়নি। একথা ওকথার পর। উত্তরে

পেয়েছিলেন একটি সস্নেহ ধমক—"আবার? দেশে থাকতে একবার এমনি বৌ বৌ করে ক্ষেপেছিলে। তারপর কী সর্বনাশ হল দেখলে তো? এখনকার হালও দেখছ।

হাসপাতাল থেকে আসার পর মার শরীরটা আবার খারাপ হতে লাগল। আসলে ভাঙা হাড় এবং তার উপর দিয়ে ঝড় ঝাপটা কম যায়নি। সেই সঙ্গে ইদানিং ছেলের কথা ভেবে ভেবে মনটাও ভেঙে পড়েছিল। ওকি চিরটাকাল এমনি ভেসে বেড়াবে? আমি আর কদ্দিন? তারপর কে দেখবে ওকে, কে দুটো ভাত দেবে?—এইসব চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছিল বুকের ভিতরটা। শম্ভু সবই বুঝত। মার দেখাশুনোর জন্যে বসন্ত এবং তার বৌএর উপরে যে চাপ পড়ছে তাও দেখছিল। কিন্তু আপাততঃ কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছিল না।

এই সব নিয়ে জড়িয়ে পড়ায় অনেকদিন যেতে পারেনি নীহারদের বাসায়। সেজন্যে মনে মনে একটা অস্বস্তি। দয়া করে তিনি নিজে থেকে মেয়েটার ভার নিয়েছেন বলে তার দায়িত্ব তো পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। আসলে ও তাদের অর্থাৎ কলোনীর মেয়ে। আর কিছু না পারুক মাঝে মাঝে গিয়ে খবরটা অন্ততঃ নেওয়া উচিত ছিল, যদিও মনে মনে জানত ভালই আছে এবং ওঁদের হাতে যখন পড়েছে তার ভবিষ্যতের একটা ব্যাবস্থাও ওঁরা করে দেবেন।

একদিন সময় করে সন্ধ্যার দিকেই গেল, নীহার যখন ফেরে। দরজা খুলে দিল রূপা এবং তারপরেই এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। শম্ভুর মুখের পানে একবার তাকিয়েই ফিক করে হেসে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে আঁচল সামলাতে সামলাতে এক ছুটে চলে গেল উপরে। শম্ভু অবাক। এরকম তো কখনো করেনি আগে। 'শম্ভুদাকে' দেখতে পেয়েই বরং খুশী হয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসেছে। পনর গণ্ডা প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলেছে।

বরাবরই একটু বেশী কথা বলে মেয়েটা। বড় সরল আর বয়সের তুলনায় বেশ কিছুটা ছেলেমানুষ। অহেতুক লজ্জা-টজ্জা বড় একটা কাউকে করেনা, আর তাকে তো নয়ই। আজ যে পলকের তরে নজর পড়ল মুখের উপর, তাতেই মনে হল কে যেন সেখানে একরাশ সিন্দুর ঢেলে দিয়েছে। আর

মনে হল, রূপা যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেছে। বাড়ন্ত গড়ন ওর ছোট থেকেই, কিন্তু এ যেন ঠিক তা নয়, অন্য কিছু। কদিন আগে যে রূপাকে সে এখানে রেখে গিয়েছিল আর আজ যাকে দেখল, এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ।

একটু পরেই নীহার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, আসুন। মা কেমন আছেন ?

"ভালো না"।

"সে কী! সেদিন তো বললেন হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিচ্ছে শীগগিরই।"

"তা দিয়েছে। কিন্তু আবার যে কে সেই। বরং দিন দিন যেন খারাপ দিকেই যাচ্ছে।

"তাহলে আবার নিয়ে যান।"

শম্ভু মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, কোনো লাভ নেই। মা বোধহয় এবার আর ফিরবেনা।

যেভাবে, যে সুরে বলল, তারপরে নীহারের মুখে আর কোনো কথা সরল না। মনে হল, এটা বোধহয় কোনো মিথ্যা আশঙ্কা নয়। তাই মামুলী সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে নিঃশব্দে বসে রইল।

শম্ভু মিনিট কয়েক নিবিষ্ট হয়ে রইল নিজের মধ্যে। তারপর মনের ভিতরকার সব বোঝা যেন এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খাড়া হয়ে বসল— "থাক ও সব কথা। আপনি বোধহয় আজ একটু সকাল সকাল ফিরেছেন মনে হচ্ছে।"

নীহার কিছু একটা ভাবছিল। হঠাৎ খানিকটা চমকে উঠে বলল 'হ্যাঁ, আগেই চলে এলাম। বসে বসে কী করবো ? ওঁদের সভা ভাঙতে রাত হবে।'

"সভা !"

"ও, আপনি তো কিছুদিন এদিকের খবর পাননি। ধানবাদ না আসানসোল থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন। মস্তবড় এঞ্জিনিয়ার। রোজ আসছেন কাছারিতে। তিনচার ঘণ্টা ধরে বসছেন আমাদের মালিকের সঙ্গে। অনেক রকম স্কিম্ আছে তাঁর। তার মধ্যে যেটা নিয়ে কথাবার্তা অনেকখানি এগিয়েছে সেটা হল চিনির কল।"

"চিনির কল !" একই সঙ্গে বিস্ময় ও উৎসাহের স্বর শম্ভুর।

"হ্যাঁ। তার সঙ্গে আখের চাষ। ছুটো মিলে, উনি দেখিয়েছেন, আমাদের কলোনীতে যতলোক কাজ চায় তাদের ব্যবস্থা তো হবেই, তার বাইরেও বেশ কিছু লোক কাজ পাবে। মাঝে মাঝে খুব মজার মজার কথা বলেন ভদ্রলোক। কলোনীতে পুরো দমে পলিটিক্স চলছে শুনে বলছিলেন, ওটা একটা এপিডেমিক, ঠিক কলেরার মত। খালি পেট পেলেই চেপে ধরে। ও রোগ তাড়াবার প্রথম দাওয়াই হল—পেট ভরে খেতে দেওয়া !"

শম্ভু বলল, পলিটিক্স যারা করছেন তারাও কিন্তু ঐ কথা বলেই ঢুকেছিলেন প্রথমটা—আমরা তোমাদের খেতে দেবো। সরকার দিচ্ছেনা, দেশের ধনদৌলত মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে একদল উপর তলার লোক, তারাও দেবেনা। আমরা দেবো।…আসলে কী দিলেন ? খেতে দেবার নাম করে বাধিয়ে দিলেন খাওয়া খাওয়ি। ছিটে ফোঁটা যারা পেল তারা কোথায় নেমে গেছে ! ছুমুঠো ভাতের বদলে কী না দিয়েছে, দিচ্ছে ! তার কিছু কিছু খবর আপনিও জানেন, তবে সবটা জানেন না। তাই কেউ দিতে চাইলেই ভয় হয়। কে জানে ইনি আবার কোন্ দাম চাইবেন। তবে অভিজিৎ বাবু আছেন এইটুকুই ভরসা।

বলতে বলতে থেমে গেল শম্ভু। তারপর স্বর নামিয়ে অনেকটা যেন আত্মগত ভাবে বলল, এতদিন ধরে দেখলাম মানুষটার প্রাণ আছে। ইচ্ছা ছিল ওঁর আওতায় বসে এমন কিছু করতে পারবো যাতে করে এতগুলো লোক যাহোক একটা বাঁচবার পথ খুঁজে পাবে। হলনা। যাক।… ওখানকার খবর কিছু জানেন ? কী করছে ওরা ?

নীহার বুঝল কলোনীর কথা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছেনা শম্ভু। বলল, এই মাত্তর আপনি যা বললেন, "খাওয়া-খাওয়ি।" প্রথমটা ছিল ঝগড়া বিরোধ, রোখারুখি। কিছুদিন থেকে সেটা লাঠি-শোটা ছোরাছুরিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ আসছে প্রায়ই। তাদের খবর হল, বোমা-টোমার ব্যাপারও শীগগিরই শুরু হবে। ভেতরে-ভেতরে আয়োজন চলছে। তবে এখনো ওরা কিছু ধরতে পারেনি। চেষ্টায় আছে।

"বলেন কী ! শিউরে উঠল শম্ভুচরণ "অ্যাদ্দুরে এগিয়ে গেছে !"

নীহার বলল, সেই জন্যেই সেদিন বলেছিলাম আপনাকে আর ওখানে যেতে হবেনা, কী করবেন গিয়ে? আপনার পথে ওরা চলবেনা।

—কিন্তু জানেন গোটা কয়েক ছেলে এখনো আমাকে চায়। আর কতগুলো পরিবার—শান্ত নিরীহ, কোনো ঝঞ্ঝাটে থাকেনা, একরকম আমার ওপরেই নির্ভর করে ছিল বরাবর। বড় ভালবাসে আমাকে। জানিনা কী করছে এখন, কেমন করে চালাচ্ছে ছেলে পিলে নিয়ে।

বলতে বলতে কণ্ঠ মিলিয়ে গেল। যেন অনেক দূরে চলে গেল শম্ভু। কিছুক্ষণ কোনো সাড়া পাওয়া গেলনা। তারপর আবার শোনা গেল তার মৃদুস্বর—"এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছি। সবাইকে নিয়ে জড়িয়ে না থেকে যারা আমাকে চায় আমারই মুখ চেয়ে বসে ছিল, তাদের নিয়ে সরে গেলেই হত, অকল্যাণ্ডের বাবুরা যা বলেছিলেন। গেলামনা। তখনো পুরো বিশ্বাস ছিল নিজের ওপর, আমার কথা নিশ্চয়ই শুনবে সবাই। সেই গোড়াতে যেমন শুনে এসেছে। এবার বুঝতে পারছি, আসলে সেটা আমার অহংকার। এত করেছি সকলের জন্যে! যে-সে লোক নাকি আমি? আমাকে ঠেলে ফেলে কার সাধ্যি? আরেকটা কথা ভেবেছিলাম বোকার মত, আন্দামানে যাওয়া মানে হেরে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া। ওটা যেন একটা শাস্তি। যারা মারাত্মক অপরাধ করে তারাই তো যায় ওখানে। এইসব বাজে চিন্তা ঢুকেছিল মাথায়। অথচ অনেক সুবিধে দেবে বলেছিল গবর্মেণ্ট। তবু কেমন যেন বাধল।....উদ্বাস্তুর আবার মান!" নিজের মনেই হেসে ফেলল শম্ভু।

ঝি ঢুকল। এক হাতে খাবারের প্লেট আরেক হাতে চা। তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল নীহার। ঝি সেটা লক্ষ্য করে, যেমন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে এমনি ভাবে বলল, রূপা দিদিমণিই নিয়ে আসছিল। তারপর কী মনে করে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আমি পড়তে যাচ্ছি, তুমি এটা চট করে নীচের ঘরে দিয়ে এসো।' ডেকে দেবো?

নীহার একটু চুপ করে থেকে বলল, না, থাক।

ঝি-এর মুখে এই 'রূপা দিদিমণি' শব্দটি কানে যেতে শম্ভু একবার নীহারের দিকে তাকাল। দুচোখ ভরা কৃতজ্ঞতা। এখানে কেবলমাত্র আশ্রয় পায়নি মেয়েটা, তার সঙ্গে পেয়েছে আপনজনের স্বীকৃতি। যেন

এঁদেরই ঘরের মেয়ে সে! এতখানি সে সত্যিই আশা করেনি। এ নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। যাই বলুক, মামুলী উচ্ছ্বাসের মত শোনাবে, অথচ মনের কথাটা অনুক্ত থেকে যাবে। তাই হালকাভাবে শুধু বলল, লেখাপড়া তো ওখানে কিছুই করেনি। মন বসাতে পারছে তো?

—"মনে হয়না"—মৃদু হেসে বলল নীহার।

—"আস্তে আস্তে বসবে। আসলে মেয়েটা বড় বোকা। একটু বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলে বুঝত কত বড় সুযোগ এল ওর জীবনে, বাঁচবার পথ তৈরি হল। আর সেটা হল শুধু আপনার—"

নীহার বাধা দিল,—"আপনার কথা আমি মানতে পারছি না শম্ভুবাবু। বোকা ও মোটেই নয়, আর বাঁচবার পথও সকলের এক হয় না। ও-ও নিশ্চয়ই বাঁচতে চায়, তবে অন্য পথে। সেখানে,"—বলে, একটু থামল, একবার চেয়ে দেখল শম্ভুর দিকে, তারপর শেষ করল, "সেখানে আপনিই ওকে নিয়ে যেতে পারেন।"

"আমি!" শম্ভুর মুখে ফুটে উঠল গভীর বিস্ময়। নীহার তার আগের কথার সূত্র ধরেই বলল, আমি জানি, আপনি অনেকের জন্যে অনেক কিছু করেছেন। তবু বলবো, রূপার মত একটি মেয়েকে সুখী করতে পারা, আপনার অত যেসব বড় বড় ব্যাপার তার কোনটার চেয়ে ছোট নয়, তুচ্ছও নয়। তাতে করে আপনার জীবনের ধারা হয় তো একটু বদলাতে হবে। কিন্তু আপনিও সুখী হবেন।

কথাকটির মধ্যে যে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল শম্ভুর কাছে সেটা আর অস্পষ্ট রইল না। কিছুদিন থেকে রূপার যে হাবভাব ও আচরণ সে লক্ষ্য করেছে কিন্তু ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং বিশেষ করে আজ তাকে যে রূপে দেখল—সব কিছুই একটা অন্য অর্থ নিয়ে দেখা দিল তার সামনে। একেও হেসে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল প্রথমটা, পরক্ষণেই বুঝল তা সম্ভব নয়, নীহার অন্ততঃ একে সে ভাবে দেখছে না, সবটাকেই গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। সুতরাং তাকেও হালকাভাবে নিলে চলবে না। বলল, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি। রূপার জন্যে ভাবি না। ও-যে সত্যিই বোকা তারই প্রমাণ দিয়েছে। নিজের দিকে তাকাচ্ছে না, নিজের অবস্থাও বুঝতে

পারছেনা। এই সামান্য জ্ঞানটাও নেই যে আমরা একটা আলাদা জাত, যার নাম রিফিউজী। কোনো রকমে টিকে থাকাই যাদের সমস্যা। ঘর সংসার বলে আমাদের কিছু নেই, হতে পারে না, আমরা ভেসে এসেছি, ভেসে বেড়াচ্ছি। সুখটুখ আমাদের কাছে বিলাস। তার আশা দূরে থাক স্বপ্ন দেখাও চলে না। এই যে আশ্রয়টুকু ওর কপালে হঠাৎ জুটে গেছে, শুধু কি আশ্রয়? এটা ওর বহু পুণ্যের ফল। অনেক বড় ভাগ্য করে এসেছিল, তাই পেয়েছে। ওর মত আর যারা ওখানে পড়ে আছে, নষ্ট হয়ে, শেষ হয়ে যাচ্ছে তারা তো কিছুই পেলনা। ও অনেক কিছু পেল। আপনি যা দিয়েছেন দিতে চাইছেন, তাই নিয়েই ওর সুখী হওয়া উচিত। একথা সে আজ না হলেও কাল বুঝবে। সেজন্যে আমার ভাবনা নেই। কিন্তু আপনিও যে এতদিন ধরে আমাদের সব কিছু জেনে শুনে, চোখের ওপর যা দেখছেন, আমাদের যেটা বাস্তব অবস্থা, তাকে অস্বীকার করে শুধু একটা মেয়ের খেয়ালকে—

বলে থেমে গেল শম্ভু। যে-শব্দটা মুখে এনেছিল বড় রূঢ় শোনাবে মনে করে বলল না। নীহারই যেন সেটা কেড়ে নিল ওর মুখ থেকে—"প্রশ্রয় দিচ্ছি, এই বলবেন তো? তাই যদি হয় তার কারণ এটা খেয়াল নয়। কী, আপনাকে বোঝাতে পারবো না। শুধু বলতে পারি, এমন কিছু যার চেয়ে বড় মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই।"

ম্যানেজারের সঙ্গে অনেক বার দেখা হয়েছে শম্ভুচরণের, অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে এতখানি দৃঢ়তা সে কোনোদিন দেখেনি। শুধু কথায় নয়, বলায় ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, মুখের এবং চোখের তারায়। শম্ভুর মনে হল, এর পরে আর কোন কথা চলেনা। তবু বলতে হবে। ওঁকে বোঝাতে হবে কী মারাত্মক ভুল করেছেন ইনি....কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল, আপনি যা বুঝেছেন, তার ওপরে আমার কিছু বলতে যাওয়া সাজেনা। সে বিদ্যা বুদ্ধি নেই, স্পর্ধাও নেই। তবু না বলে পারছি না। মেনে নিলাম আপনার কথা সত্যি। তাহলেও আপনি শুধু একটা দিক দেখছেন, আরেকটা দিক, মানে আমার দিকটা দেখছেন না। আমার জীবন, আমার চিন্তা ভাবনা আমার অবস্থা —, সবই তো আপনি জানেন, চোখের ওপর যতটা দেখছেন, তারও আগে ছেলেবেলা থেকে যে

পথে চলেছি, তার কথাও একদিন আপনাকে বলেছিলাম। আপনি কি মনে করেন এ ভার আমি নিতে পারি? নেওয়া উচিত কিনা সে প্রশ্ন না হয় না তুললাম, কিন্তু একি আমার পক্ষে সম্ভব?

'নিশ্চই সম্ভব', সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল নীহার, 'কিন্তু তার জন্যে, একটু আগে যা বলেছিলাম, আপনার জীবনের ধারা হয়তো কিছুটা বদলাতে হবে, নিজের দিকে খানিকটা দৃষ্টি দিতে হবে।'

শম্ভুর মনে পড়ল, এই একই কথা, হয় তো একটু অন্য ভাষায়, সে শুনেছে তার মার আর বসন্তর মুখে। মনে মনে প্রথমটা একটু কৌতুক বোধ করল। তারা মুখ্যু মানুষ, গরীব মানুষ, সংসারের যে বাঁধাধরা সঙ্কীর্ণ পথ তার বাইরে তাদের দৃষ্টি চলেনা। আর ইনি তাদের তুলনায় অনেক বড় —একজন অভিজাত, উদার, বিদূষী মহিলা কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল শম্ভুর, এক জায়গায় ওঁরা এক। তারা এই ছন্ন ছাড়া জীবনটাকে একটা শুভময় সার্থকতার দিকে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু এ ছাড়া কি তার অন্য পথ নেই?

শম্ভুকে নীরবে বসে থাকতে দেখে নীহার মৃদু হেসে তার নিজের কথার রেশ টেনে বলল, আপনি ভাবছেন এতে আপনার হার হবে, আপনার জীবনের যে আদর্শ তার থেকে নেমে যাবেন। তাই না?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই যোগ করল, এখন তার মুখের হাসিটা আর নেই, 'আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, শম্ভুবাবু—অ্যাদ্দিন ধরে এত যে করলেন, কী পেলেন সেখান থেকে? না, এখনই আপনাকে উত্তর দিতে হবে না। শুধু ভেবে দেখবেন।·· ···এ কী! খাবারটা যে তেমনি পড়ে আছে। কথায় কথায় আমারও খেয়াল ছিল না। নিন, মিষ্টি দুটো নিন। চাটা ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে। বদলে দিতে বলছি।

বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল নীহার। ঘরের বাইরে পা দিয়েই বলে উঠল, 'রূপা! এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয় ভেতরে আয়।'

'না না,' বলে ছিটকে সরে গেল রূপা। অশ্রু ভেজা স্বর, দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলধারা। নীহার এগিয়ে গিয়ে কাঁধের উপর হাতখানা রাখতেই ভেঙে পড়ল তার বুকের উপর। কান্নার বেগ চেপে রাখতে চেয়েছিল হয় তো, পারল না।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত এরাস্তায় ওরাস্তায় নিরুদ্দেশ ভাবে ঘুরে

বেড়াল শম্ভুচরণ। কেন, সে নিজেই জানেনা। একটি অবোধ বালিকার চাপা কান্না যেন তাকে দৌড় করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। বাড়ির কাছে আসতে চোখে পড়ল বসন্ত দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে। মনে মনে লজ্জিত হল। সে কোনো প্রশ্ন করবার আগেই বলল, বড্ড দেরি হয়ে গেল। মা কেমন আছে ?

—অনেকটা ভাল। তোমাকে খুঁজছিলেন বারবার।

—জেগে আছে ?

—বোধহয়।

মা আর ও একই ঘরে থাকে। দরজার আড়াল থেকে মুখ বাড়াতেই তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে ঝাঁপিয়ে উঠলেন, 'কোথায় ছিলি এত রাত ?' গজ গজ করে আরো অনেক অনুযোগ অভিযোগ আউড়ে গেলেন। বিষয় সেই এক—ছেলের এই বাউণ্ডুলে জীবন। শম্ভু বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মার রুক্ষ মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, আচ্ছা হয়েছে। এবার একটু ঘুমোও দিকিন।

অনেকটা ঠাণ্ডা হলেন মা। দরজার দিকে চেয়ে চাপা গলায় বললেন, তুই আমায়ে এখান থাইক্যা নিয়ে চল।

—কেন, কী হল ?

—আর কত করবে ওরা ? বৌডার কোলে কচি, তার উপরে এই রুগীর ঝামেলা। পাইর্যা ওঠে না। চোখের উপর ছ্যাখতেছি তো সব।

—আচ্ছা দেখি কী করা যায়।...বলে, শম্ভু আর দাঁড়াল না।

মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে এলেও ঐ কঠিন প্রশ্নটির হাত থেকে পালানো গেল না। প্রায় সারারাত ধরে ঐ একটি কথাই বারংবার বাজতে লাগল তার চেতনার মধ্যে—কী করা যায় ? সেই ছেলেবেলা থেকে তাকে নিয়েই মার সবচেয়ে বড় ভাবনা। বড় ছেলে ছুটো দাঁড়িয়ে গেল, ঐ একটারই শুধু গতি হোল না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। উঠতে বসতে এই কথাই শুনে শুনে এসেছে। তার পর সেদিন সে ঘর'ও ভেঙে গেল, জলজ্যান্ত ছেলেছু'টোকে লাঠির ঘায়ে ছট্‌ফট করে মরে যেতে দেখলেন চোখের উপর, তারপর থেকে মা তাকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন। সে ছাড়া আর কেউ নেই তাঁর কোনোখানে। তাই 'শম্ভুকে' ঘিরেই তাঁর

যা কিছু আশা আকাঙ্খা, ওর কাছেই তাঁর যা কিছু দাবি দাওয়া। সেগুলোও এমন মস্ত কিছু নয়। একটি মাথা গুজবার ঠাঁই, দু বেলা দুটো ভাত আর একটি বউ। কোনোটাই দিতে পারেনি শম্ভু। এদিকে দিনও আর নেই, শূন্য হাতেই তাঁকে চলে যেতে হবে দুনিয়া থেকে।

তারপর ওদিকে—। সেদিনকার সমস্ত সন্ধ্যাটা আবার ভেসে উঠল চোখের উপর। কানে এসে বাজল একজনের দৃঢ় কণ্ঠস্বর—'ও-ও বাঁচতে চায়, তবে অন্য পথে ; সেখানে আপনিই ওকে নিয়ে যেতে পারেন।' তার সঙ্গে শুনতে পেল একটা বোকা মেয়ের চাপা কান্নার সুর।

ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ জেগে উঠে দেখল মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে তৈরী হয়ে নিল। বেরোতে হবে। "কোথায় যাচ্ছ?" জানতে চাইল বসন্ত। ভাবছি একবার 'অকল্যাণ্ড হাউস'এ যাবো। রাস্তায় আর একটা কাজ সেরে নিতে হবে।"

—কলোনীর ব্যাপার? মুখ টিপে হাসল বন্ধু। শম্ভু সে হাসিতে যোগ দিল না। সারা মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া। মিনিট খানেক চুপ করে থেকে মাথা নীচু করে বলল, না! এবারকার ব্যাপার আমার নিজের।

—নিজের! বলকি?

—হ্যাঁ ; দেখি ওদের আন্দামানের স্কিমটা এখনো আছে কিনা।

—আন্দামান যেতে চাও?

—দোষ কি? সমুদ্রের হাওয়ায় মার শরীরটাও সারতে পারে।

—একেবারে দেশ ছেড়ে চলে যাবে।

—'দেশ?' এবার শম্ভুর মুখে হাসির রেখা, 'ভুলে যাচ্ছ, আমরা রিফিউজি, আমাদের দেশ বলে কিছু নেই। দুনিয়ার যেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়বো, সেটাই দেশ।'

মা আজ অনেকটা ভাল। তাঁকে শুধু বলল, একটু আসছি।

—তাড়াতাড়ি আসিস্। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

শম্ভু একটু অবাক হল। বেরোবার সময় এই দুর্গা নাম তো আগে কোনদিন শোনেনি মার মুখে। আজ হঠাৎ কী হল? হয় তো যে কাজ নিয়ে বেরোচ্ছে এটা তার শুভ সূচনা। তাই যেন হয়।

গলি থেকে বড় রাস্তায় পড়তেই চোখে পড়ল কলোনীর দুটি ছেলে হনহন করে এগিয়ে আসছে। বাসাটা ওদের চেনা। আগে এসেছে দুএক বার। তারপর অনেকদিন ওদের দেখতে পায়নি। ছেলেদুটো বরাবরই তার অনুগত। সেই রাতটার কথা মনে পড়ল। কলোনী থেকে অনেকটা দূরে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেছিল একা একা। খেয়াল হয়নি কত রাত হয়ে গেছে। উঠতে যাবে তখন, এদের সঙ্গে দেখা। খুঁজতে বেরিয়েছিল 'শম্ভুদাকে'। আরো কজন ছিল সেই সঙ্গে।

খানিকটা কাছে আসতেই ছেলে দুটির চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে শম্ভুর মনে হল নিশ্চয়ই কোনো গোলমালের খবর আছে। জিজ্ঞাসা করতেই জানা গেল। ওরা বলল, মিস্তিরি কাকাকে ওরা মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে, শম্ভুদা।

—বল কি! কেন?

—দুজন ছোরা বানিয়ে দিতে বলেছিল। উনি রাজী হন নি।

শম্ভুর মুখে হঠাৎ কোন কথা সরলনা। অতি নিরীহ নির্বিরোধ মানুষ এই মিস্ত্রী। নিজের কাজ নিয়ে থাকে। যা ভালো মনে করে বলতে ভয় পায় না। শম্ভু যখন ওখানে ছিল, অনেক সাহায্য করেছে তাকে। শম্ভুও ভীষণ শ্রদ্ধা করে মিস্ত্রী কাকাকে। তার উপর এই অযথা অত্যাচারের খবর শুনে শম্ভু আর স্থির থাকতে পারল না। বলল, চল তো।

স্টেশনে নেমে রিকসা করতে গেলে রিকসাওয়ালারা বলল, কলোনী পর্যন্ত যেতে পারবোনা। ওখানে খুব গোলমাল। মারামারী করছে রিফিউজীরা। দুগাড়ি পুলিশ গেল এই মাত্তর। খানিকটা দূরে একটা মোড়ের নাম করল। সেই পর্যন্ত যেতে পারে। অগত্যা তাতেই রাজী হল শম্ভু। যতটা তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। মোড়ে নেমে ছুটতে শুরু করল তিনজনে। প্রায় কাছাকাছি যেতেই কানে গেল কাঁদানো গ্যাস ছোঁড়ার এবং তার পিঠ পিঠ বোমার শব্দ। শম্ভু চমকে উঠল—'একি! বোমা ছুঁড়ছে কারা?' আর কারা?' বলল একটি ছেলে, 'সতীশদের পার্টি।'

সতীশ এবং তার দলবল শম্ভুর বিলক্ষণ চেনা। সে জানত, বেশ কিছুদিন থেকেই ওরা রাত্রে বেরিয়ে যায়, ছুরি দেখিয়ে ঘড়িটা পার্সটা ছিনিয়ে নেয়, পথচারীদের কাছ থেকে; তেমন সুবিধা পেলে মেয়েদের গয়নাও। ইদানিং রেলের ওয়াগন ভেঙে মালপত্র সরাবার চেষ্টাও করছিল, শোনা গেছে। শম্ভু

ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে কখনো ভয় দেখিয়ে পথে আনবার চেষ্টা করছিল। এগিয়েও ছিল খানিকটা। ঠিক তখনই দাদারা আসতে শুরু করলেন। ওরাও পলিটিক্যাল পার্টির ভদ্র বেশ পরে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠল। জোর জুলুমটা আগে ছিল গোপনে আড়ালে। এবারে সেটা প্রকাশ্য রূপ নিল। শম্ভুকে হটে আসতে হল। তখন ওদের হাতিয়ার ছিল লাঠি-শোটা ছোরা, ছুরি। এবার যখন বোমাতে প্রমোশন পেয়েছে তখন আর ভরসা নেই। শুধু ওরা নয় গোটা কলোনীটাই পুলিশের খপ্পরে-গিয়ে পড়বে, সেই চরম পরিণাম স্পষ্ট দেখতে পেল শম্ভু।

আরো কাছে গিয়ে দেখল, যা ভেবেছিল ঠিক তাই। একদল পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে ভিড় হটিয়ে দিচ্ছে। আরেক দল বেপরোয়া লাঠি চালাচ্ছে, সামনে যা কিছু পাচ্ছে তার ওপর— মানুষ জন, টিন টালি, বেড়া গোড়া, হাঁড়ি কলসি সব। এত কষ্টে এতদিন ধরে কোনো রকমে মাথা বাঁচাবার মত যে কুঁড়েগুলো ওরা খাড়া করেছিল সব একধার থেকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।

শম্ভু ছুটে গেল তাদের সামনে। দু হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "একী করছেন আপনারা? এরা তো কোনো দোষ করেনি। এদের— ।" কথাটা শেষ হলনা। একটা উদ্যত লাঠি সোজা এসে পড়ল তার হাতের উপর। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ধাক্কা। শম্ভু ছিটকে গিয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে। তখনো দূর থেকে দু একটা বোমা এসে পড়ছে। লক্ষ্য পুলিশ। তারা আরো ক্ষেপে গিয়ে লাঠি আর টিয়ারগ্যাস চালাচ্ছে।

শম্ভু কোনো রকমে উঠে দাঁড়াল। বুঝল এদের থামানো যাবে না। ওদিক থেকে বোমা আসছে আর এরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, সেটা আশা করাও যায়না। হয়তো এবার গুলি চালাবে। থামাতে হবে ওদের, ঐ সতীশ আর তার গুণ্ডাদের, গাধার মত যারা পটকা ছুঁড়ছে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে। কী লাভ হচ্ছে? শুধু তার এই নিরীহ নিরপরাধ অসহায় লোকগুলোকে একপাল নেকড়ের মুখে এগিয়ে দেওয়া। এদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েছেলে আর শিশু। তারা কাঁদছে। হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—শম্ভু আইছে, আমাগো শম্ভু। আরেকটা গলা শোনা গেল—শম্ভু, আমাগো বাঁচাও।

শম্ভু এগিয়ে চলল যেখান থেকে বোমা আসছিল সেই দিকপানে। যে ছেলে দুটো ওকে খবর দিতে গিয়েছিল তার মধ্যে একজনের নজর পড়ল তার উপর। সে চেঁচিয়ে উঠল, ওদিকে যাবেন না শম্ভুদা। ওরা বোমা মারছে। শম্ভু শুনতে পেল, কিন্তু কানে তুলল না। ভাঙাচোরা টালিটিনের ভিতর দিয়ে পথ করে করে ছুটে চলল, যতটা জোরে ছোটা যায়। খানিকটা যেতেই একটা বোমা এসে ফাটল একটু দূরে তার বাঁ পাশটায়। গোটা কয়েক টুকরো পায়ে গিয়ে বিঁধিল। তবু থামল না। তারপর আরেকটা। আর এগোতে পারলনা।

প্রথমটা যখন গোলমাল চেঁচামিচি শুরু হয়, বৌরানীর কানে গিয়েছিল। গা করেননি। ওতো লেগেই আছে। মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলেন—খালি দলাদলি আর মারামারি। ঐ করেই মরবে লক্ষ্মীছাড়াগুলো। অভিজিৎ নেই। সকালে উঠেই কোলকাতা গেছে। মাস্টার মশায়ের ছেলের বন্ধু সেই এঞ্জিনিয়র ছেলেটিও আছে তার সঙ্গে। কী সব কাজ আছে সরকারী দপ্তরে। নীহার বাড়ি থেকে সোজা সেখানে চলে যাবে। কনফারেন্স না কী আছে। কাগজপত্তর নিয়ে তারও থাকা দরকার। এসব অভিজিৎ কাল রাত্রেই বলে রেখেছে তাঁকে। দুপুরের খাওয়াটা ওখানেই সেরে নেবে তাও জানিয়েছে। আগে হলে বৌরানী ঐ ব্যাপারে হয়তো আপত্তি তুলতেন। কাল শুধু ঘাড় নেড়ে বলেছেন আচ্ছা। কিছুদিন থেকে তিনি প্রায় সব ব্যাপারেই কেমন নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। সংসারের কোনো কিছুতে জড়াতে চাননা। যেটুকু না করলে নয়, মুখবুজে করে যান। বেশির ভাগ সময় কি যেন ভাবছেন মনে হয়। অভিজিৎ লক্ষ্য করেছে। কিন্তু ও নিয়ে কোনো কথা হয়নি। সেও ভীষণ ব্যস্ত। আপাততঃ এ অঞ্চলে ব্যাপক আখের চাষের একটা প্ল্যান নিয়ে প্রদীপের সঙ্গে আলোচনা চলছে। জমি সংগ্রহ, অর্থ-সংস্থান এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই কৃষ্ণনগর ও কোলকাতায় ছুটোছুটি করতে হয়।

কলোনীর গণ্ডগোল ক্রমশঃ বাড়ছিল। হঠাৎ টিয়ার গ্যাস ছোড়ার শব্দ পেলেন বৌরানী। এ জিনিসটার সঙ্গে এর আগেই পরিচয় হয়ে গেছে। ঝি-চাকরদের ডেকে দরজা জানলা বন্ধ করতে বলে দিলেন। দম আটকানো গন্ধটা উপরেও ধাওয়া করে। একটু পরেই হলধর এসে বলল, আজ খুব

জোর লাগবে মনে হচ্ছে। ওদিকে ওরা শুনছি বোমা টোমা নিয়ে তৈরী হয়ে আছে।

বৌরানী এ খবরে বিশেষ উৎসাহ দেখালেননা। শুধু বললেন, আমাদের কেউ যেন দেউড়ির বাইরে না যায়। সদর বন্ধ আছে তো?

"আছে।" বলেই হলধর আবার নীচে চলে গেল।

হলধর মিথ্যা বলেনি। টিয়ার গ্যাস্-এর সঙ্গে কয়েকটা বোমার আওয়াজও কানে এল বৌরানীর। মাঝের মহলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন বড় বড় লাঠি দিয়ে ওদের চালাগুলো ভেঙে দিচ্ছে পুলিশের লোক। কান্নাকাটি চেঁচামিচিতে কানে তালা লেগে যায়। হঠাৎ চোখে পড়ল, একদল লোক এই দিকেই ছুটতে ছুটতে আসছে। বেশির ভাগই মেয়েমানুষ কাচ্চাবাচ্চা। দেউড়ির সামনে এসে তারা জড় হল। তাদের গলাও শুনতে পেলেন—বাবু, বাবু, ম্যানেজার দিদিমণি......। তাঁর দিকেও কারো কারো দৃষ্টি পড়ল। হাত জোড় করে বলল, আমাগো বাঁচান রানীমা। সব মাইরা ফ্যাল্ল।

বৌরানী চিৎকার করে ডাকলেন,—দারোয়ান। কেউ সাড়া দিল না। হঠাৎ বোধহয় খেয়াল হল এতদূর থেকে দারোয়ান তাঁর গলা শুনতে পাবেনা। তখন ছুটে চললেন সদর মহলে। এবার ডাকতেই সাড়া পেলেন। বললেন, ফটক খোল দেও।

হয়তো অত লোক দেখে একটু ইতস্তত: করছিল দারোয়ান।

বৌরানী গলা চড়ালেন, খুলে দাও।

খোলা দরজা দিয়ে পিল পিল করে ঢুকে পড়ল অনেক মানুষ—নানা বয়সী নরনারী। শিশুগুলো উলঙ্গ। বাকীদের পরণেও জামা বলে কিছু নেই। ময়লা ধুতি, প্যাণ্ট, শাড়ি ফ্রক। বেশির ভাগ ছেঁড়া। বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে সেগুলো থেকে। বৌরানীর নাকে গেল। তবু তিনি অদূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই মুহূর্তে বোধহয় ভুলে গেলেন, এদের তিনি সেই শুরু থেকে বরাবর এড়িয়ে এসেছেন। বাড়ির সামনে ওদের ঐ নোংরা জীবনযাত্রার দৃশ্যটাও কোনোদিন সইতে পারেননি। আজ ওরা এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তবু সরে গেলেন না।

তখনো লোক আসছে। কাছারিতে যারা ছিল, আমলা কর্মচারী,

সবাইকে ডেকে পাঠালেন। এদের দেখাশুনোর ভার দিলেন তাদের উপর।

দেখতে দেখতে সদর মহলের বিশাল চত্বর ভর্তি হয়ে গেল। আশপাশের বারান্দাগুলোতেও আর জায়গা নেই। ঘরগুলো খুলে দিতে বললেন বৌরানী। বুঝলেন তাতেও কুলোবেনা। উপরের হলঘর খুলতে হবে। হলধরকে খুঁজলেন। তাকে পাওয়া গেল না। তখন নিজেই উপরে চললেন চাবি বের করে দেবার জন্যে।

॥ ১৮ ॥

ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে ফিরবার পথে অভিজিৎ ও প্রদীপ নীহারকে তার বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেল। প্রদীপের গাড়ি। সেই চালাচ্ছিল। স্বরূপকাঁদিতে কিছুদিন থেকে যেতে হবে এবং যে-কাজ হাতে নিয়েছে, তার মধ্যে ঘোরা ফেরার ভাগটাই বেশী। তাই ধানবাদে টেলিগ্রাম করে গাড়িটা আনিয়ে নিয়েছে কদিন আগে।

দোরগোড়ায় নেমে নীহার একটু দাঁড়াল। ভাবল, ওঁদের একবার নামতে বলবে। তার আগেই প্রদীপ বলে উঠল, "আজ এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি আমরা। গিয়েই আবার এইগুলো নিয়ে বসতে হবে তো।" দু চোখের ইঙ্গিতে ফোলিও ব্যাগটা দেখাল, "আরেক দিন আসবো, বসবো এবং চা খাবো। নোটিস দিয়ে গেলাম। নমস্কার"...বলেই অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিল। স্টার্ট্ বন্ধ করেনি, এঞ্জিন চলছিল। মুহূর্ত মধ্যে চোখের আড়ালে গিয়ে পড়ল গাড়িটা। সেই দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইল নীহার। মনে মনে হাসল। ভদ্রলোক যেন একটা ঝড়ো হাওয়া। সব সময়েই ছুটছে। শুধু ছুটছে নয়, যেন টগবগ করে ফুটছে। আর তার পাশের লোকটি? ঠিক উল্টো। শান্ত, ধীর, সংযত, কথায় বার্তায় চালচলনে কোথাও কোনো উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য নেই। মিশেছে বেশ!

দরজা খুলে দিলেন দিদিমা। নীহার ভাবছিল, কোনো দিনই তো সন্ধ্যার আগে আসা হয় না, আজ এত সকাল সকাল এসে পড়েছে! দিদিমাকে বেশ একটা চমক দেওয়া যাবে..."ওমা! এত শীগগির! কোত্থেকে এলি? আফিস পালিয়েছিস বুঝি"—এক গাল খুশি নিয়ে বলে উঠবেন তিনি। তার বদলে একী দেখল সে! সারা মুখে কে যেন একরাশ কালি ঢেলে দিয়েছে! এ রকম একটা শুষ্ক মলিন নির্জীব প্রশান্তি দিদিমার চোখে মুখে আর কখনো দেখেনি নীহার। তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল এবং যে আশঙ্কাটা সকলের আগে মনে এল, সেইটাই

প্রশ্নাকারে ফুটে উঠল তার শুকনো গলায়—কী হয়েছে দিদা? দাত্থ কেমন আছেন?

কদিন থেকে তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। বয়স হয়েছে। দিদিমা ধীর মৃদু স্বরে মাথা নেড়ে বললেন, ভাল আছেন। তারপর জানতে চাইলেন ওখানে যাসনি বুঝি আজ?

—না, এখানকার কাজ সারতেই দেরী হয়ে গেল। ওঁরা আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

—তাহলে ওরাও বোধহয় খবরটা এখনো পায়নি।

—কী খবর?—আরো বেশী উৎকণ্ঠিত হল নীহার।

—ঐ যে ছেলেটি রূপাকে সেদিন দিয়ে গেল, শম্ভু বুঝি ওর নাম?

—হ্যাঁ, কী হয়েছে তার? প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলল নীহার। দিদিমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। একটু সময় নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, সে নেই।

কি রকম একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল নীহারের গলা থেকে। আর কিছু বলতে পারল না। কাছে একটা টুল ছিল, তার উপর বসে পড়ল। দিদিমা বললেন, এই মাত্তর একটি ছেলে এসে বলে গেল। দাঙ্গা বেধেছিল কলোনীতে। ও গিয়েছিল থামাতে। কোত্থেকে একটা বোমা এসে—

—আমি যাবো দিদা?

—তুই আর এখন গিয়ে কী করবি? পৌঁছতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে?

সেটা নীহারও বুঝল। এর পরে গিয়ে আর কী করবে? কীই বা করতে পারে সে? হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, রূপা শুনেছে?

—হ্যাঁ। ছেলেটি যখন এল ও আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।

—কোথায় সে!

—এতক্ষণ তো এখানেই ছিল। ওপরে গেছে বোধহয়।

নীহার ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে গেল। এঘর-ওঘর খুঁজল, কোথাও নেই। ডাকল, সাড়া পেলনা। হঠাৎ দেখতে পেল, পিছনের বারান্দায় একটা আবছায়া অন্ধকারে ঢাকা কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে ডাকতে চোখ তুলল। একটা শূন্য উদাস বিহ্বল দৃষ্টি। একফোঁটা জল নেই

তার মধ্যে। প্রথমটা থমকে গেল নীহার। ভীষণ কান্নাকাটি করছে মেয়েটা, কী বলে, কেমন করে শান্ত করবে—এই ভয় ও ভাবনা নিয়েই ছুটে এসেছিল। এমনটা সে ধারণা করেনি। পরমুহূর্তেই বুঝল, এর চেয়ে সেইটাই ভাল হত ওর পক্ষে। কিছুক্ষণ হাউ হাউ করে কাঁদতে পারলে কিছুটা হালকা হতে পারত। কিন্তু যে শোক পাথরের মত বুকে চেপে বসে, চোখের জলটুকু পর্যন্ত ঝরতে দেয় না, তাকেই ভয় বেশী। এই মুহূর্তে তারই দুর্বিষহ ভার ওর ঐ ছোট্ট বুকখানা ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। এ শোকের কোনো সান্ত্বনা নেই।

নীহারকে দেখে বারান্দার কোণ থেকে সরে এল রূপা। হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিয়ে নিল, যেমন রোজ নেয়, 'দিদিমণি' যখন আফিস থেকে ফেরে। অন্য দিন ছুটে গিয়ে সেটা রেখে আসে তার ঘরে যেখানে রাখবার, আজ গেল ধীর পায়ে, মাথা নীচু করে। নীহারও গেল তার সঙ্গে। ব্যাগ রেখে চটি জোড়া এনে রাখল ওর সামনে। চোখ তুলে বোধহয় বলতে চাইছিল, জুতোটা ছাড়, পারল না, গলায় স্বর ফুটল না। নীহারও এ দৃশ্য আর দেখতে পারছিল না। 'রূপা'! বলে দুহাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। ওঁর কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রূপা। এতক্ষণে পাষাণ গলল। বাঁধভাঙা বন্যার মত দুচোখ বেয়ে নেমে এল জলধারা।

সন্ধ্যা এল। সেই সঙ্গে সারা বাড়িটায় ঘন হয়ে এল একটি পরিম্লান শোকের ছায়া। সকলের মনের মধ্যেই একটি নির্বাক বেদনার সুর। অথচ যে গেল সে এঁদের কেউ নয়। দিদিমার সঙ্গে তার একটি দিনের দেখা, সামান্য দুচারটি কথা। দাদামশাই তো তাকে একবারও চোখে দেখেননি। নামটা হয়তো শুনেছেন নাতনীর মুখে, সেই সঙ্গে এক-আধটু পরিচয়। নীহারের কথা অবশ্য আলাদা। দীর্ঘ দিন ধরে দেখেছে মানুষটিকে—যে কোনোদিন নিজের কথা ভাবলনা, সারাজীবন পরের দায় ঘাড়ে নিয়ে বেড়াল আর সেই ভার বইতে গিয়েই অপঘাতে প্রাণ দিল। কারো মানা মানলনা। নীহারকে সে মানত। একজন উদ্বাস্তু কলোনীর মুখপাত্র আরেকজন সেই কলোনী-মালিকের ম্যানেজার কেবলমাত্র এই টুকুই তো তাদের সম্পর্ক নয়। এর বাইরে আরো কিছু ছিল যা নীহার অনেকদিন লক্ষ করেছে ওর চোখে, ওর কথায়-বার্তায় আচরণে এবং যার জোরে সেও একদিন জোরদিয়ে বলতে পেরেছিল,

না ওখানে আপনাকে যেতে হবে না। কিন্তু সে জোর টিকলনা। নীহারের কথাও সে শুনলনা!

রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বভাবতই যখন এই কথাগুলো এবং এমনি ধারা অনেক ছবি মনের মধ্যে ভিড় করে আসছিল, তার সঙ্গে একটু ক্ষোভ কিংবা অভিমান হয় তো জড়িয়ে ছিল। তার পরেই যেন বিদ্যুতের ঘা খেয়ে সজাগ হয়ে উঠল নীহার। চোখ পড়ল মেঝের উপর। তার খাট থেকে হাত দুয়েক দূরে ওপাশে কাত হয়ে চুপ করে পড়ে আছে রূপা। হাঁটু দুটো মুড়ে বুকের কাছ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। ঘুমোয়নি, কিন্তু জেগে আছে, তাও সে জানতে দিতে চায় না। নীহার তো জানে ও ঘুমোতে পারেনা। ওর ঐ সদ্য ফুটে ওঠা অবুঝ হৃদয়টুকু এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। জীবনের ও কীই বা জানে, কতটুকু দেখেছে! যতটুকু দেখতে পাচ্ছে এই মৃত্যু তার সবখানি জুড়ে রেখে গেল এক গভীর শূন্যতা।

তবু তার মধ্যে ধরবার মত হয়তো কিছু পেত, আজ না হয় কাল, যদি জানত ওর ঐ ভীরু, ত্রস্ত, উন্মুখ মন যেদিকে হাত বাড়িয়েছিল সেখান থেকে কিছু সাড়া মিলেছে, একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হয়নি। সেই সান্ত্বনাটুকু সম্বল করে উঠে দাঁড়াতে পারত। তাও জুটলনা ওর কপালে। সেদিন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে যা শুনেছিল তার সব কিছু হয় তো বুঝতে পারেনি। কিন্তু ওর যেটুকু জানবার তা জেনে গেছে। তার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা ছিলনা। হয়তো সেইটাই শেষ কথা নয়। নীহার অন্ততঃ তাই আশা করেছিল। শম্ভুর ভিতরে একটা লড়াই চলছিল। যে পথ ধরে চলেছি, এতদিন চলে এলাম, তাকেই আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকবো? না, সংসারের অন্য দশ জন মানুষ যে পথে চলে, চিরাচরিত সাধারণ জীবন যাত্রা, সেই দিকে পা বাড়াবো?—এই প্রশ্ন তার মনেও দেখা দিয়েছে, বুঝতে পারছিল নীহার। তার মীমাংসায় সময় লাগবে। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

সে সময় আর পাওয়া গেল না। সে অপেক্ষার প্রয়োজন রাত না পোহাতেই ফুরিয়ে গেল।

জ্যোৎস্না রাত। ঘরের মধ্যেও তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। মৃদু আবছা আলোয় রূপার সেই একই ভাবে পড়ে থাকা নিশ্চল দেহখানার দিকে

আরেকবার চেয়ে দেখল নীহার। ভাবল, ডেকে বলবে, আয়, আমার কাছে এসে শো। তারপর মনে হল, থাক, ও নিজের ভিতরে নিমগ্ন হয়ে আছে, সেই ভাল। সুগভীর বেদনাকে ধারণ ও লালন করবার জন্যে মনের চারিদিকে খানিকটা অবকাশ প্রয়োজন।

রূপার কথা ভাবতে ভাবতে নিজের জীবনের একটা পুরনো পরিচ্ছেদ, যাকে সে মাঝে মাঝে খুলতে গিয়েও তখনই বন্ধ করে দিয়েছে, আবার এসে দাঁড়াল তার সামনে। কেন, আজকের এই ভাবনার সঙ্গে কোথায় তার যোগসূত্র ; নীহার জানেনা। তবু সে এল। কিন্তু আজ আর তাকে দুহাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল না। একটি একটি করে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগল।

নোয়াখালি জিলার একটা বড় মহকুমা সহরে উকিল ছিলেন তার বাবা। সেরা উকিল, লীডার অব্ দি বার। প্রচুর আয়। সুখী সচ্ছল সংসার। বেশির ভাগ মক্কেল মুসলমান। তার মধ্যে শাঁসালো লোকও কম নয়। তারা যেমন ওঁকে বড় উকিল বলে মানে, খাতির করে, সম্মান দেয়, তেমনি মানুষ হিসাবেও শ্রদ্ধা করে, অনেকে ভালও বাসে। সম্পর্কটা দুতরফেই একাধারে স্বার্থের ও সৌহার্দ্যের। একটা দুঃখের উৎস বাড়ির বড় ছেলে, একমাত্র ছেলেও বটে। কোলকাতায় থেকে পড়ত। এম. এ. পাশ করল প্রেসিডেন্সি থেকে, ইউনিভার্সিটি থেকে ল। তার তিনটেতেই ফার্স্ট ক্লাশ। সঙ্গে সঙ্গে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন বাপ। ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসবে। বসবে কোলকাতা হাইকোর্টে। তিনিই দাঁড় করিয়ে দেবেন। গোটা প্ল্যানটা ছকে আঁকা। কিন্তু ছকেই রয়ে গেল। ছেলে ফিরল না। একটা কি চাকরি জুটিয়ে নিয়ে বিয়ে থা করে ওখানেই রয়ে গেল।

ললিতবাবু প্রচণ্ড আঘাত পেলেন, কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ পেলনা। স্ত্রীর সে জোর নেই, একেবারে মুষড়ে পড়লেন। ললিতবাবু বললেন, কিছু ভেবোনা। ছেলে গ্যাছে যাক ; মেয়ে তো আছে। ওকেই আমি ছেলের মত করে মানুষ করবো।

যে কথা সেই কাজ। স্কুলের পড়া শেষ হলে নীহারকে পাঠালেন কোলকাতায়। বেথুনে পড়ে, থাকে হষ্টেলে। বি.এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এল। পাশ তো করবেই এবং ভাল ভাবেই করবে। তারপর ফিরে গিয়ে

এক সঙ্গে এম.এ আর ল ; ব্যারিষ্টার না হোক আড্‌ভোকেট হয়ে ঢুকবে হাইকোর্টে। ছেলেকে দিয়ে যে সাধ মেটাতে পারেননি, মেয়েকে দিয়ে মেটাবেন। মেয়েও সে দিকে সজাগ। বাবার ইচ্ছাকে সার্থক রূপ দেওয়াই তার একমাত্র পণ ও সাধনা।

এদিকে এই কটা বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে, বাংলার পলিটিক্যাল চেহারা অনেক বদলে গেছে। তার চেয়েও বেশী বদলেছে ললিতবাবুর চারিদিকের মানুষগুলো। এখনও তিনি তাদের হয়ে মামলা করেন। তারা আসে যায়। সম্পর্ক আছে কিন্তু ঐ পর্যন্ত তার সীমা। অর্থাৎ আগে যেটা ছিল স্বার্থের ও সৌহার্দ্যের এখন সেটা শুধু স্বার্থের। সৌহার্দ্য, সহানুভূতি—সহমর্মিতা—সব যেন উবে গেছে ; তার জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ।

তখন ব্রিটিশ রাজত্ব চলছে, কিন্তু ক্ষমতায় আসীন মুসলিম লীগ, যাদের মতে মুসলিম একটা আলাদা নেশন এবং নন-মুসলিম্ তাদের 'দুষমন'। হোক না সে লোকগুলো বহু পুরুষের প্রতিবেশী, থাক না তাদের সঙ্গে বহু শতাব্দির অচ্ছেদ্য বন্ধন—ভাষার, সংস্কৃতির, ইতিহাসের, চিন্তাধারার—তবু যেহেতু তারা বিধর্মী, কাফের, অতএব অবাঞ্ছিত বিদেশী। ওখানে তাদের স্থান নেই। এই প্রচার চলছে প্রকাশ্যে, ব্যাপক ভাবে এবং অব্যাহত ধারায়! চালাচ্ছে একদল লোক, যাদের বেশির ভাগ বাইরে থেকে আমদানী। পিছনে রয়েছে সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব। তার প্রেরণাও বাইরের।

সংসারে যত রকম উন্মাদনা আছে, তার মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক বোধহয় ধর্মীয় উন্মাদনা। মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার সব চেয়ে সহজ ও সফল অস্ত্র ধর্মের দোহাই। বিশেষ করে যে মানুষ সরল, অল্পবুদ্ধি, ভাবপ্রবণ। স্থানীয় মুসলমান সমাজে তাদের সংখ্যাই বেশী। একটু উপর স্তরের যারা তাদের মধ্যেও বুদ্ধিভ্রংশ সঞ্চারিত হল। ফল যা ফলল, আজও নীহারের চোখের উপর ভাসছে। একদল মানুষের ধন মান প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। কী তাদের অপরাধ? তারা সংখ্যায় কম এবং ধর্মে আলাদা।

ললিত চ্যাটার্জির বিশ্বস্ত মুহুরি ছিল ইব্রাহিম। পনের বছর কাজ করছে তাঁর সেরেস্তায়। ঘরের লোকের চেয়েও বেশী। একদিন গোপন

খবর নিয়ে এল, এবার তার মনিবের পালা। ছ'এক দিনের মধ্যেই গুণ্ডারা তার বাড়ি চড়াও করবে। তারই ব্যাপক আয়োজন চলছে। খুনজখম, লুঠপাট, ঘরে আগুন—এসব তো ওদের বাঁধা রুটিন। ওখানে আরেকটা বিশেষ লক্ষ্য আছে, জানাল ইব্রাহিম,—'খুকু দিদিমনি! ওকে অন্ততঃ সরাতেই হবে।' ললিতবাবু এবং তার স্ত্রী ছজনেই সে বিষয়ে একমত। কিন্তু সরানো হবে কোথায়? কোলকাতায় পাঠাবার সময়ই নেই। তাছাড়া ওরা সেদিকে নজর রাখছে। আত্মীয়স্বজন ঐ সহরে এবং কাছাকাছি যারা আছে, তাদেরও একই অবস্থা। বরং ওঁদের চেয়ে আরো খারাপ। তারা আরো অসহায়।

ইব্রাহিম খানিকটা ভেবে নিয়ে বলল, যদি হুকুম করেন, আমি নিয়ে রাখতে পারি আমার বাড়িতে। কেউ জানবেনা।

এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কি আছে?

ইব্রাহিম তো তাঁদের পর নয়। বাড়িতে তার বিবি আছে, ছেলেমেয়ে আছে, আর আছে একটি ভাগনে, গরিবের ছেলে, ওখানে থেকে কলেজে পড়ে। ছেলেটি বড় ভালো। ললিতবাবু এবং তাঁর স্ত্রী তাকে কতবার দেখেছেন ওদের বাড়িতে। নীহারও দেখেছে। নিরীহ, গোবেচারা, তেমনি লাজুক। যতবার এসেছে, কখনো চোখ তুলে তাকায়নি ওর দিকে।

দেখে ওর ভারী মজা লাগত।

এই বিপদে বাবা মাকে ফেলে নীহার যেতে রাজী হয়নি। কিন্তু বাবা যখন জোর দিয়ে বললেন, তখন তার 'না' বলবার উপায় রইল না। সেই দিনই রাত্রির অন্ধকারে চলে গেল ইব্রাহিমের সঙ্গে। তার আগে জিলা কর্তৃপক্ষের উঁচুমহলে ঘুরে এসেছিলেন ললিতবাবু। মৌখিক ভরসাও পেয়েছিলেন। কিন্তু তার উপরে খুব একটা নির্ভর করতে পারেননি। জানতেন এবং প্রমাণও পেয়েছিলেন, সে সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকে বসে আছে।

আরো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল ঐ রাতেই, নীহার চলে যাবার ঘণ্টা খানেক পরে। একটা বিশাল ক্ষিপ্ত জনতা যখন লাঠি, বর্শা, তলোয়ার বন্দুক আর পেট্রলের টিন নিয়ে তাঁর বাড়িটাকে ঘিরে ধরল তখন চারিদিকে তাকিয়ে প্রতিশ্রুত সরকারী সাহায্যের চিহ্নমাত্রও দেখতে পাননি। নিজের বন্দুক ছিল। তার সদ্ব্যবহারও করেছিলেন। গুলি যখন ফুরিয়ে আসছে এবং ওদিকে

সদর দরজা ভেঙে পড়ার শব্দ কানে এল, হঠাৎ নজরে পড়ল স্ত্রী পাশে নেই। ছিটকে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। দেখলেন তিনি ছুটে চলেছেন উঠোনের ওদিকটায়। একবার তাকালেন স্বামীর দিকে। কী ছিল সেই চোখে? বুঝতে পারলেন না ললিতবাবু। চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় যাচ্ছ? সাড়া পেলেন না। ঠিক সেই মুহূর্তে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঢুকে পড়েছে একপাল লোক। সেই আলোতে দেখলেন, ওখানকার খোলা ইন্দারাটা নিয়ে যার হুঁশিয়ারির অন্ত ছিল না, সেই মানুষটি আজ নিজে লাফিয়ে উঠল তার পাড়ের উপর এবং চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ললিতবাবু ছুটে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। পা বাড়াতেই কি যেন একটা পড়ল এসে তার মাথার উপর। তারপর আর কিছু দেখতে পেলেন না।

ইব্রাহিমের বাড়ি খুব বেশী দূরে নয়। সেখানে বসে বহু লোকের পৈশাচিক চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল নীহার। বুঝতে পাচ্ছিল তাদের বাড়ি এবং তার আশ পাশ থেকে আসছে সেটা! একটা নিস্ফল ক্ষোভে রোষে নৈরাশ্যে ছটফট করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

যে ঘরে বসে ছিল সেটা ভিতরের দিকে, উঠোনের একটা কোণে। দরজাটা যাবার সময় টেনে দিয়ে গেছে ইব্রাহিম। বলেছে 'এখানে বসে থাকো। কোনো ভয় নেই।' তারপর আর কাউকে দেখতে পায়নি। একটা আলোও কেউ দিয়ে যায়নি। বাড়ির লোকগুলোই বা কোথায় গেল?

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। ওদিকের গোলমালটা আর শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ দরজা খুলে গেল। অন্ধকারে চমকে উঠল প্রথমটা। তারপর ভরসা গেল। আর কেউ নয়, ইব্রাহিম। তাড়াতাড়ি উঠে এসে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল, কোনো খবর পেলেন? বাবা-মা—। বাকীটা আর বলা হল না। ইব্রাহিম—হ্যাঁ, পনর বছর ধরে যে ওদের অন্নে প্রতিপালিত, এতটুকু থেকে যাকে দেখে এসেছে, চাচা বলে ডাকে এবং তাই বলে জানে, —সেই ইব্রাহিম হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। যে ছোট তক্তপোষটায় সে এতক্ষণ বসে ছিল তারই উপর নিয়ে ফেলল।

হতভম্ব হয়ে গেল নীহার। আক্রমণটা এমন আচমকা, এমন অভাবনীয়, এমন অসম্ভব যে মাথার ভিতরটা একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেল।

একটু সংবিৎ ফিরে আসতেই চেঁচাতে চেষ্টা করল। পারল না, গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চেঁচাবার উপায়ও ছিল না। একটা মোটা কর্কশ শক্ত হাত তার মুখ চেপে ধরেছে। হাতে পায়েও কোনো জোর নেই। সমস্ত অঙ্গ যেন অসাড় পঙ্গু হয়ে গেছে। চেতনা হারায় নি। এটা বুঝতে পারছিল, এই মুহূর্তে তার চরম সর্বনাশ ঘটতে চলেছে, এবং সেটা যেন অপরিহার্য অবধারিত। তাকে রোধ করবার কোন উপায় নেই। বাধা দেবার চেষ্টা করবে সে মনোবলটুকুও সে নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না।

পরমুহূর্তে যা ঘটল, তাও অবিশ্বাস্য। আরেকজন কে যেন ছুটে এসে ঢুকল। এসেই দুহাত দিয়ে টেনে তুলল লোকটাকে এবং ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মেঝের উপর। বাইরে থেকে যে-সামান্য আলো এসে পড়েছিল তাতেই দেখা গেল সে তখনই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপরেই লাঠিরমত একটা কি তার মাথার উপর গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে 'উঃ' বলে বসে পড়ল।

যে এসেছিল সে এবার এগিয়ে এসে তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় বলল, 'চলে আসুন। শীগগির। এখখনি।' নীহার চিনল। জলিল, ইব্রাহিমের বাড়িতে থাকে, তার আশ্রিত, আত্মীয়, সেই নিরীহ মুখচোরা ছেলেটা। কতবার গেছে ওদের বাড়ি, কোনোদিন ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় নি, কথা বলা তো দূরের কথা। কয়েক সেকেণ্ড সময় গেল বুঝতে এবং বিস্ময়ের ঘোর কাটতে। তারপর কোত্থেকে যেন অনেক বল ফিরে এল তার নির্জীব, নিঃসাড় দেহে। তারই মধ্যে আরেকবার তাড়া দিল জলিল, "উঠুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

উঠে পড়ল নীহার। জামা-কাপড় আলু-থালু, চুল খুলে গেছে। সেই ভাবেই বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। জলিল তৎক্ষণাৎ কপাটের মাথায় শিকল তুলে দিয়ে বলল, আসুন। বলেই চলতে আরম্ভ করল। নীহার কোনো প্রশ্ন করল না। জানতে চাইল না কোথায় যেতে হবে। শাড়িটা ঠিক করে চুলগুলো কোনো রকমে জড়িয়ে নিতে নিতে তার অনুসরণ করল।

রাস্তায় পড়ে আর কোনো কথা হলনা। মাঝে মাঝে নীহার যখন পিছিয়ে পড়ছিল, জলিল দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, ও কাছাকাছি এলে আবার এগিয়ে চলছিল।

তখন কত রাত কে জানে? রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। দুদিকের বাড়িঘর দোকানপাট সব বন্ধ। ওদের নিজেদের পায়ের শব্দ, আর দু-একটা রাস্তার কুকুরের ডাক ; এছাড়া কোনো শব্দও নেই।

অনেকক্ষণ চলবার পর ওরা একটা নদীরঘাটে এসে পৌঁছল। জায়গাটা নীহার ঠাহর করতে পারলনা। কখনো সেখানে এসেছে বলেও মনে হলনা। সামনে সারি সারি কয়েকখানা নৌকো বাঁধা। জলিল ওকে দাঁড়াতে বলে তারই একটার দিকে এগিয়ে গেল। কাকে যেন ডাকল কয়েকবার। একজন লোক বেরিয়ে এল ছইএর ভিতর থেকে। মিনিট কয়েক কি কথা হল দুজনে। নীহার তখন আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বসে পড়েছে একটা গাছের গুঁড়ির উপর। জলিল ফিরে এসে বলল, আসুন। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' নৌকোর দিকে যেতে যেতে জানতে চাইল নীহার। জলিলের কাছ থেকে স্পষ্ট কোনো জবাব পাওয়া গেলনা। জলে নেমে নৌকোটা আরো খানিকটা পাড়ের কাছে টেনে এনে বলল, উঠুন, বলছি।

নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। ছই-এর ভিতরে নীহার। জলিল গিয়ে বসল বাইরে, মাঝির ঠিক সামনে। দুজনে মৃদুস্বরে কথাবার্তা চলছিল। কী বলছে নীহার ঠিক শুনতে না পেলেও আন্দাজ করল, ওর সম্বন্ধেই ওদের মধ্যে কোনো পরামর্শ চলছে। দু-একবার কানে গেল। মাঝি ওকে 'তুই' বলে অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলছে। নিশ্চয়ই খুব জানাশুনো, হয়তো ওর আত্মীয়।

কিছুক্ষণ বসে থেকে নীহার পাটাতনের উপর গা এলিয়ে দিল। আর পারছিলনা। পরপর এতগুলো ধকল—বাবা মার কী হল, সেই ভাবনা, কিছুক্ষণ আগে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল ওর শরীর ও মনের উপর দিয়ে, তার সঙ্গে এই পথশ্রমের ক্লান্তি ও অবসাদ—সব মিলে তাকে অবশ, আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। একবার ভাবল জলিলকে ডেকে আবার জিজ্ঞেস করে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে। তারপর মনে হল, ওই হয়তো জানেনা, কিংবা ঠিক করতে পারেনি। তাহলে নিশ্চয়ই বলত এতক্ষণ। তাছাড়া, কথা বলবার মত শক্তিও তার ছিলনা।

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে গভীর শ্রান্তিতে কখন যে দুচোখ জুড়ে এল, জানতে পারেনি।

ঘুমের ঘোরেই কার ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল ছইএর বাইরে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে কী যেন বলছে জলিল। চারদিকে ঝলমল করছে রোদ। 'ঈস, এত বেলা হয়ে গেছে!'—বলতে বলতে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ছই ধরে। কোথায় এসে যেন লেগেছে নৌকোটা। এপাশে ওপাশে আরো কতগুলো নৌকো। তার মধ্যে ঠাসা লোক—মেয়ে পুরুষ, বাচ্চা, কাচ্চা। জিনিসপত্রও আছে কিছু। অনেকটা যেন আপনমনে বলল, এ কোথায় এলাম! জলিল সে কথার জবাব দিলনা। বলল, এরা সব চলে যাচ্ছে। চাঁদপুরে গিয়ে গোয়ালন্দের জাহাজ ধরবে। এক্ষণি ছাড়বে নৌকোগুলো।

নীহার বুঝল কারা এরা। দেশ ছেড়ে সব কিছু ফেলে প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন থেকেই শুরু হয়েছে এই চলে যাবার পালা। সে জানে। জলিলের মুখের দিকে তাকাল; মনে হল, একটা কি যেন বলতে গিয়ে সে ইতস্ততঃ করছে। নীহার বুঝতে পারল, কী সে বলতে চায়। আগের কথাতেই তার ইঙ্গিত ছিল। তাকেও তখনি চলে যেতে হবে। কিন্তু তার বাবা-মা? ও কি কিছু জানে? জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বাড়ির খবর কিছু জানো? জলিল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলনা। মুখে চোখে একটা ম্লান ছায়া পড়ল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলল, আমি ওদিকে যাইনি।

নীহার বুঝল, ও জানে, চেপে যাচ্ছে তার কাছে। তার নিজের মনই তো বলে দিচ্ছে, কী হয়েছে তাঁদের, কী হতে পারে। তবু একটা ক্ষীণ আশা কিছুতেই ছাড়তে পারছিল না। হয় তো শেষ মুহূর্তে প্রাণ ছুটো কোনোরকমে বেঁচে গেছে। কিন্তু তাঁরা যেখানে যেভাবেই থাকুন, তার আর এখন ফিরে যাবার উপায় নেই। এখন তার নিজের পথ নিজেকেই করে নিতে হবে। তারই জন্যে মনে মনে তৈরী হল। বুকে বল এনে সাহসে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে জলিল। তেমনি মাথা নিচু করে' জড়সড় হয়ে, বরাবর যেমনটি থাকে। কাল রাত্রে যে মানুষটা তাকে নিশ্চিন্ত ও চূড়ান্ত সর্বনাশের হাত ডেকে রক্ষা করে এত দূরে নিয়ে এসেছে, এর সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল

নীহার। আস্তে আস্তে ডাকল, জলিল! সে একটু চমকে উঠে চোখ তুলল।

"তুমি আমার জন্যে যা করলে—"

"না, না—" শুধু এই ছটো কথাই যেন বলতে পারল কোন রকমে এবং আরো লজ্জিত হয়ে পড়ল।

"আমি এখান থেকেই যেমন করে হোক যাবার চেষ্টা করি। তুমি ফিরে যাও।"

জলিল কি ভাবল। তারপর বলল, আপনি-আপনি যেতে পারবেন তো একা-একা ?

'একা আর কোথায় ? এত লোক যাচ্ছে।……তুমি কোথায় যাবে কিছু ভেবেছ ? তোমার মামার ওখানে তো—" বাকীটা আর বললনা। বলবার দরকারও ছিল না। ওকি আর তা জানে না ? শুধু আজ কেন, চিরদিনের তরে সে পথ ওর বন্ধ হয়ে গেছে। সেইখানেই কি শেষ ? আরো কত কী আছে ওর কপালে, সহজেই অনুমান করা যায়। জলিল কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, দেখি। অর্থাৎ কোথায় যাবে সে এখনো জানেনা।

নীহারের হঠাৎ মনে পড়ল, বাড়ি থেকে যখন বোরোয়, মা ওর হাতে এক তাড়া নোট গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, 'এগুলো রাখ। কখন কী দরকার হয়।' সেগুলো সে ব্লাউজের তলায় রেখে দিয়েছিল। হাত দিয়ে দেখল, তেমনি আছে। বলল, জলিল, তুমি কিছু মনে করোনা। তোমার কাছে তো খরচ-পত্তর কিছু নেই। আমার সঙ্গে কিছু টাকা আছে--

গলার কাছে হাতটা তুলতেই জলিল মাথা নেড়ে বলে উঠল, না, না, আমার কিছু লাগবে না। আপনারই বরং রাস্তা ঘাটে একা—

আবার চোখ ছটি তুলে ধরল। তার ভাষাটা পড়তে পারল নীহার। তাকে এখানে এমনি একা ছেড়ে দিতে ওর ঐ ভীরু মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। কিন্তু সে একান্ত নিরুপায়। ঐ নৌকোগুলোতে ও তার স্থান নেই।

ঠিকই বলেছিল জলিল। সারাপথ ছহাতে টাকা ছড়াতে ছড়াতে আসতে হয়েছিল নীহারকে। নৌকায়, ষ্টীমারে, রেলে উঠতে নামতে অসংখ্য রোমশ হাত এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। দাও, তা নাহলে টুটি চেপে ধরবো।

শুধু তার নিজের জন্যে নয়, একটা বড় দল, তার মধ্যে স্ত্রীলোক আর শিশুর ভাগই বেশী, যারা তার সঙ্গে জুটে গিয়েছিল তাদের 'দায়' মেটাবার ভারও তাকে নিতে হয়েছিল। কিছু লোক এসেছিল তাদের মহকুমা সহর থেকে। বাবা-মার শেষ খবরটা তারাই দিয়েছিল।

কোলকাতায় এসে হষ্টেলে আর ফিরে যায় নি। পথের সাথী যারা তাদের সঙ্গেই কোনো একটা আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল। সেখান থেকে টেলিগ্রাম করেছিল দাদামশাইকে। তিনি এসে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের লখনৌ এর বাসায়। কিছুদিন নিজের কাছে রেখে, তাঁরাও চলে এলেন কোলকাতায়। নাতনীর মনোগত ইচ্ছাটা জানতে পেরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা।

বাবা নেই, কিন্তু নীহার তো জানে কী ছিল তার মনে। তার পথের নির্দেশও তিনি দিয়ে গেছেন। অনেকবার বলেছেন, এই মেয়েকেই তিনি ছেলের মত করে গড়ে তুলবেন। তাঁর নির্ধারিত পথেই তাকে চলতে হবে।

ল' পাশ করল। কিন্তু হাইকোর্টে ঢোকা আর হয়ে উঠল না। তার জন্যে একজন কাউকে পিছনে এসে দাঁড়াতে হয়। বাবা সেটা পারতেন। সেই পরিকল্পনা নিয়েই চলেছিলেন। তাঁর স্থান আর কে নিতে পারে? দাদামশায়ের সে সঙ্গতি বা সামর্থ্য নেই। তিনি চাইলেও নীহার তাঁর উপরে সে গুরুভার চাপাতে চায়না। কিন্তু একটা কাজ তো সে করতে পারে। বাবা যা চেয়েছিলেন ততখানি না হোক, তাঁর ইচ্ছা ও আকাঙ্খার যেটা মূল কথা ছেলেদের মত আত্মনির্ভরতা, একটা Career বা বৃত্তি আশ্রয় করে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা—সেদিকে তো চেষ্টা করতে পারে। হয়তো তেমনি করেই একদিন তাঁর পরিকল্পনাকে যথার্থ রূপ দেওয়া সম্ভব হবে।

ল'-র এবং তিনটা পরীক্ষার ফল বেরোবার পর দিদিমা বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে। এবার আমরা তোমার বিয়ে দেবো।' নীহার বলল, দাঁড়াও, একটা চাকরি-টাকরি পাই আগে।

"চাকরি!" আকাশ থেকে পড়লেন দিদিমা, "চাকরি করতে যাবি কোন্ দুঃখে?"

—দুঃখে নয়, দরকারে।—হেসে বলল নীহার।

—কিসের দরকার শুনি ?

নীহার সে কথার আর জবাব দিল না। ওটা ওর একান্তভাবে নিজস্ব, দিদিমাকে হয়তো বোঝানো যাবে না। কিন্তু দাদামশাই তার আঁচ পেয়েছিলেন। তাই স্ত্রীকে বলেছিলেন, ও যা করতে চাইছে করুক। বাধা দিও না।

ঘুম ভাঙল বেলায়। মনটা তখনো গত রাত্রির ভাবনাগুলোর ভার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সেই দৃশ্যগুলো আবছা আবছা ভাসছিল চোখের উপর। বিশেষ করে একখানা মৌনী ম্লান মুখ, আর কুণ্ঠিত লাজুক দুটি চোখ।

একটা দলের সঙ্গে ভিড়ে আলাদা নৌকোয় যখন গিয়ে উঠল নীহার, তখনো কিছুই বলতে পারে নি, শুধু তাকিয়ে ছিল। নৌকোটা অনেকখানি আসবার পরেও দেখা যাচ্ছিল তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছই-এর উপর হাত রেখে।........তারপর কখন চলে গিয়েছিল দৃষ্টির আড়ালে। কিন্তু দৃষ্টির আড়াল মানেই তো মনের আড়াল নয়। নানা কাজ নানা চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিয়েছে। একটি নির্বাক বিষণ্ণ মূর্তি। কতদিন যখন তখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে গেছে। কিন্তু হারিয়ে যায়নি।........

—কে জানে আজ সে কোথায়, কেমন আছে, আছে কিনা তাও জানবার উপায় নেই।

রূপা অন্যদিনের মতই ভোরে উঠে কাজে লেগে গিয়েছিল। 'দিদিমণির' সব কিছু সে নিজে হাতে করে। নীহার নিষেধ করেছে কত বার—'তুই রেখে দে। ঝি তো রয়েছে।' কে শোনে সে কথা? যতক্ষণ না সে অফিসে বেরিয়ে যায়, পায় পায় ঘুরবে। তারপর চলে যাবে দাদুর কাছে পড়তে। সে ব্যবস্থা নীহারই করে দিয়েছে।

রূপার আসবার সপ্তাহখানেক পরে। সকালবেলা এক চক্কর ঘুরে এসে দাদু তাঁর ঘরের সামনেকার বারান্দায় বসে বিশ্রাম করছিলেন। নীহার গিয়ে বলল, একটা চাকরি করবেন দাদু?

—এখখনি। কিন্তু দেয় কে?

—আমি দেবো।

—তুমি? তাহলে তো আরো ভালো। কী করতে হবে শুনি?

'এই নাতনীটাকে পড়াতে হবে।' বলে রূপাকে সামনে এনে দাঁড় করাল। দাদু ছদ্ম গম্ভীর সুরে বললেন, বড় কঠিন কাজ। পাওনা গণ্ডা কি রকম হবে, শুনি আগে।

নীহার রূপার দিকে ফিরে বলল, কি রে? কি দিবি দাদুকে?

রূপা সলজ্জ হাসিমুখে মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঘুরে গিয়ে ঝুপ করে দাদুর সামনে বসে পড়ে তাঁর একটা পা কোলের উপর টেনে নিয়ে হাত বুলোতে লাগল। দাদু হেসে উঠলেন। নীহারও যোগ দিল তার সঙ্গে।

সেই থেকে পায়ে তেল মালিশ করা, হাঁটুতে ফ্লানেল কাপড় দিয়ে সেক দেওয়া, ঘাড়ে পিঠে গরমজলের ব্যাগ চাপানো ইত্যাদি কাজগুলো এবং সেই সঙ্গে আরো নানারকমের টুকটাক ফাই ফরমাস—সব চলে গেল রূপার হাতে। দাদু-ও তাঁর 'চাকরি' চালিয়ে যেতে লাগলেন।

রূপা নানা কাজে তার সামনে দিয়ে এঘর-ওঘর করছিল। অন্য দিনের মত। কিন্তু আজ তাকে যেন একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছিল নীহার। হয়তো নিজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিল। এক জায়গায় ওরা দুজনে এক। দুজনকেই এক বিভীষিকাময় অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু একভাবে নয়। ও নিজেকে রক্ষা করেছে, নিজের শক্তি দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে, সাহস দিয়ে। প্রবল পাশব বলের কাছে হার মানেনি, ভেঙে পড়েনি। প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত করে বেরিয়ে এসেছে। আর সে? আত্মরক্ষার কোনো শক্তিই খুঁজে পায়নি নিজের মধ্যে। না দৈহিক, না মানসিক, না নৈতিক। বেরিয়ে আসতে পারত না, চিরদিনের তরে হারিয়ে যেত কোন নারকীয় আস্তাকুড়ে; যদি আরেকজন এসে না দাঁড়াত তার পাশে। এই তুচ্ছ উদ্বাস্তু মেয়েটার পাশে এসে কেউ দাঁড়ায়নি। সবাই বরং পাঁকের মধ্যেই তাকে ঠেলে দিয়েছিল। তবু সে সগৌরবে বেরিয়ে এসেছে। ওর সঙ্গে তার জীবনটাও যেন কেমন করে এক অলঙ্ঘ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেছে। এতবড় একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত আজ তাকে আরো কাছে এনে ফেলল।

॥ ১৯ ॥

কোলকাতার বিরুদ্ধে প্রদীপের সব চেয়ে বড় অভিযোগ—তার অমন জীবন্ত জোয়ান দামী গাড়িটাকে বড় বড় রাস্তায় 'হামাগুড়ি' দিয়ে চলতে হয়। সামনে যারা চলছে সবাই যদি জাতে কুলীন হত, তাহলেও না হয় একটা সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ ঠেলা, রিক্স, গরুর গাড়ির মত অন্ত্যজ। উপায় নেই। ঐগুলো যারা চালাচ্ছে এটা তাদেরই যুগ।

সহর ছাড়াতেই অনেক সময় লেগে গেল। বাইরে ফাঁকা রাস্তায় পড়ে যখন সেটা পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করল, অর্থাৎ তার নিজের ভিতরে যে ঝড়ের বেগ আছে, সেটা ছড়িয়ে দিল তার বাহনের দেহে। সেখান থেকে তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। জীবের মত যন্ত্রেরও বোধহয় একটা মন আছে, মেজাজ আছে। মাঝে মাঝে সেটা বিগড়ে যায়। প্রদীপের গাড়িটাও দেখা গেল ছুটতে আপত্তি করছে না! কিন্তু একটা বিশেষ বেগের উপরে উঠতে নারাজ।

স্বরূপ কাঁদিতে পৌঁছবার আগেই সন্ধ্যা হল। গঙ্গার ধার দিয়ে আসতে আসতে অভিজিতের হঠাৎ নজরে পড়ল, এমনি অন্ধকার রাতে বেশ কিছুটা দূর থেকে একচাপে অনেকখানি জায়গা জুড়ে যে মিটমিটে আলোর মালা চোখে পড়ে, যা দেখে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে মনে একটা বিভ্রম জাগে—যেন ঐ আলো গুলোই সত্য, তার আড়ালে যে কতগুলো কুৎসিত কুঁড়ের বিশৃঙ্খল জটলা একটা বিশালকায় মড়া জানোয়ারের মত গা এলিয়ে পড়ে আছে, সেটা মায়া—তার একটা রশ্মিও তো দেখা যাচ্ছে না। সবটাই একটানা অন্ধকার।

আরো খানিকটা এগিয়ে প্রদীপও সেটা লক্ষ করল। বলল, ভুল রাস্তায় আসিনি তো? অভিজিৎ চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে বলল, না; এবার ডাইনে বেঁকতে হবে।

মোড় নিয়ে কয়েক শ গজ গিয়েই থেমে যেতে হল। রাস্তার উপর

ইটপাটকেল ছড়িয়ে আছে। হেড লাইটের আলোয় সামনের দিকে নজর পড়তে তুজনেই চমকে উঠল। টালি-টিন খাপড়ার একটা বিশাল স্তূপ। অভিজিৎ নেমে পড়ে বলল, টর্চ আছে? 'আছে' বলে ড্যাল-বোর্ডের ভিতর থেকে টর্চ নিয়ে প্রদীপও বেরিয়ে এল। কিছুদূর গিয়ে আর পথ নেই। ঘরদোর জিনিস পত্র হাঁড়িকুড়ি সব ভেঙে, তুমড়ে তুবড়ে একাকার হয়ে গেছে।

"কি ব্যাপার বলুন তো?" অভিজিতের মুখের দিকে তাকাল প্রদীপ, "মনে হচ্ছে যেন একটা এয়ার-রেইড্ হয়ে গেছে। কিন্তু লোকগুলো গেল কোথায়?"

অভিজিৎ কোনো জবাব দিলনা। টর্চ জ্বেলে নিরবে তাকিয়ে রইল সেই বিশাল বিধ্বংসের দিকে। একটু পরে বলল, ওদিক দিয়ে আরেকটা রাস্তা আছে, আমাদের বাড়িপর্যন্ত যাওয়া যায়। আপনাকে আরেকটু কষ্ট করতে হবে।

—না, না কষ্ট কী? চলুন।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই একটা কোলাহল কানে গেল। আর একটু এগিয়ে গাড়ির আলোয় চোখে পড়ল অনেক লোকের জটলা। ফটক পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই তারা এসে চারদিকটা ঘিরে ফেলল। একটা কান্নাকাটির রোল। তার সঙ্গে টুকরো টুকরো কথা। সবচেয়ে যেটা বড় খবর, সকলের আগেই পাওয়া গেল। অভিজিৎ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আরো অনেক কথা আসছিল তার কানে—বোমা, পুলিস, কাঁদানে গ্যাস, লাঠি, ধর-পাকড়, খুন-জখম, যার পুরো খবর এখনো তারা জানেনা। অভি কতক শুনছিল, কতক শুনছিল না। তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল একটা মৃত্যু। কেমন করে এল সেটা তখনো জানেনা, সেই মুহূর্তে জানবার চাড়ও যেন ছিলনা। লোকটা চলে গেল, অনেক ক্ষোভ, ব্যর্থতা ও অভিমান নিয়ে চলে গেল—এই কথাটাই শুধু ঘুরে আসছিল তার মনে।

কিছুক্ষণ গাড়ির মধ্যেই বসে রইল। তারপর যেন সমস্ত চেতনাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে তুলল, নিজেকে ঠেলে দিল সামনে অপেক্ষমান কঠোর বাস্তবের দিকে। যে চলে গেল সেতো গেলই। এবার এরা; এই লোকগুলো, তার চারদিকে যারা ভিড় করে আছে। এদের দিকে তাকাতে হবে।

গাড়ির দরজাটা খুলে বেরোতো গিয়ে প্রদীপের দিকে তাকাল—"আপনি আর এসে কী করবেন? আজ আর কোনো কথাবার্তা হবে বলে মনে হয়না।"

"না, না; এইসব সামলে নিয়ে তবে তো অন্য কথা।" বলতে বলতে প্রদীপও নেমে এল গাড়ি থেকে। সামনের দিকে তাকাল। সেখানেও অনেক লোক। একটু কি ভেবে নিয়ে বলল, কিন্তু ব্যাপার যা বুঝতে পাচ্ছি—। চলুননা, ওদিকটা একবার দেখা যাক।

—আপনি আসবেন!

—বাড়ি গিয়েই বা করবোটা কী?

অভিজিৎ মনে মনে খুশী হল। ভিতরে ভিতরে সে সত্যিই বড় অসহায় বোধ করছিল। প্রদীপ নিজে থেকে তার সাহায্যে এগিয়ে আসছে, এতে অনেকখানি ভরসা পেল। ব্যাপারটা যে বিশাল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আরেকটু গিয়ে সেটা আরো বেশী করে উপলব্ধি করা গেল। শুধু ফটকের সামনে নয়, ভিতরেও লোক ভর্তি। তার মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুর ভাগই বেশী। ওকে দেখে শুরু হল আরেক দফা চিৎকার, কান্নাকাটি। তার ভিতর থেকে অনেক কণ্ঠে মিলে একটা নাম কানে এল—রানীমা। বৌরানীকে অনেকে 'রানীমা' বলে, বিশেষ করে ওদের মধ্যে যারা 'নিম্নশ্রেণীর' লোক। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কী বলছে ওরা, অভিজিৎ প্রথমটা ঠিক ধরতে পারলনা। হঠাৎ দেখল, হলধর বেরিয়ে আসছে ভিড়ের ভিতর থেকে। কাছে আসতেই জানতে চাইল, "বৌরানী কোথায়?" শুধু প্রশ্ন নয়, তার সঙ্গে অনেকখানি উদ্বেগ।

হলধর বলল, ওপরে। এমন সুরে বলল যার থেকে মনিব বুঝতে পারেন উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। শুধু ঐটুকু বলেই ক্ষান্ত হলনা। সেটা হলধরের রীতি নয়। সে কেবলমাত্র 'ভৃত্য' নয়, এ পরিবারে তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, সুযোগ পেলেই কথাবার্তার ভিতর দিয়ে তার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রেও তার ত্রুটি হলনা। মনিব আর কিছু জানতে না চাইলে নিজে থেকে যোগ করল, "এতক্ষণ রান্না মহলে ছিলেন। এই মাত্তর, আপনি ফিরেছেন খবর পেয়ে ওপরে গেলেন। সেই বিকেল থেকে তো নীচেই আছেন। এরা যখন আসতে শুরু করল,

নিজে নেমে এসে দারোয়ানকে হুকুম দিলেন, ফটক খুলে দাও। দাঁড়িয়ে থেকে একটা একটা করে সদর মহলের খালি ঘরগুলো খুলিয়ে জায়গা করে দিতে বললেন। সেগুলো ভর্তি হয়ে গেলে আমাকে বললেন, হল-ঘর খুলে দে।....আপনি ওপরে যান বাবু। আমি একবার বাজারে যাবো।

আর একটু কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলল, চাল যা এসেছে, হয়তো একটু টান পড়তে পারে। এখনো লোক আসছে। স্বরূপ মুদীকে বলে আসি আরো বস্তা চারেক যেন আজ রাতেই পাঠিয়ে দেয়।

হলধর একরকম ছুটতে ছুটতে চলে গেল। অভিজিতের ভিতরেও একটা অদম্য ইচ্ছা মাথা তুলে উঠছিল—সব কাজ ফেলে এখনই ছুটে চলে যায় বৌরানীর কাছে, মাথা নত করে দাঁড়ায় তাঁর সামনে, অকপটে স্বীকার করে তার পুঞ্জীভূত অপরাধ—তোমাকে আমি চিনতে পারিনি বৌরানী, ছোট করে দেখেছি, মনে করেছি বাঁড়ুয্যে বাড়ির এই ইটকাঠের মধ্যেই তোমার সারা মনটা বন্দী হয়ে আছে। তার বাইরে আর কিছু ভাবতে পারনা। এই বংশের ক্ষুদ্র স্বার্থ, অন্ধ সংস্কার, তুচ্ছ মর্যাদা ও অসার গৌরব নিয়ে যে সংকীর্ণ গণ্ডি, সে-ই তোমার জগৎ। চারদিকের দুনিয়া যে কত বদলে গেছে, প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেও মেনে নিতে পারনি, সব কিছু থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছ। তোমার এই অন্ধ প্রত্যয়, একটা লুপ্ত প্রায় জমিদার বাড়ির অর্থহীন প্রাচীন ধারাকে আঁকড়ে পড়ে থাকবার এই আপ্রাণ প্রয়াস; যা সত্য যা অনিবার্য, অবধারিত তাকে অস্বীকার করে চলা—দেখে দেখে আমি দুঃখ পেয়েছি, মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়েছি, কখনো বা করুণা হয়েছে তোমার উপর।

ভুল করেছি, বৌরানী। অপরাধ করেছি তোমার কাছে। জানতামনা তুমি কত বড়। এই রকম একটা বৃহৎ বিপর্যয়ের মুখেই মানুষকে জানা যায়, তার ঠিক পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। হয়তো সেই দিক দিয়ে এর প্রয়োজন ছিল।

আজ তুমি যা করেছ, অতি সহজে বিনা দ্বিধায় করেছ, আমার মনে হচ্ছে আমি তা পারতামনা। হয়তো হাত সরতনা, গলা উঠতনা। বাধা দিত আমার বংশরক্ত ধারা, আমার পূর্বপুরুষের দৃষ্টি ও মন, যেগুলো আমার অজানতে আমার ভিতরে রয়ে গেছে, যেগুলো, তোমায় সেদিন

বলেছিলাম, আমার অবাঞ্ছিত উত্তরাধিকার। তুমি পেরেছ, কারণ তুমি এ বাড়ির সন্তান নও, বধূ।

কিছুক্ষণের জন্যে অভিজিৎ তার নিজের চিন্তাধারার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হল প্রদীপ রয়েছে তার সঙ্গে। ডান পাশে ফিরে দেখল, নেই তো! কোথায় গেল? তখনই নজরে পড়ল খানিকটা দূরে ভিড়ের মধ্যে কি করছে। এগিয়ে কাছে যেতে প্রদীপও একটু সরে এসে বলল, আপনি ওপরে যান। ওদিকের ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা গুলো একবার দেখে আসুন! আমি এদের একটু গোছগাছ করে বসাবার চেষ্টা করছি। ওহে শোনো, কী নাম যেন তোমার?···বলতে বলতে আবার মিশে গেল ভিড়ের ভিতর।

অভিজিৎ একাই উপরে উঠে গেল। একটা ফোলিও ব্যাগ ছিল হাতে। নিজের ঘরে রেখে তখনই ভিতর মহলের দিকে যাচ্ছিল। পথেই বৌরানীর সঙ্গে দেখা। ব্যস্ত হয়ে অনেকটা যেন ছুটতে ছুটতে আসছিলেন মাঝের মহলের দিকে। সারা মুখময় ঘাম। তার সঙ্গে সুস্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ। অভিজিৎকে দেখেই মৃদু করুণ সুরে বললেন, "শুনেছ নিশ্চয়ই?" কী, সে কথা আর বলে দিতে হলনা। অভিজিৎ সহজেই বুঝল। মাথা নেড়ে জানাল, শুনেছে।

—এখানে এসে শুনলে, না আগেই খবর পেয়েছ?

—এখানে এসে শুনলাম।

—আমি যখন খবর পেলাম, তার আগেই হাসপাতালে নিয়ে গেছে। সরকার মশাইকে পাঠিয়েছিলাম। দেখতে পাননি। শুনলাম পথের মধ্যেই—।

বাকীটুকু আর বললেননা। লক্ষ্যহীন শূন্য দৃষ্টি মেলে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। অভিজিৎ সেই বেদনার্ত ম্লান মুখখানার দিকে তাকাল। মনে পড়ল, এই মানুষটার উপর বৌরানী কোনোদিন প্রসন্ন ছিলেননা।···কয়েক মুহূর্ত পরেই যেন সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন, তুমি এখনো জামাকাপড় ছাড়নি? এখখনি যাও। মুখ হাত ধুয়ে চটকরে চা খেয়ে নাও। আমি মঙ্গলাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সেই সদাব্যস্ত বৌরানী। সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটির দিকে যার সতত সজাগ দৃষ্টি। ক্ষণকাল দাঁড়াবার অবসর নেই।

অনেক কথা বলবে বলে এসেছিল অভিজিৎ। সব যেন ঘুলিয়ে গেল। শুধু বলতে পারল, একজন ভদ্রলোক আছেন আমার সঙ্গে।

বৌরানী চলে যাচ্ছিলেন, ফিরে বললেন, কে? কোলকাতা থেকে এসেছেন?

—না; সেদিন যার কথা বলছিলাম তোমাকে। মাষ্টার মশাই এর ছেলের বন্ধু।

—ও, প্রদীপ?

—নামটা জানলে কী করে?

—আমি সব জানি। কোথায় বসিয়েছ তাকে?

—নীচে আছেন।

—ডেকে পাঠাও। তার চা-খাবার তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।.... আর শোনো, খেয়ে-দেয়ে একবার রান্না মহলের দিকে এসো।

রান্নামহলের বিশাল চত্বর জুড়ে অনেকগুলো উনুন পাতা হয়েছে। তার উপরে বড় বড় পিতলের ডেক—বহুদিন যারা মানুষের হাতের স্পর্শ পায়নি, মুখ থুবড়ে পড়েছিল কোন বদ্ধ গুদামের অন্ধকারে। তাই থাকে এরা। মাঝে মাঝে ডাক পড়ে যখন ব্যাপক প্রয়োজন দেখা দেয়—পূজা পার্বণ, কিংবা অন্য কোনো উৎসব অনুষ্ঠান। আজকের প্রয়োজন একেবারে আলাদা। বাড়ুয্যে বাড়ির দীর্ঘ ইতিহাসে এর জুড়ি পাওয়া যাবেনা।

আরেকটা মস্ত বড় তফাৎ। এর আগে যখনই এমনি অন্ন যজ্ঞের আয়োজন হত, যাদের জন্যে আয়োজন, যারা ভোক্তা তারা থাকত বাইরে, তারা নিমন্ত্রিত অতিথি। কিন্তু আজ তারাই এসে যোগ দিয়েছে এই কর্মকাণ্ডের প্রতি স্তরে। এ যেন তাদেরই কাজ। উনুন বসানো থেকে ডেক নামানো—সর্বত্র তাদের হাত। তারপরেও তারা।

এই দিকটা নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছিলেন বৌরানী। অভিজিৎ এখনো ফিরলনা। তিনি তো ওদের কাউকে চেনেন না। তাঁর কাছে কোনদিন এরা আসেনি। তিনিও কাউকে ডাকেননি। ভাঁড়ার না হয় তিনি খুলে দিতে পারেন। কিন্তু তারপর? করবার লোক তো তাঁর নেই। এদেরই

সব করে নিতে হবে। কিন্তু কাকে বলবেন তিনি? মনে পড়ল সেই একজনের কথা, যাকে তিনি মুখোমুখি কখনো দেখেননি, কিন্তু জানতেন, সে-ই এদের সব। সে যদি থাকত তার হাতে সব ছেড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এই রকম একটা দুর্বিপাকে, যখন তার সব চেয়ে বড় প্রয়োজন, বিধাতা তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

উঠোনের একপাশে দাঁড়িয়ে চারদিকটা যখন দেখছিলেন, হঠাৎ নজর পড়ল দূরে একটা কোন বেছে নিয়ে বসে বসে কাঁদছে একটা বুড়ো গোছের লোক। মুখটা যেন চেনা। হঠাৎ মনে পড়ল ঐ সেই মিস্ত্রী অনেক দিন আগে হলধর যাকে নিয়ে এসেছিল হলঘরের তালা খোলার জন্যে। হলধরকে দিয়েই ডাকালেন তাকে। অপরাধীর মত ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল। তারপর ভেঙে পড়ল 'রাণীমার' সামনে—মা, আমি আমিই তারে মারলাম। আমারে বাঁচাতেই ছুইট্যা আসছিল। তারপর।

বৌরানী তাকে সান্ত্বনা দিলেন—"এখন সে সব ভেবে লাভ নেই মিস্ত্রী। দেখছ তো কত বড় বিপদ। বুকে বল আনো।" ভিতরের দিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, এতসব লোক, মেয়েছেলে, কাচ্চা বাচ্চা আমার এখানে, আমার শ্বশুরের ভদ্রাসনে এসে উঠেছে। আমি তো এদের উপোসী রাখতে পারিনা। দুটো ডালভাত অন্ততঃ দিতে হবে। কিন্তু আমার তো অত লোক জন নেই।

মিস্ত্রী হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মহামায়ার মুখের পানে। কী দেখল সে-ই জানে। 'আপনি একটু দাঁড়ান রানীমা,' বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল, সঙ্গে চার পাঁচ জন লোক। তারা আশ্বাস দিল, সব ভার তাদের এবং সেই সঙ্গে যা বলল তার সারাংশ হল,—"আপনাকে কিছু ভাবতে হবেনা। ওপরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। আপনার হুকুম তো শুনলাম। বাকী সব এঁদের সঙ্গে"—সরকার এবং চাকর বাকর যারা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের দেখিয়ে দিল।

কিন্তু বৌরানী রান্না মহলেই রয়ে গেলেন। এ তো এমন ব্যাপার নয় যে গোটাকয়েক হুকুম দিয়ে সরে গেলেই সব আপনা হতে চলবে। পদে পদে তাঁর প্রয়োজন। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। অনেক লোক লেগে গেছে।

মেয়েদের দলটাও ছোট নয়। কুটনো এবং বাটনায় তো বটেই, কোমরে আঁচল এঁটে রান্নাতেও ভিড়ে গেছে কয়েকজন। বৌরানী শুনেছিলেন পদ্মার ওপারে, এরা যে 'দেশ' থেকে এসেছে সেখানে বড় বড় 'যজ্ঞি-রান্নার' আসল অংশটা মেয়েদের। ভোর হবার আগে থেকেই হাতা বেড়ি নিয়ে জাঁকিয়ে বসেন রায় বাড়ির রাঙা-ঠাইরেন, সমাদ্দার বাড়ির 'বড় বৌ' এবং এপাড়া-ওপাড়ার বাঘা বাঘা অন্নপূর্ণার দল। বাঁকুড়া কিংবা উৎকল বাসী 'ঠাকুরেরা' সেখানে পাত্তা পায়না। সেখানে পুরুষের ভূমিকা গৌণ, দৌড়ঝাঁপ আনা-নেওয়া, তোলাপাড়ায় সীমাবদ্ধ।

বৌরানী ঘুরে ঘুরে তাই দেখছিলেন। মেয়েরাও দেখছিল তাঁকে। দুচোখে সম্ভ্রম, সংকোচ ও খানিকটা বিস্ময়।....অনেকেই তাঁকে আগে কখনো দেখেনি, দেখলেও অনেক দূর থেকে, কখনো ক্বচিৎ যখন তিনি সদর মহলের দোতলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, একটি অস্পষ্ট অবয়ব। তাতে করে তাঁকে ঘিরে যে কৌতূহল সেটা আরো ঘনীভূত হয়েছে। ওদের কাছে বৌরানী শুরু থেকেই এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। তাঁকে দেখা যায়না, কিন্তু এই বিশাল পুরীর সর্বত্র তাঁকে অনুভব করা যায়। তিনি আছেন, সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে আছেন, কিন্তু বাইরে কোথাও নেই। তাঁকে নিয়ে কত জনশ্রুতি! তাঁর রূপ, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর কঠোরতা ও দাক্ষিণ্য নানা বিচিত্র কাহিনীর রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কলোনীর ঘরে ঘরে।

আজ সেই বৌরানী (ওদের অনেকের কাছে রানীমা) তাঁর অদৃশ্য উচ্চ লোক থেকে নেমে এসেছেন, তাঁর এতদিনের রহস্যময় অন্তরাল ঘুচিয়ে একেবারে সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন! এ যেন আরো আশ্চর্য, চোখের উপর দেখেও বিশ্বাস হয়না।

অভিজিৎ এসে বৌরানীকে খুঁজে পেল যে ঘরটায়, সেখানে মেঝেতে হোগলা বিছিয়ে তার উপরে খিচুড়ি ঢালা হচ্ছে। তার গরমে কাছাকাছি দাঁড়ানো কষ্টকর। অভিজিৎ সব দেখল এবং এক ফাঁকে অনুযোগের সুরে বলল, এখানে না ঢুকলে বুঝি চলছিলনা তোমার?

—এই তো সবে এলাম রে বাপু। শোনো, লোকের একটা হিসেব নিতে হবে।

—প্রদীপবাবু নিচ্ছেন দেখে এলাম।

—ওঁকে বুঝি আটকে রেখেছ ?

—আমি আটকাইনি। নিজে থেকেই রয়ে গেছেন। ভীষণ-কাজের লোক। আর মানুষটাও চমৎকার।

সে তো বুঝলাম কিন্তু মাষ্টার মশাই ভাবছেন, গৌরী খাবার নিয়ে বসে আছে।

—মাষ্টার মশাইকে একটা খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।···তুমি এক কাজ কর।

—কী ?

—ওপরে চলে যাও। সেই বিকেল থেকে সবই তো তোমার ওপর দিয়ে চলেছে। বাকীটা এবার আমরা সামলাই।

—"বেশ তো।"—বলে বৌরানী চত্বরের ওদিকটায় একটা মোড়ার উপর এগিয়ে বসলেন, উপরে চলে গেলেননা।

অভিজিৎ একবার ভেবেছিল প্রদীপকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। আনেনি। জানে, বৌরানী অপরিচিত বাইরের লোকের সামনে বেরোননা। কিন্তু বার বার মনে হচ্ছিল আজকের এই বৌরানীর বেলায় বোধহয় সে কথা খাটেনা। বাঁড়ুয্যে বাড়ির সিংহদ্বার খুলে দিয়ে তিনি শুধু বাইরের লোকদের ডেকে নেননি, নিজের জীবনের এতদিনকার রুদ্ধ কক্ষ থেকেও বেরিয়ে এসেছেন। তবু কথাটা সরাসরি না পেড়ে ঘুরিয়ে বলল, ওর ওদিকের কাজ বোধহয় হয়ে গেছে।

—কার কথা বলছ ?

—প্রদীপবাবু।

—তাহলে এখানে ডেকে পাঠাও না ?

প্রদীপ এল, মনে মনে বেশ খানিকটা সঙ্কোচ নিয়ে। এই জাতীয় প্রাচীন পন্থী জমিদার বাড়ির অন্দরমহল এবং সেখানকার রীতিনীতি সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিলনা। বিশেষ করে বৌরানী সেগুলো পুরো মাত্রায় মেনে চলেন, এ গাঁয়ে এসে অবধি নানাসূত্রে সেই কথাই শুনে এসেছে। এসে দেখল অন্য পাঁচটি বনেদী ঘরের গৃহস্থবধূর সঙ্গে তাঁর এমন কিছু তফাৎ নেই। বেশ সহজ ভাবেই গ্রহণ করলেন তাকে এবং এমন একটা অন্তরঙ্গ সুরে কথা বললেন, যেন এ পরিবারে তার অনেক দিনের যাওয়া-আসা।

"আপনার কথা আমি গৌরীর মুখে আগেই শুনেছি"। এই 'আপনি' টাতে প্রদীপের মনে মনে আপত্তি ছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললনা। কারো কারো ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও একটা দূরত্ব থাকে। কাছে এলে অনুভব করা যায়। প্রদীপও তাই করে থাকবে। হয়তো সেটা এই মহিলার সহজাত ব্যক্তিত্ব, যা তাঁর চারদিকে halo বা পরিমণ্ডল রচনা করে রেখেছে। সেই মুহূর্তে ও-সব ভাববার সময়ও ছিলনা। যে-সব তথ্য ও প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল সে সম্বন্ধে তুচারটি কথাবার্তার পর প্রদীপ সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল।

কিষণ এসে দাঁড়িয়ে ছিল। অভিজিৎ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, বৌরানী উঠেছেন কিনা জানিস? উত্তর শুনে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তিনি সেই ভোরে উঠে সদরমহলে চলে গেছেন। এইমাত্র তাঁকে লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে দেখে এসেছে।

সে খবরও দিল কিষণ। অভিজিৎ চলে গেল স্নান ঘরে। এখন হাতমুখ ধুয়ে স্নানটা সেরে নেওয়া দরকার। একা আর কত করবেন বৌরানী? তাকেও গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাঁর পাশে।

যাবার আয়োজন করছে এমন সময় বৌরানীই এলেন তার ঘরে। প্রথমেই জানতে চাইলেন রাত জেগে শরীর খারাপ করেনি তো? অভিজিৎ সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, আমাকে ডেকে দিলে না কেন? তুমি একা এত ভোরে উঠে—

"তাতে আর কি হয়েছে? তুমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছিলে।...শোনো, ওদের পঞ্চায়েত না কী, তাদের সঙ্গে কথা হল। যাদের ঘরদোর ভেঙে গেছে, তাদের তো এখানে থাকতেই হবে। বেশির ভাগই তাই। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করতে চায়। বললো, 'আপনাদের ওপর আর কত বোঝা চাপাবো? আমরা যেমন খেটে খাচ্ছিলাম, তেমনি খাবো।' আমি অবিশ্যি বলে এলাম, "আজকের দিনটা এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ো তোমরা। বামুন বাড়ির প্রসাদ। কাল থেকে নিজেরা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে নিও। শুনে সবাই খুব খুশী। আসলে সে বন্দোবস্ত তো আমাদের করে দিতে হবে।"

অভিজিৎ হয় তো সব কথায় মন দিতে পারছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, বৌরানী যদি আজ নিজে এগিয়ে এসে এত বড় ভার নিজের কাঁধে তুলে না নিতেন, কী করত সে?

বৌরানী যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন এমন সময় হলধর এল। হাতে এক গোছা চাবি। খুশির সুরে বলল, পেয়েছি মা। অনেক খুঁজে খুঁজে বের করেছি।

বৌরানী বললেন, যাক, তালাগুলো আর তাহলে ভাঙতে হলনা। সব খুলে দিয়ে এসেছিস তো?

—খুলে জঙ্গল সাফ করবার লোক লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। উনুনগুলো

নতুন করে বসাতে হবে 'পেসিডেণ্ট' মশাইকে বলে এলাম। বললেন, ঠিক আছে আমরা সব করে নিচ্ছি।

—কিন্তু ওখানে কি কুলোবে? এত লোকের রান্না।

—উনি তো বললেন কুলিয়ে যাবে।

অভিজিৎ ধরতে পারছিল না কোন জায়গা সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। বৌরানী তার মুখের দিকে তাকিয়েই তা বুঝলেন। বললেন, তুমি বোধহয় চত্বরটা দ্যাখনি। দেখলেও মনে নেই। সদর মহলের একেবারে পশ্চিম কোণায়। লেঠেলরা যখন আসত, ওখানে রান্না করে খেত। তুমি কি তাদের দেখেছ?

অভিজিৎ মনে করতে পারল না। তার পূর্বপুরুষের অনেক কীর্তি-কলাপ তার অজানা রয়ে গেছে। এও তার মধ্যে একটি। গঙ্গার নতুন চর দখল করতে, বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করতে, প্রতিবেশী জমিদারদের সঙ্গে লড়াই করতে—অনেক সময় যার একমাত্র উদ্দেশ্য শক্তিপ্রদর্শন—দল দল লাঠিয়াল আমদানী করা হত, বিশেষ করে পূর্ববাংলা থেকে। কিছুদিন থেকে যেত তারা।

বৌরানী যখন সেইসব পুরনো কাহিনী শোনাচ্ছিলেন, অভিজিৎ ভাবছিল আজ যারা এসেছে কে জানে এদেরই কোনো কোনো পূর্বপুরুষ হয়তো ছিল সেই দলে। এই বাড়িতেই লাঠিয়াল হয়ে এসেছিল তারা। কাজ ছিল লাঠি মারা। তাদের সন্তানেরা এল উদ্বাস্তু হয়ে। লাঠি মারতে নয়, লাঠি খেতে।

ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর পুনরুক্তি! তার মধ্যে কৌতুকের অংশটাও কম নয়। তাদেরই উনুনে রান্না চড়াবে এরা। যেন সেইজন্যেই সেই পরিত্যক্ত উনুনগুলো এতদিন অপেক্ষা করে ছিল!

ইতিহাসও তার ঘটনাপ্রবাহের এই বিচিত্র রূপ কখনো নির্মম, কখনো কৌতুকময়, কখনো বা অনিবার্য—কাল থেকেই অভিজিতের মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল। ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন কোলকাতার পথে ছুটে চলল—পাশে চালকের আসনে প্রদীপ—তখনো হয়তো লেগে ছিল খানিকটা। যেতে যেতে বিশাল বিধ্বস্ত বস্তিটা আবার ওদের নজরে পড়ল, এবং ছাড়িয়ে যাবার পরেও সে সঙ্গ ছাড়লনা। প্রদীপ

ভাবছিল তার ফ্যাকটরীর কথা। এতগুলো লোকের এই ব্যাপকক্ষতি নিশ্চয়ই দুঃখজনক, তবু এর ভিতরে যে উজ্জ্বল সম্ভাবনার আলো দেখা যাচ্ছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। ঐ কলোনী এবং তার পাশের অনেকখানি জমি তাদের কারখানার জন্যে বড় দরকার। ওদের কাছ থেকে সেটা কিছুতেই পাওয়া যেতনা। প্যালেস্‌টাকে কাজে লাগাবার কোনো ভরসাও দেখা যাচ্ছিল না। ওটার প্রয়োজন আরো বেশী। শ্রমিকদের জায়গা দেওয়া এক বিরাট সমস্যা। মনে হচ্ছে তার সমাধান হয়ে গেল। ওখান থেকে বোধহয় ওদের আর হঠতে হবে না। দরকার শুধু ঐ চত্বর, ঘরগুলো এবং যে আশপাশের বিশাল জায়গাটকে ওদের বাসোপযোগী করে তোলা। এমন কিছু নয়, খানিকটা রদবদল, ওখানে ভাঙা এখানে গড়া। তার মানে ঐ খাতে যে মোটা অঙ্কটা ধরা আছে তার থেকে বেশ কিছু অংশ ছেঁটে দেওয়া যাবে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে চলেছিল প্রদীপ। তার কিছুটা অভিজিতের কাছেও ব্যক্ত করল। সেই সঙ্গে যোগ করল, —And it is all due to that great lady. তিনি যা করলেন, একেবারে beyond expectations. সকালে জ্যাঠামশাইএর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বললেন, তিনিও ভাবতে পারেননি।

অভিজিৎ বলল, বৌরানী নিজেও বোধহয় ভাবতে পারেননি। আমি তো জানি, ঐ বাড়িটা তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে। It is a part of her existence. ইদানিং তাঁর সবচেয়ে বড় ভাবনা ছিল ঐ বাড়ির ভবিষ্যৎ। আমাকে বারবার শোনাচ্ছিলেন আমি শুধু ওর মালিক নই, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ওটা আমার sacred inheritance—পবিত্র উত্তরাধিকার! বলেছেন, তাঁরা যেমন এটা তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন, তুমিও তেমনি তোমার পরে যারা আসবে, এই বাঁড়ুয্যে বাড়ির বংশধর, তাদের হাতে দিয়ে যাবে। তার বাইরে তুমি যেতে পার না। সে অধিকার নেই।........

প্রদীপ আগ্রহ নিয়ে শুনে যাচ্ছিল, কিন্তু সবটায় মন দিতে পারছিল না। একটা মালবোঝাই লরী বিকট শব্দ করে আগে আগে চলেছিল। বারবার হর্ন দেওয়া সত্ত্বেও পথ দিচ্ছিল না। একটা মোড়ে এসে লাল সিগন্যাল

দেখে যে-ই-না থেমেছে, প্রদীপ 'এক সেকেণ্ড্' বলে তাড়াতাড়ি নেমে গেল এবং ড্রাইভারের উদ্দেশে এমন কয়েকটি মোক্ষম দেহাতী বুলি ঝাড়ল, যা শুধু ঐ বিশেষ সমাজেই চলে এবং ওদেরই বোধগম্য। তাতে বেশ কাজ হল। মোড় পেরিয়েই একটা পাশ পাওয়া গেল। খানিকটা এগিয়ে প্রদীপ বলল, তারপর ?

—তারপরের ব্যাপার তো কালই শুনলেন এবং দেখলেন। তার সঙ্গে আজকের খবরটা যোগ করতে পারি, যা আপনি জানেন না।

—কী বলুনতো ?

—আপনার আন্দাজই ঠিক। ওরা ওখানে থাকল, এবং দেখে এলাম বৌরাণী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার বিলি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

প্রদীপ উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল—Hurrah, দিন হাত দিন। বলে বাঁ হাত ষ্টিয়ারিং-এ রেখে ডান হাত বাড়িয়ে অভিজিতের হাত ধরে সজোরে নেড়ে দিল।

অভিজিৎ সে উচ্ছ্বাস বা উদ্দীপনায় যোগ দিলনা। ধীরে ধীরে বলল, এটা কী জানেন ? ইতিহাসের প্রতিশোধ, revenge of history। History repeats itself—একথা প্রায়ই শোনা যায়, কিন্তু মাঝে মাঝে History যে revengeও নেয় সেটা হয়তো আমরা লক্ষ করিনা।

প্রদীপ কথাটা বুঝতে পেরে বলল, কী রকম ?

অভিজিৎ তার দিকে ফিরে বলল, আপনি বোধহয় শোনেননি, আমাদের জমিদারির বেশির ভাগ ছিল ওপারে—যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল এই সব জিলায়, উদ্বাস্তুরা যেখান থেকে এসেছে। ঐ বাড়িটার পিছনে তো কম রসদ লাগেনি। তার ষোল আনা না হলেও বারো আনাই যুগিয়েছে ওরা, মানে ওদের বাপদাদারা। যুগিয়েছে বলা ঠিক হলনা, তাদের যোগাতে হয়েছে। তাছাড়া শুনেছি মজুর যত লেগেছিল, আর রাজমিস্ত্রী, ছুতোরমিস্ত্রী—সে সবও ওখান থেকে আমদানী। যাবার সময় তারা তাদের পুরো পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে গেছে, একথা হলফ করে বলতে পারবো না।

প্রদীপ হাসল, "আপনাকে বলতে হবেনা। আমি এমনিই বুঝতে পারছি।

—আমরা ভুললেও ইতিহাস সে কথা মনে রেখেছিল। এতদিনে এমনি করে তার শোধ নিল। কিংবা শোধ না বলে বরং বলবো এইটাই তার স্বাভাবিক ধারা। ওদের জিনিস ওদের হাতে তুলে দিল। বৌরানী উপলক্ষ মাত্র। আমার বিশ্বাস তিনি এসে না দাঁড়ালেও এটা ঘটত। অন্যভাবে ঘটত। আজ, না হয় কাল। বৌরানীর হাত দিয়ে ঘটল, এ একটা আগামীকালের পরিহাস। আসলে যা হবার, যা অবধারিত, তাই হয়েছে।

ঐ বাড়িটা ওদেরই উত্তরাধিকার। আমার নয়। আমি ওর জন্যে কী করেছি? ওর কোনো একটা ঘরে একদিন জন্মেছিলাম। তার বেশী আর কী সম্পর্ক?

এই জাতীয় দার্শনিক তত্ত্ব বা এই গভীর বৈরাগ্যের সুর—এর কোনোটার জন্যেই প্রদীপ প্রস্তুত ছিলনা। এগুলো হজম করবার মত মানসিক পাকস্থলীও বোধহয় তার নেই। ব্যাপাটাকে লঘু করে দেবার উদ্দেশ্যে হালকা সুরে বলে উঠল, বাঃ সেইটাই তো আসল, যাকে বলে বার্থ্ রাইট্।" আজকের দিনে নিজে থেকে কে ছাড়ে বলুন। আমি তো অন্ততঃ ছাড়তে রাজী নই। বলে হেসে উঠল।

গাড়ি এসে পৌঁছল নীহারদের বাড়ির সামনে। সে তৈরী হয়েই ছিল। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

প্রদীপ পিছনের দরজাটা খুলে ধরে বলল, প্রথমেই কাজের কথা পাড়ছি। স্টেট্মেন্ট্টা হয়ে গ্যাছে তো?

নীহার গাড়িতে উঠতে উঠতে মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

—Good. কত যে খাটাচ্ছি আপনাকে!

নীহার হাসল—কোথায়! এইটুকুন তো কাজ।

তারপর দিন পাঁচ-ছয় কেটে গেছে। অভিকে সেদিনও বাইরে যেতে হয়েছিল। চারটার আগেই ফিরে এল। বিকেলের চা-খাবার নিয়ে এল মঙ্গলা। তার কিছুক্ষণ পরে বৌরানী এসে ঢুকলেন। অভিজিৎ বলল, এসো। ক'দিন যা কাজ যাচ্ছে! তোমার কাছে ছ-মিনিট গিয়ে বসবো সেটুকু ফুরসৎও পাচ্ছিনা।

—তাই তো দেখছি। এ রকম আর কতদিন চলবে?

—এখনো বেশ কিছুদিন। সরকারী আফিস যে কী বস্তু হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

—সময়মত খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর দিও। একটা অসুখ-বিসুখ না করে বসে।

—না, না ; অসুখ করলে চলবে কেন ?

বৌরানী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, পুরুতঠাকুর মশাইকে ডেকে একটা ভালো দিন দেখতে বলেছিলাম। তিনি বললেন, আসছে শুক্রবার সব দিক দিয়ে শুভ। তাহলে ঐ দিনই বেরিয়ে পড়ি, কী বল ?

"কোথায় !" সবিস্ময়ে চোখ তুলল অভিজিৎ।

—কোথায় আবার ? এ বাড়ির বিধবাদের যেটা বরাবরের আশ্রয়, জীবনের শেষ দিনগুলো সবাই যেখানে কাটিয়ে গেছেন। আমারও অনেক আগেই সেখানে যাবার কথা ! এতদিন যাইনি, যেতে পারিনি।

অভি বুঝল কাশী যাবার কথা বলছেন বৌরাণী ! তার মুখে কোনো কথা সরল না। শুধু ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বৌরাণী হাসিমুখে বললেন, কী ভাবছ অমন করে ?

অভিজিৎ সে প্রশ্নের জবাব দিলনা, গভীর সুরে ডাকল, বৌরাণী !

—বল।

—তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ ?

—সেকী ! খামকা তোমার ওপর রাগ করতে যাবো কিসের জন্যে ?

তাহলে চলে যাচ্ছ কেন ?

—থেকে কী করবো বল। যেজন্যে ছিলাম, যে আশা নিয়ে, সেটা হলনা, হবার নয়।

—আমি বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাও। কিন্তু আমি তো আমার সব কথাই তোমাকে বলেছি।

—সেটা মেনে নিয়েছি বলেই তো বলছি, হবার নয়। তোমার এতে কোনো হাত নেই। এ তোমার আমার সকলের বিধিলিপি। তা নাহলে মার মুখ থেকে অত বড় কঠিন কথা বেরোবে কেন ?

অভিজিৎ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, কিন্তু ওখানে তুমি একা একা থাকবে কেমন করে ?

—এখানেও তো আমি একাই ছিলাম কত বছর। তুমি আর কদ্দিন এসেছ ?

—বৌরানী, কিছুদিন আগে হলেও আমিও তোমার সঙ্গে চলে যেতাম। যাবার জন্যে মনে মনে তৈরিও হচ্ছিলাম। কিন্তু এখন এত বড় একটা কাজের মধ্যে মাথা দিয়ে—

—না, তুমি কোথায় যাবে ? সেদিন আবেগের মাথায় আমিও বলে ফেলেছিলাম তুমি কাশী ফিরে যাও। পরে ভেবে দেখছি, তা হয়না। তুমি পুরুষ মানুষ। কাজ করবার জন্যে জন্মেছ। বড় কাজ, মহৎ কাজ। তা না হলে মন ভরবে কেন ? তুমি যা করছ কর।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। সেটা ভঙ্গ করলেন বৌরানী—এদিকে সব রকম ব্যবস্থা আমি করে যাচ্ছি। মঙ্গলা রইল, খাওয়া দাওয়ার দিকটা দেখবে। আমি ওকে নিজের হাতে তৈরী করেছি। তার ওপরে তোমার কিষণ তো আছেই। তাহলেও বুঝতে পারছ, বড্ড ভাবনা থাকবে। নিয়মিত চিঠি লিখো। ফুরসৎ পেলেই একবার ঘুরে এসো। তোমার তো পুরনো জায়গা।

বলতে বলতে থেমে গেলেন মহামায়া। গলাটা ভারী হয়ে উঠল। অভিজিৎ বলল, মঙ্গলাকে রেখে গেলে তোমার কেমন করে চলবে ? ওকে তুমি নিয়ে যাও।

—সুশীলা যাচ্ছে। ওকে দিয়েই আমার চলে যাবে। মঙ্গলা তোমার কাছে থাক।....আচ্ছা নীহারকে কদিন দেখছিনা কেন ? ওকি ছুটি নিয়েছে ?

—না, ছুটি নেননি। কোলকাতাতেই ওঁর কাজ। আমরা রোজ বাড়ি থেকে তুলে নিই। আসবার পথে ছেড়ে দিয়ে আসি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলবো ?

বৌরানী কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলেন। তারপর বললেন না, থাক।

নীহারের দৈনন্দিন রুটিনে পরপর কয়েকদিন ছেদ পড়ল। রাইটার্স্‌ বিল্ডিংএর কাজ আপাততঃ বন্ধ। স্বরূপকাঁদিতেও করবার মত জরুরী কিছু ছিলনা। তাছাড়া ভিতরে ভিতরে কিছুটা ক্লান্তি বোধ করছিল। অভিজিৎকে বলে দিন তিনেকের ছুটি নিয়েছিল।

সেদিন বিকাল বেলা রূপাকে নিয়ে বেরিয়েছিল। উদ্দেশ্য বেড়ানো; তার সঙ্গে কিছু কেনাকাটারও দরকার ছিল। সন্ধ্যার দিকে ফিরে এলে দিদিমা বললেন, তোর একটা চিঠি আছে। তোর টেবিলে রেখে দিয়েছি।

চিঠিপত্র নীহারের বড় একটা আসে না। কলেজ জীবনের দু-একটি বন্ধু কালে ভদ্রে দু-একখানা লেখে। তাদের কেউ হবে, ভাবতে ভাবতে উপরে গেল। তা নয়। খামের ওপরটা অচেনা হাতের লেখা, ভিতরেও তাই। স্বভাবতই নজর পড়ল নীচেকার নামটার দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা চমক লাগল। বৌরাণীর চিঠি! অনেকদিন যেতে পারেনি, দেখা হয়নি, সেই জন্যেই হয়তো লিখেছিলেন। এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেলেন চিঠিটা—কয়েকটা মাত্র লাইন

কল্যানীয়াসু,

এই চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছিবে, সম্ভবতঃ তখন আমি কাশীর পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। তাহার পূর্বে কেন একটিবার তোমাকে ডাকিয়া আনিয়া দুটি কথা বলিয়া গেলাম না, কিংবা মাসিমার সঙ্গেও একবার দেখা করিলাম না, আশা করি বুঝিতে পারিবে।

তোমাকে লইয়া এতদিন ধরিয়া মনে মনে যে স্বপ্ন রচনা করিয়াছিলাম, তোমার নিকটে মাসিমার নিকটেও অস্পষ্ট রাখি নাই, সব ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কি করিয়া গেল, বলিয়া লাভ নাই। বলিলেও তুমি বুঝিবেনা। পাছে ভুল বোঝ, সেই জন্যে এইটুকু শুধু বলিতেছি যে তাহার উপর আমার বা ঠাকুরপোর কোন হাত ছিল না। সেখানে আমরা দুইজনেই অসহায়।

এই পরিবারের বিধবারা কাশীবাস করিয়া থাকেন। তাহাই রীতি। আমিও সেই উদ্দেশ্য লইয়া চলিলাম। ফিরিবার ইচ্ছা নাই।

তোমাকে আমি ভুলিতে পারিব না। তোমার সুবিধা সুযোগ মত ওখানে আবার দেখা হইবে। এই আশা লইয়া চলিলাম।

নিত্য আশীর্বাদিকা—

মহামায়া।

পড়তে পড়তে কখন তার চোখ দুটো জলে ভরে গেছে, নীহার জানতে পারেনি। হঠাৎ দিদিমার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল। তিনি ঘরে ঢুকেই জানতে চাইলেন, কার চিঠিরে ?

—বৌরানীর।

—কী লিখেছে ? শীগগীর আবার আসবে বলেছিল। সে সব কিছু জানিয়েছে ?

—না।

—আমাদের যাবার কথা ?

—তা কিছু লেখেননি। উনি কাশী চলে গেলেন।

"কাশী !" বিস্ময় প্রকাশ করলেন দিদিমা, "এ সময়ে হঠাৎ ? কোনো যোগ টোগ আছে নাকি ?

—হবে হয় তো।

—কবে ফিরবে লিখেছে ?

—না।

নীহার ইচ্ছা করেই চেপে গেল, তিনি আর ফিরবেন না। দিদিমাও মনে মনে 'স্বপ্নের' জাল বুনছেন, সে জানে। এখনই সেটা ছিঁড়ে দিতে কেমন মায়া হল। বড় কষ্ট পাবেন।

নিজের মনের মধ্যে দৃষ্টি ফেরাল। সেখানেও কি একটি 'স্বপ্নের' অঙ্কুর মাঝে মাঝে মাথা তুলে ওঠেনি ? যত ক্ষুদ্রই হোক তবু তাকে ঘিরে কখনো কখনো একটি মধুর মোহবেশ কি দেখা দেয় নি ? তখনই অবশ্য ভেঙে গেছে। আপনা হতে ভাঙেনি। তার ঘোর থেকে সে জোর করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। তবু সেই ক্ষণিকের সুখময় অনুভব সে নিজের কাছে অস্বীকার করবে কেমন করে ? আজ এই চিঠি খানা পড়বার পর থেকে অন্তর গহনের কোনো একটা কোণ জুড়ে যে সূক্ষ্ম বেদনা থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকের মত জেগে উঠছে তাকেও অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু না ; এইখানেই সব শেষ। এবার সে স্বচ্ছন্দ গতিতে নিজের পথে চলবে। যে পথ অনেকদিন আগেই তার জন্যে চিহ্নিত হয়ে আছে ! তার বাবাই সেটা স্থির করে দিয়ে গেছেন। পুত্রের কাছ থেকে যা

পেলেননা, কন্যার মধ্যে সেটা মূর্ত হয়ে উঠবে, এই তিনি চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তাকে তৈরি করেছিলেন। তাঁর সে আকাঙ্খা সে অপূর্ণ রাখবে না। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হবে সাক্‌সেস্, সাফল্য। তারই এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে তাকে উঠতে হবে।

এতদিন চাকরি করে হাতে কিছু টাকা জমেছিল। তার সাহায্যে সে এবার অনায়াসে একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেটের অধীনে শিক্ষানবিস হয়ে ঢুকতে পারে। হাইকোর্টে যোগদেবার আগে যা সবাইকে করতে হয়। শুধু সন্ধ্যাবেলায় হাজিরা দিলেই চলে। স্বরূপকাঁদি থেকে একটু সকাল সকাল বেরোতে পারলে একসঙ্গে দুটোই করা যায়। তাতে যদি অসুবিধা হয় চাকরি ছেড়ে দেবে।

এই মুহূর্তে সেইদিকেই বারবার টানছিল মনটা। এতদিন যে ভাবে চলছিল ফিরছিল, কাজ করছিল, এই চিঠিটা যেন সেখানে একটা ওলট পালট ঘটিয়ে দিয়ে গেল। হয়তো অন্য কেউ কিছু জানেনা। কিন্তু অভিজিৎ? কে জানে এবার কী চোখে দেখবেন তাকে? কতদিন কত কথা হয়েছে কিন্তু এই শান্ত, ভদ্র, সংযত মানুষটির মনের গহনে কী আছে কোনোদিন জানতে পারেনি নীহার। মাঝে মাঝে কোনো কোনো কথায় ব্যবহারে কিছু একটা আভাস হয়তো পেয়েছে। পরক্ষণেই মনে হয়েছে ওটা তার বিভ্রম। নিজের অজান্তে একটা নৈরাশ্যের ছায়া পড়েছে মনের উপর।

মুখেও কি সেটা ফুটে উঠেছে! সে দেখতে পায়নি। কিন্তু তিনি দেখেছেন। তার ঐ ক্ষনিকের দৌর্বল্যটুকু ধরা পড়ে গেছে তাঁর পুরুষের দৃষ্টিতে। তাই যদি হয়, আজ কোন লজ্জায় গিয়ে দাড়াবে তাঁর সামনে? কেমন করে তাকাবে তাঁর মুখের পানে? তিনি হয়তো মনে মনে হাসবেন। হয়তো এর আগেও হেসেছেন কতদিন। ভেবেছেন মেয়েটা কী হ্যাংলা! সে জানতে পারেনি। চিঠিটা পাবার আগে কিছুই জানত না। আজ সব কিছু জেনেশুনে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে উঠছে।

কিন্তু না যদি যায় তাতে কি সে আরো খেলো হয়ে যাবেনা? তিনি হয়তো ভাববেন, বৌরানী তাকে যে আসন দিতে চেয়েছিলেন তার উপরে

তারও গোপন লোভ ছিল। সেটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ব্যর্থতাই তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। "না, এ ধারনা যদি তাঁর হয়ে থাকে সেটা ভুল"—মনে মনে জোর দিয়ে বলল নীহার। তাকে দেখাতে হবে, কিছুই হয়নি। সে যেমন ছিল তেমনি আছে।

চিঠিখানাকে খামে পুরে ড্রয়ারে বন্ধ করে নীহার উঠে দাঁড়াল। এ নিয়ে যত কিছু চিন্তাভাবনা সেগুলোও ঐ সঙ্গে বন্ধ করে দিল। কিন্তু একটি প্রশ্ন তখনো মনের কোণে লেগে রইল—কী সেই কারণ যার জন্যে বৌরানীর সব 'স্বপ্ন' 'ধূলিসাৎ' হয়ে গেল অথচ যার ওপরে ওদের দুজনের কারো হাত নেই? এ রহস্য কে ভেদ করবে?

নীহারকে উঠতে দেখে রূপা এসে দাঁড়াল তার কাছে। নীহার তার দিকে চাইতেই বলল, তুমি জামাকাপড় ছাড়বেনা দিদিমনি?

—এবার ছাড়বো।

—"আমি ওঘরে সব গুছিয়ে রেখে দিয়েছি," বলে ওর ব্যাগটা নিয়ে তুলে রাখল যেখানে রাখে। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। দিদিমনিকে এতক্ষণ বসে বসে ভাবতে দেখে ভিতরে ভিতরে একটা উদ্বেগ বোধ করছিল। তার চলে যাবার ধরণেই সেটা বোঝা গেল।

সেইদিকে চেয়ে নীহারের আবার নতুন করে মনে পড়ল, কিছুদিন আগেই এই মেয়েটাকে নিয়ে সে একটা স্থির সংকল্পে এসে গেছে। বাবার ইচ্ছাকে সার্থক রূপ দেওয়া যেমন তার ব্রত, একে মানুষ করে তোলা, একটি সুস্থ, সুন্দর সুখী জীবনের পথে পৌঁছে দেওয়াই তেমনি তার অবশ্য কর্তব্য। সেদিন যা ভেবেছিল, সেটাই আবার মনে মনে আউড়ে গেল। এই তুচ্ছ উদ্বাস্তু মেয়েটা তার জীবনের একটা গোপন অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একে সে ছোট করে দেখতে পারেনা। একই অবস্থায় যে মহৎ শক্তির পরিচয় ও দিয়েছিল, নীহার ওর চেয়ে সব দিক দিয়ে উঁচু মহলের মানুষ হয়েও তা পারেনি। ও যেখানে জয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে, সে সেখানে হেরে গিয়েছিল। একই অভিজ্ঞতার তীব্র আঘাত ওদের দুজনকে এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। দুজনের বাইরের ব্যবধান যত বড়ই হোক ভিতরে একটা সূক্ষ্ম ঐক্যসূত্রগড়ে উঠেছে। অন্য কেউ না জানুক, সে তো জানে।

তাছাড়া ঐ অল্পবুদ্ধি কালো মেয়েটা তাকে ভালবাসে এবং একজনকে হারিয়ে তাকে আরো বেশী করে, সমস্ত প্রাণদিয়ে আঁকড়ে ধরেছে।

ওদিকে স্বরূপকাঁদিতে কিছুদিন আগে থেকেই ঘটনা প্রবাহ বয়ে চলেছিল নানা ধারায়।

উদ্বাস্তুরা নতুন বাস্তুর অনভ্যস্ত পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেছে। আবার নতুন করে জীবন সন্ধান।

প্রদীপও অনুকূল পরিবেশে নবোদ্যমে কাজে লেগেছে। ছোটাছুটির বিরাম নেই। কখনো কোলকাতায়, কখনো কৃষ্ণনগরে, কখনো বা অন্যত্র। কখন বেরোবে, কখন ফিরে আসবে সে শুধু সে-ই জানে, কিংবা সেও হয়তো জানেনা। এদিকে একটি মেয়ে বসে থাকে উৎকট প্রতীক্ষায়। বেলা গড়িয়ে যায়, রাত বাড়তে থাকে, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া খাবারগুলো বারবার গরমে বসায়, দূরে কোথাও গাড়ি চলার কিংবা অন্য কোনো শব্দ শুনলেই ছুটে যায় জানলার ধারে। বাবা মাঝে মাঝে বলেন তুই আর কতক্ষণ বসে থাকবি মা? শুয়ে পড়, এলে আমি ডেকে দেবো। কন্যা নিঃশব্দে শোনে, তারপর নিজের ঘরে চলে যায়, কিন্তু শুয়ে পড়েনা।

অভিজিৎকে ইদানিং বড় একটা ঘুরতে দেখা যায়না। তার প্রয়োজনও বোধহয় নেই। কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে প্রদীপই ঝড়ের মত এসে পড়ে তার কাছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে যায়।

বৌরানীও ব্যস্ত। নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই। শুক্রবারের আর মাত্র কটাদিন বাকী। তারই মধ্যে এদিকের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে যেতে হবে। সে তো সহজ নয়। এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর প্রায় সারা-জীবনের নিবিড় বন্ধন, এই বিস্তীর্ণ সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটির সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ। বরাবরের তরে ছিন্ন হতে চলেছে। কত জায়গায় টান পড়েছে। আত্মীয়, অনাত্মীয়, আশ্রিত, অনুচর, দাসদাসী—সব মিলে একটি রীতিমত বাহিনী। সকলকেই কিছু না কিছু বলে যেতে হবে, আদেশ, নির্দেশ উপদেশ সান্ত্বনা দিতে হবে। তার উপরে আছে আরেকটা বিরাট গোষ্ঠী, সেদিন যারা এসে ঢুকল তাঁর আশ্রয়ে। তারাও দলে দলে

আসছে তাঁর কাছে—মেয়ে পুরুষ, বেশির ভাগই মেয়ে। সবার মুখে এক প্রশ্ন কেন চলে যাচ্ছেন রানীমা। অনেকে ভাবছে, তারাই এর জন্যে দায়ী, মুখেও বলছে। তাদের বোঝাতে হচ্ছে—কেউ দায়ী নয়, এইটাই এ বাড়ির চিরাচরিত নিয়ম। তিনি বিধবা, তাঁকে কি চিরকাল ঘর সংসার নিয়ে জড়িয়ে থাকলে চলে? তাঁর স্থান তীর্থক্ষেত্র, বিশ্বনাথের পায়ের তলায়।

শুক্রবার এসে গেল। দুপুরের কিন্তু পরেই যাত্রা করতে হবে। সকালের দিকে দুর্গামোহন এলেন দেখা করতে! তাঁর সঙ্গে গৌরীও এল, সে কিছু বলতে পারলনা, বৌরানীর পায়ের কাছটিতে বসে কাঁদতে লাগল। উনি ধীরে ধীরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ওঁরই বা কী বলবার আছে?

দুর্গামোহনও অনেকক্ষণ নীরবে বসে থেকে বললেন, তুমি চলে যাচ্ছ মা, আমরা এখনো যেন সেটা মনে মনে মেনে নিতে পারছিনা। তোমাকে বাদ দিয়ে বাঁড়ুয্যে বাড়ির কথা ভাবা যায় না।....তাহলেও বলবো, তুমি ঠিকই করেছ।

মহামায়া বললেন, আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন মাস্টার মশাই।

—দুর্গামোহন দাঁতে জিভ কাটলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা। তোমাকে কি আমি আশীর্বাদ করতে পারি? তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো, তিনি যেন তোমাকে শান্তি দেন, আনন্দ দেন।"

দুর্গামোহন যখন উঠবার আয়োজন করছেন বৌরানী বললেন, ঠাকুরপোকে দেখবেন। আপনি তো ওর শুধু শিক্ষক নন, একমাত্র অভিভাবক, তার চেয়েও বেশী, আত্মীয়।

ওর জন্যে তুমি ভেবোনা মা। আমি তো রইলাম।

অভিজিৎ এই কদিন বৌরানীর সামনে বড় একটা আসেনি। দূরে দূরে রয়েছে। নানা কাজে কিংবা কাজের অছিলায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখবার চেষ্টা করেছে।

বৃহস্পতিবার রাত্রে যখন খাচ্ছিল, বৌরানী এসে বসলেন তার কাছে। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। তারপর বৌরানী মৃদু হেসে বললেন, তুমি অমন করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন অভি?

অভিও হাসল—কই? পালিয়ে বেড়াচ্ছি কে বললে? সে হাসি যেন কান্নার চেয়েও করুণ। আর কোনো কথা হলনা।

যাত্রার সময় হতেই বৌরানী 'দুর্গা' দুর্গা বলে নিজের ঘর থেকে এলেন। মাঝের মহল, সদর মহল পার হয়ে আস্তে আস্তে সামনের রাস্তায় গিয়ে পড়লেন। এতখানি পথের দুধারে কাতারে কাতারে লোক—নারী পুরুষ শিশু—নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

প্রদীপ প্রস্তাব করেছিল, সে তার গাড়িতে করে বৌরানীকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবে। বৌরানী বলে পাঠিয়েছিলেন, তাহলে আবদুল বেচারা বড় দুঃখু পাবে। এতদিন যখন যেখানে বেরিয়েছি, ওর গাড়িতে। আজ শেষ দিনটায়—

প্রদীপ আর কিছু বলেনি।

অভিজিৎ পিছনে পিছনে আসছিল। আবদুল কোচোয়ান সেলাম করে গাড়ির দরজা খুলে ধরল। বৌরানী উঠলেন। অভিজিৎ তার পাশে গিয়ে বসল। অন্য একটা গাড়িতে ঝি চাকর জিনিস পত্র।

বাঁড়ুয্যে বাড়ির উঁচু পাঁচিলের ধার দিয়ে পথ। চলতে চলতে সেদিকে একবার তাকালেন বৌরানী। চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। অভি পাছে দেখতে পায়, তাই তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য রচনা

লৌহকপাট ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ পর্ব:
তামসী
ন্যায়দণ্ড
মহাশ্বেতার ডায়েরী
পাড়ি
আশ্রয়
আবরণ
বন্যা
মসিরেখা
একুশ বছর
ছবি
পশারিণী
ছায়াতীর
সপ্তবহ্নি
মল্লিকা
তনুমন
সহচরী
পরশমণি
এ বাড়ি ও বাড়ি (নাটক)
পঙ্কশস্য
অনির্বাণ
নিঃসঙ্গ পথিক

কিশোর সাহিত্য

রংচং
গল্প লেখা হল না
যমরাজার বিপদ
জরাসন্ধের ছোটদের গল্প
জরাসন্ধের ছোটদের প্রিয় গল্প